প্রথম খণ্ড

মাসুদ রানা

স্বর্ণখনি

কাজী আনোয়ার হোসেন



স্বর্ণখনি-১

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

গভীর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে কয়েক মাস আগে এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করা হলেও সর্বনাশের মাত্রা এরচেয়ে বেশি হতে পারত না। প্রয়োজনের সময় প্রতিটি মেশিন বা সিস্টেম এমন গোঁ ধরে বসল যেন ওগুলোর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আছে, সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে মানুষের ওপর। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় কাউকে সতর্ক করে দেয়নি, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেও কেউ কোন আভাস পায়নি, এমন কি বাস্তব পরিস্থিতিতেও এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যে কারও মনে বিপদের সামান্যতম আশঙ্কা জাগবে। অথচ ঘটনাটা ঘটল। বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ 'ওয়াটার লিলি'তে আগুন লাগল।

জাহাজের ওয়েডিং চ্যাপেল পুড়ছে। কোন ব্যস্ততা নেই, শিখাগুলো প্রায় অলসভঙ্গিতে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন চাটছে। ওয়েডিং চ্যাপেলটা জাহাজের মাঝখানে, বিশাল শপিং ভিলেজ-এর ঠিক সামনে। জাহাজটা এত বড়, আগুনটাকে এখনও ছোট্ট একটা তিলই বলা যায়, তবে এটা যদি কেউ লাগিয়ে থাকে তাহলে তার অন্তত জানা আছে এই তিল দেখতে দেখতে তাল হয়ে উঠবে।

ব্রিজে যে যার নিজের কাজ করছেন অফিসাররা, এখনও জানেন না সর্বনাশের কি বীজ বপন করা হয়েছে। জাহাজের একাধিক অটোমেটিক ফায়ার-ওয়ার্নিং সিস্টেম, এমন কি প্রতিটি সিস্টেমের ব্যাকআপগুলোও, কোথাও কোন সমস্যার সামান্য ইঙ্গিতও দিল না। কনসোল-এ বিশাল ডায়াগ্রাম রয়েছে, তাতে জাহাজে বসানো প্রতিটি ফায়ার-ওয়ার্নিং ইন্ডিকেটর দেখানো হয়েছে—সেটা এইমুহূর্তে এক সাগর সবুজ আলো। চ্যাপেলে আগুন লাগার খবর দেবে নির্দিষ্ট একটা খুদে বালব, সেটাও রঙ বদলে লাল হয়ে উঠতে ব্যর্থ হলো।

ভোর চারটের সময় আরোহীরা সবাই যে যার স্টেটরুমে ঘুমে বিভোর। ঝকঝকে বার ও লাউঞ্জ, রঙচঙে ক্যাসিনো, রহস্যময় আলো-ছায়ায় ঢাকা নাইটক্লাব আর বলরুম খালি পড়ে আছে; তবে ওয়াটার লিলি থেমে নেই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে পিছনে ফেলে চব্বিশ নট গতিতে ঢুকে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হয়েছে; চট্টগ্রাম, কোলকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাই ছুঁয়ে পাড়ি দেবে আরব সাগর, লোহিত সাগর পেরিয়ে সুয়েজ খালের ভেতর দিয়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে, তারপর জিব্রালটার প্রণালী গলে বেরিয়ে যাবে আটলান্টিকে, গন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর। সদ্য তৈরি আনকোরা নতুন জাহাজ, এটাই ওয়াটার লিলির প্রথম যাত্রা। অন্যান্য ক্রুজ শিপ-এর সঙ্গে এই জাহাজের কাঠামো ও আকৃতির কোনই মিল নেই। খোলটা যেন এক পাটি বুট জুতো, মাঝখানে মস্ত একটা চাকতি বসানো। ছয়টা ডেকসহ গোটা সুপারস্ট্রাকচারের আকৃতি পুরোপুরি গোল, বৃত্তের কিনারাগুলো খোলের দু'পাশ

ছাড়িয়ে দেড়শো ফুট বেড়ে আছে, আর পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে আছে বো ও স্টার্ন থেকে। তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজ আর ওয়াটার লিলির সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। না, জাহাজটিতে কোন চিমনি নেই।

লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর গর্ব ওয়াটার লিলি নিঃসন্দেহে দুর্লভ সিক্স-স্টার রেটিং পাবে। মালিকপক্ষের ধারণা, জাহাজটার মূল রহস্য প্রকাশ পেলে দুনিয়ার মানুষ বিষম খাবে, চমকে উঠবে, তারপর উল্লাসে ফেটে পড়বে; কিন্তু তার আগেই ওয়াটার লিলির কপালে জুটবে জগৎজোড়া খ্যাতি ও বিপুল জনপ্রিয়তা। কেন এই প্রত্যাশা?

প্রথমেই বলতে হয় ওয়াটার লিলির ভেতরটা কি রকম। লাস ভেগাসের সবচেয়ে দামী হোটেলের হুবহু প্রতিচ্ছবি, ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন পুরোটাই যেন তুলে এনে বসানো হয়েছে এখানে। প্রথম শুভযাত্রার কথা মিডিয়াতে প্রচার করা হয়নি, তাসত্ত্বেও সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে স্টেটরুম বুক করার নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে সাতশো ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ হাজার টন ওজন, ওয়াটার লিলি বহন করছে ষোলোশো বিলাসী আরোহী; তাদের আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্যে রয়েছে নয়শো অফিসার ও ক্রু।

মেরিন আর্কিটেক্টদের একটা বাহিনী ওয়াটার লিলির পাঁচটা ডাইনিং রুম, তিনটে বার ও লাউঞ্জ এলাকা, ক্যাসিনো, বলরুম, থিয়েটার ও স্টেটরুমগুলোকে অত্যাধুনিক কেতা-কায়দায় ঘটা করে সাজাতে সময়ের হিসেবে নয় মাস আর টাকার হিসেবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। কল্পনায় যত রঙ ধরা দেয়, জাহাজের প্রায় সর্বত্র কাজে লাগানো কাঁচে সে-সব রঙ দেখতে পাওয়া যাবে। ক্রোম, তামা বা পেতল দেয়াল ও সিলিঙে মোচড় খেয়ে বিচিত্র ও বিস্ময়কর নকশার জন্ম দিয়েছে। নামকরা শিল্পী ও মেধাবি ইন্টিরিয়ার ডিজাইনাররা তৈরি করেছে নজর কাড়া সব ফার্নিচার। অভিনব আলোকসজ্জা স্বর্গীয় একটা পরিবেশ তৈরি করেছে; এই স্বর্গ থেকে ডিজাইনার বেশ কয়েকবারই ঘুরে আসার সুযোগ পেয়েছে—স্বপ্নে। বাইরের দিকের প্রম্যানাড ডেকগুলো বাদে, কোথাও হাঁটার কোন প্রয়োজন নেই। জাহাজের ভেতর চারদিকে ছড়িয়ে আছে এস্কালেটার, সচল র‍্যাম্প আর ওয়াকওয়ে। কাঁচ মোড়া এলিভেটর পাওয়া যাবে প্রতি ডেকে কয়েকটা করে।

স্পোর্টস ডেকের বড় আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে একটা ফোর-হোল গলফ কোর্স, অলিম্পিক-সাইজড় সুইমিং পুল, বাস্কেটবল কোর্ট আর বিরাট জিম। শপিং অ্যাভিনিউটা তিন ডেক পর্যন্ত উঁচু, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশালই বলতে হবে।

ওয়াটার লিলি সমসাময়িক ও প্রাচীন চিত্রকলার ভাসমান একটা মিউজিয়ামও বটে। জ্যাকসন পলক, পল ক্লী, আর্চি রায় ও ডং চো সহ আধুনিক চল্লিশজন শিল্পীর প্রায় চারশো পেইন্টিং জাহাজের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; প্রাচীন মহারথীদের মধ্যে পিকাসো থেকে শুরু করে লিওনার্দো দো ভিঞ্চির দুর্লভ চিত্রও আছে—নিলামে কিনতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলতে রাজি নয় মালিকপক্ষ। মেইন ডাইনিং রুমে প্লাটিনাম বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জের

.তরি পৌরাণিক কাহিনীর বিবস্ত্র সুন্দরীরা। প্রাচীন চিত্রশিল্পের দাম ধরা হয়নি, ওগুলো ছাড়াই এই কালেকশন-এর খরচ পড়েছে আটাত্তর মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

স্টেট রুমগুলো বৃত্তাকার, কোথাও কোন তীক্ষ্ণ কোণ নেই। প্রতিটি সুপরিসর, এবং হুবহু একই রকম দেখতে—ওয়াটার লিলিতে বিশেষ সেলুন বা পেন্টহাউস স্যুইট রাখা হয়নি—ডিজাইনাররা শ্রেণী বিভাজনে সম্মত হননি। ফার্নিচার ও ঘর সাজানোর সমস্ত উপকরণ যেন কোন সায়ান্স ফিকশন মুভি থেকে তুলে আনা হয়েছে। বিছানা ঘোরে, উঁচু-নিচু করানো যায়; গদি অস্বাভাবিক ঋজু, কিন্তু নরম। মাথার ও'র আলোর আয়োজন দৃশ্যমান নয়। যারা প্রথম বা দ্বিতীয় হানিমুনে এসেছে তা দের জন্যে সিলিঙে সাঁটা হয়েছে বিশাল আয়না। বাথরুমে আছে বিল্ট-ইন কয়েকটা চেম্বার, ওগুলো থেকে কুয়াশা, জলোচ্ছাস, বৃষ্টি কিংবা ঝর্না বেরিয়ে আসবে রাশি রাশি সদ্য ফোটা তাজা ফুল ও বিচিত্র বর্ণ পাতাবাহারের জঙ্গলে। ওয়াটার লিলিতে ভ্রমণ করা, কোন সন্দেহ নেই, অপূর্ব একটা অভিজ্ঞতাই বটে।

ডিনারের পর তরুণ দম্পতিরা বলরুমে বেশ কিছুক্ষণ জনপ্রিয় মিউজিকের তালে তালে নেচেছে, কিছুটা সময় ব্যয় করেছে নাইটক্লাবে ফ্লোর শো দেখে কিংবা ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে; শিশু সন্তান সহ পরিবারগুলো থিয়েটারে নাটক দেখেছে, কিংবা গ্যালারিতে বসে সার্কাস পার্টির অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। রাত তিনটের দিকে সবগুলো ডেক আর লাউঞ্জ খালি হয়ে গেল। আজ রাতের মত যারা বিছানায় উঠল তাদের কারও চিন্তার মধ্যে এটা ছিল না যে প্রাচীন মৃত্যুদূত আজরাইল ওয়াটার লিলির ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নিজের কেবিনে বিশ্রাম নিতে যাবার আগে আপার ডেকগুলোয় একবার করে ঢুঁ মেরে এলেন ক্যাপটেন রিচার্ড গলপিন। ক্রুজ শিপের ক্যাপটেন হিসেবে বয়েস একটু বেশিই বলা যায়, আর পাঁচদিন পর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন পালন করবেন ভদ্রলোক। এটাই তাঁর শেষ সমুদ্রযাত্রা, নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরতি পথ ধরে সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর পর অবসর নেবেন, স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন ব্যক্তিগত ইয়টে—কখনও আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, কখনও প্যাসিফিক।

সবশেষে ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপটেন গলপিন, শুনলেন সব কিছু স্বাভাবিক; নিজের কেবিনে ঢুকে প্রার্থনা করলেন, তারপর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোর, চারটে বেজে দশ মিনিট। তরুণ সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েন রুটিন ট্যুরে বেরিয়েছে। একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। ধোঁয়ার? কিছু পুড়ছে? দ্রুত হেঁটে শপিং ভিলেজে চলে এলো গোয়েন, বাতাস শুঁকে মনে হলো শপিং মল-এর এক প্রান্তে গন্ধটা বেশি, বিশেষ করে যেদিকটায় বাটিক আর গিফট শপের দোকানগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কোন অ্যালার্ম না বাজায় হতভম্ব, ঝাঁঝাল গন্ধ অনুসরণ করে ওয়েডিং চ্যাপেলের সামনে চলে এলো সে। অপরদিকের গরম আঁচ অনুভব করতে পারল সে, টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

চ্যাপেলের ভেতরটা দাউ-দাউ আগুনে ভরাট হয়ে আছে। প্রচণ্ড আঁচ লাগায়

পিছন দিকে ছিটকে ডেকে পড়ে গেল হতভম্ব গোয়েন। নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে রেডিও কমিউনিকেটরের সাহায্যে ব্রিজে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ পাঠাল সে। 'ক্যাপটেন গলপিনের ঘুম ভাঙাতে হবে। চ্যাপেলে আগুন লেগেছে। অ্যালার্ম বাজান। ড্যামেজ-কন্ট্রোল কমপিউটরকে প্রোগাম দিন. আর ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম এনগেইজ করুন।'

ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান-এর মাথা আপনা-আপনি ফা।র-সিস্টেম কনসোল-এর দিকে ঘুরে গেল। সবগুলো আলো সবুজ দেখলেন তিনি। 'নিক, তুমি নিশ্চিত? এখানে তো কোন আভাসই পাচ্ছি না!'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন!' মাউথপীসে চিৎকার করছে গোয়েন। 'গোটা চ্যাপেল পুড়ছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আরও শুনুন! কোথাও মারাত্মক কোন ত্রুটি আছে। ফায়ার-ইক্সটিঙগুইশার সিস্টেম কোন কাজই করছে না। তাছাড়া, কোন হিট-অ্যালার্মও নেই।'

বার্কম্যান হতচকিত। পানিতে ভাসে এমন যে-কোন জলযানের চেয়ে অনেক উন্নত মানের ফায়ার-অ্যালার্ম ও ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে ওয়াটার লিলিতে। ওগুলো কাজ না করলে আর কোন বিকল্পও নেই। কনসোল কোথাও কোন ত্রুটি বা বিপদের আভাস দিচ্ছে না, সেদিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে স্তম্ভিত বার্কম্যান অমূল্য কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করলেন। ব্রিজে জুনিয়ার অফিসার জন হফম্যান রয়েছে, তার দিকে ফিরলেন তিনি। 'নিক বলছে চ্যাপেলে আগুন লেগেছে। অথচ ফায়ার-কন্ট্রোল কনসোলে কিছু দেখছি না। যাও, চেক করে এসো।'

ওদিকে নিক গোয়েন যেন জঙ্গলে লাগা বড় একটা আগুন একার চেষ্টায় ভেজা একটা চট দিয়ে নেভাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কোথাও আগুন লাগলে অটোমেটিক স্প্রিঙ্কলগুলো সেই আগুনে নিজে থেকেই পাউডার অথবা ফোম স্প্রে করবে, অন্তত করার কথা. কিন্তু এখানে সে-সব কিছু ঘটছে না। একটা ফায়ার ইক্সটিঙগুইশার দিয়ে একা সে কিছুই করতে পারছে না। ক্রুরা দল বেঁধে এসে চেষ্টা না করলে এই আগুন নেভানো অসম্ভব। ওয়াটার ভালভ খুলে দিতে হবে, কাজে লাগাতে হবে হোসপাইপ। কিন্তু কি দেখল গোয়েন? জুনিয়ার অফিসার হফম্যান অলস পায়ে শপিং অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে আসছে।

আগুনের বিস্তার ও মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল হফম্যান, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজকে জানাল, 'ফার্স্ট অফিসার, ফর গডস সেক! দিস ইজ ইমার্জেন্সি! পোর্টেবল ইক্সটিঙগুইশার দিয়ে কিছুই হবে না। ক্রুদের ডাকুন, সার! এনগেইজ ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেমস!'

ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'সিস্টেম ইজ অন।' বোতামে চাপ দিয়ে বললেন তিনি।

'কিন্তু এখানে তো কিছুই ঘটছে না!' গোয়েন চেঁচিয়ে উঠল। 'কিছু একটা করুন, সার! এ আগুন আমরা নিজেদের চেষ্টায় নেভাতে পারব না!'

অগত্যা বাধ্য হয়ে ফায়ার-ক্রু অফিসারকে রিপোর্ট করল বার্কম্যান, ঘুম ভাঙাল ক্যাপটেনেরও।

রিপোর্ট পেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কাপড় পরছেন ক্যাপটেন গলপিন। তিনি এমন কোন বিপদ আশঙ্কা করছেন না যাতে আড়াই হাজার প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে জাহাজ ত্যাগ করে লাইফ বোটে চড়ার নির্দেশ দিতে হবে, তাসত্ত্বেও সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথাই বলেছেন ফার্স্ট অফিসারকে। ব্রিজে ছুটে এসে প্রথমেই চোখ রাখলেন ফায়ার-কন্ট্রোল কনসোলে। এখনও ওটা সবুজ আলোর সমষ্টি। কোথাও যদি আগুন লেগে থাকে, সফিস্টিকেটেড কোন সিস্টেমই সেটাকে চিহ্নিত করতে পারছে না, তাই সেটাকে নিভিয়ে ফেলার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও করতে পারছে না।

'এ তো অসম্ভব!' গোয়েন আর হফম্যানের সঙ্গে কথা বলার পর মন্তব্য করলেন ক্যাপটেন, তারপর আবার ফোন তুলে এঞ্জিন রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

অ্যাসিসট্যান্ট চীফ এঞ্জিনিয়ার ডক হুবার্ট জবাব দিল। 'এঞ্জিন রুম। হুবার্ট।'

'ক্যাপটেন। তোমাদের ফায়ার-কন্ট্রোল ডিটেকশন সিস্টেম চেক করে বলো, জাহাজের কোথাও আগুন লেগেছে?'

দশ সেকেন্ড পর হুবার্ট জবাব দিল। 'না, স্যার। বোর্ডের সব আলো সবুজ দেখছি।'

'স্ট্যান্ড বাই, ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম ম্যানুয়ালি চালু করতে হতে পারে।'

এই সময় ব্রিজে খবর এল পোর্ট প্রমানাড ডেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফোন তুলে নিক গোয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যাপটেন। 'ক্যাপটেন। হুবার্টকে নিয়ে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে এসো। স্টীল ফায়ার ডোর বন্ধ করে চ্যাপেল সীল করে দিচ্ছি আমি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি, সার! আমার ভয় হচ্ছে আগুন না অ্যাভিনিউয়ে ছড়িয়ে পড়ে।'

বোতামে চাপ দিলেন ক্যাপটেন. চ্যাপেল এরিয়ার চারপাশে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ফায়ার ডোর বেরিয়ে এসে গোটা এলাকা সীল করে দেবে। অ্যাকটিভেশন আলো জ্বলে উঠতে না দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর গোয়েনকে আবার ফোন করলেন। 'ফায়ার ডোর বন্ধ হয়েছে?'

'না, সার। কোন নড়াচড়া নেই।'

তারপরই হুবার্টের গলা ভেসে এল ব্রিজে। 'সার, ম্যানুয়াল ফায়ার-ডোর কন্ট্রোল সিস্টেমও কোন কাজ করছে না!'

'এ অসম্ভব!' দু'মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন ক্যাপটেন। 'আমি আসছি, নিজে দেখব কি ঘটছে।'

ফার্স্ট অফিসার আর কোন দিন ক্যাপটেনকে দেখেনি। গলপিন ব্রিজ এলিভেটরে ঢুকলেন, নেমে এলেন এ ডেকে; ওয়েডিং চ্যাপেলের দিকে এগোলেন ক্রুরা যেদিকে আগুনের সঙ্গে লড়ছে তার উল্টোদিক দিয়ে। কিছু না ভেবেই, বিপদের বিশালত্ব সম্পর্কে অসচেতন, অল্টার-এর পিছনের দরজাটা টান দিয়ে খুলে ফেললেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অগ্নিশিখার প্রচণ্ড একটা ঝড় তাঁকে গ্রাস করল। প্রায় চোখের পলকে সেদ্ধ হয়ে গেল তাঁর ফুসফুস, শরীরটা পরিণত

হলো জ্বলন্ত মশালে। পিছু হটলেন, যেন আগুনের একটা কুণ্ড। ডেকে পড়ে গেলেন, তবে মারা গেছেন তার আগেই। ক্যাপটেন গলপিন জানলেন না যে তাঁর জাহাজটাও ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল তুষার। এরকম বাজে স্বপ্ন প্রায়ই দেখে সে—কুৎসিত কোন পশু কিংবা ঝাঁক-ঝাঁক পোকা তাড়া করছে।

বিছানায় উঠে বসার পর বাতাসে সামান্য ধোঁয়ার গন্ধ পেল। নাইট-ড্রেসের ওপর কাঁধে একটা চাদর জড়াল, তারপর সংলগ্ন স্টেট রুমের দিকে এগোল।

পাশের স্যুইটে তুষার বাবা ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। নোবেল প্রাইজের জন্যে মনোনয়ন পাওয়া এই মেকানিক্যাল জিনিয়াস ওয়াটার লিলিতে ভ্রমণ করছেন, কারণ এই জাহাজটার বিশেষ ধরনের নতুন এঞ্জিনের ডিজাইন তিনিই ডেভলপ্ করেছেন। তিনি দেখতে চান প্রথম যাত্রায় ওগুলো কেমন কাজ করে। নিজের আবিস্কৃত নতুন সৃষ্টি নিয়ে ভদ্রলোক এতই ব্যস্ত থাকেন এঞ্জিন রুমে যে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার পর বাবার সঙ্গে তুষার প্রায় বলতে গেলে দেখাই হয়নি। গতরাতেই প্রথম দু'জন একসঙ্গে বসে ডিনার খাবার সময় পেয়েছে ওরা। সিরাজুল ইসলাম অবশেষে সন্তুষ্ট, তাঁর ম্যাগনেটিক জেট প্রপালশান এঞ্জিনগুলো কোন সমস্যা ছাড়াই চমৎকার কাজ করছে।

বাবার কাঁধে হাত-রেখে মৃদু ঝাঁকাল তুষা। 'বাবা, ওঠো।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসে ডক্টর সিরাজুল ইসলাম জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার? তুই কি অসুস্থ?'

'বাবা, ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। মেঝেও গরম লাগছে।'

'বলিস কি!' বিছানা থেকে নেমে পড়লেন ইসলাম সাহেব। 'চল্ তো দেখি।'

জাহাজের আগুন কিভাবে নেভাতে হয় তার ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি এমনই, যেন পিছমোড়া করে বাঁধা হাত নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে সবাইকে। গোটা ফায়ার-কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কোন কাজ করছে না। কমপিউটর, ফায়ার-ডোর, স্প্রিঙ্কল—সব বিকল। এমনকি ভালভ ক্যাপগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ায় হোসগুলো জোড়া লাগানো যাচ্ছে না, হাত দিয়ে ঘোরানো সম্ভব নয়। এঞ্জিন রুম থেকে রেঞ্জ আনার জন্যে লোক পাঠাল গোয়েন। অসহায় ক্রুরা তাকিয়ে দেখছে আর আগুনকে পথ ছেড়ে দিয়ে পিছু হটছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে এ ডেককে গিলে ফেলল লাল শিখা। স্টার ও পোর্ট সাইডের লাইফবোট পানিতে নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল ক্রু। আগুনের দ্রুতগতি, ভয়াল রূপ দেখে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল তারা।

অথচ এখনও কোন অ্যালার্ম বাজছে না।

ক্যাপটেন রিচার্ড গলপিন নিখোঁজ, এ-খবর রটে যাবার পরও ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান মেনে নিতে রাজি নন যে তিনি মারা গেছেন বা মারাত্মক কোন বিপদে পড়েছেন। আধুনিক আর সব ক্রুজ শিপ-এর মত ওয়াটার লিলিকেও ফায়ারপ্রুফ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, কাজেই তিনি ধরে নিচ্ছেন আগুনটাকে ঠিকই তাঁরা

নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন। নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিতে উৎসাহী নন, ফলে ক্যাপটেনের খোঁজে আবার লোক পাঠালেন তিনি। এভাবে আসলে অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে গেল অনেক।

বার্কম্যান চার্ট রুমে ঢুকে বড় একটা চার্টে চিহ্নিত করা কোর্স লাইন পরীক্ষা করলেন। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে বিশ মিনিট আগে ফোর্থ অফিসার নিশ্চিত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পিছনে ফেলে আসার পর বঙ্গোপসাগরের এমন এক জায়গায় রয়েছে ওয়াটার লিলি যেখান থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি ল্যান্ডফল হলো সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ, একশো বিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। ব্রিজে ফিরে এসে উইং-এ বেরুলেন বার্কম্যান। হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাতাসের গতিও বাড়ছে। বো-র দিকে অবিচ্ছিন্ন মিছিলের মত ছুটে আসা ঢেউ একেকটা পাঁচ ফুট উঁচু। ঘুরে পিছন দিকে তাকালেন তিনি। জাহাজের মাঝখানটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে, আগুনের কমলা শিখা লাইফবোটগুলোকে গিলে ফেলছে। সমস্ত ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যর্থ হলো কেন? ওয়াটার লিলি দুনিয়ার অন্যতম নিরাপদ জাহাজগুলোর একটা। চিন্তাই করা যায় না যে এর শেষ গতি হবে সমুদ্রের তলায়। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে অবশেষে ফায়ার-অ্যালার্ম সিস্টেম অন করলের তিনি। কিন্তু এরই মধ্যে জাহাজের ক্যাসিনোয় দাউ-দাউ আগুন ধরে গেছে।

জাহাজ জুড়ে বেল বেজে উঠল, শোনা গেল সাইরেনের তীব্র ওঁয়া-ওঁয়া। ঘুম ভেঙে গেল যোলোশো আরোহীর। সবাই বিরক্ত। বিরক্তির জায়গা দ্রুত দখল করে নিল ভয়। ভোর চারটে পঁচিশ মিনিটে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম! স্পীকার সিস্টেম থেকে নির্দেশ এল লাইফবোট স্টেশনে যাবার আগে সবাই লাইফ ভেস্ট পরে নিন।

কিন্তু একটু পরই যে-সব প্যাসেঞ্জার বোট ডেকে বেরিয়ে এল, নিজেদের সামনে আগুনের পাঁচিল ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পেল না। আতংক ছড়ানোর সেই শুরু।

মেয়েকে পথ দেখিয়ে কাছাকাছি একটা এলিভেটরে নিয়ে এলেন সিরাজুল ইসলাম, সেটা দিয়ে উঠে এল সুপারস্ট্রাকচারের আপার সেকশন-এর অবজারভেশন ডেকে, এখান থেকে জাহাজের প্রায় পুরোটা দেখতে পাওয়া যাবে। সাততলা নিচে জাহাজের মাঝখানে আগুনের বিস্তার তাঁর সবচেয়ে খারাপ ধারণাটাই সত্যি করে তুলল। দুই ডেকের ডেভিট-এ লাইফবোট থাকে, দুটোতেই পৌঁছে গেছে আগুন। স্টার্নে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সাগরে লাইফ রাফট্ ফেলছে ক্রুরা–ওগুলো পানিতে পড়ার পর নিজে থেকেই বাতাসে ফুলে উঠছে। ক্রুরা একেবারেই সচেতন নয় যে জাহাজ এখনও ছুটছে, ফলে খালি রাফট্ বা ভেলাগুলো জাহাজের অনেক পিছনে পড়ে থাকবে, কারও কোন কাজে আসবে না। এ-সব দেখে মুখ থেকে রক্ত নেমে গেল, মেয়ের দিকে ফিরে সিরাজুল ইসলাম বললেন, 'বি ডেকের খোলা কাফেতে চলে যা। আমার জন্যে অপেক্ষা করবি।'

নাইট-ড্রেসের ওপর শুধু চাদর জড়িয়ে রেখেছে, তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

'আমাকে স্টেট রুম থেকে কাগজগুলো আনতে হবে। তুই যা, কয়েক

মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

কিন্তু প্রতিটি এলিভেটর জ্যাম হয়ে গেছে, নিচের ডেকের লোকেরা সবগুলো দখল করে নিয়েছে। সিঁড়িতেও একই অবস্থা, জনস্রোতের বিরুদ্ধে ধস্তাধস্তি করে নামতে হলো ওদেরকে। সারা জীবন সুষ্ঠু নিয়ম ধরে জীবন কাটিয়েছে যারা, আজ হঠাৎ মৃত্যুভয় তাদেরকে হিংস্র দাঙ্গাবাজে পরিণত করছে। অথচ বেশিরভাগই তারা অন্ধের মত ছুটছে, জানে না কোথায় যাচ্ছে বা কোথায় গেলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। অনেককেই পাগলের মত বিলাপ করতে দেখা গেল।

মানসিকভাবে অসাড় ও অবশ, ফার্স্ট অফিসার বার্কম্যান এখনও মেডে কল প্রচার করছেন না। চীফ রেডিও অফিসার তিনবার রেডিও রূম থেকে ছুটে এসে জানতে চেয়েছেন মেডে কল প্রচার করবেন কিনা, আশপাশের জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিনা। কিন্তু বার্কম্যান কোন জবাব দেননি।

আর কয়েক মিনিট পর অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে। রেডিও রূম থেকে আগুনের পাঁচিল আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে।

বি ডেকের খোলা কাফেতে কোন রকমে পৌঁছে তৃষা দেখল চারদিকে গিজ গিজ করছে মানুষ। সবাই হতভম্ব, বিহ্বল ও আতংকিত। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় ছেলে-বুড়ো সবাই খক খক করে কাশছে।

জাহাজ এখনও চব্বিশ নট স্পীডে ছুটছে।

নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে স্টেট রূমে থাকা অবস্থায় কোন প্যাসেঞ্জার মারা যায়নি; করিডর, সিঁড়ি আর এলিভেটরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই সবাই তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। অফিসার আর ক্রুরা আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে তাদের সবাইকে স্টার্ন ডেকে জড়ো করতে পেরেছে। এখানে আপাতত আগুন তাদের নাগাল পাবে না।

ভিড় ঠেলে অবশেষে রেইলের কাছে পৌঁছাতে পারল তৃষা, বজ্রমুষ্ঠিতে ওটা ধরে ঝুলে থাকল। প্রপেলারের তৈরি আলোড়িত ফেনার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এখনও ভোরের আলো ফোটেনি, তবে জাহাজের ফ্লাড লাইটের আলোয় দুশো গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল—এটা নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগর। তার মানে হয়তো মাতৃভূমির জলসীমার ভেতরই রয়েছে সে! এ কি তাহলে মায়ের ডাক, জঠরে ফিরিয়ে নিতে চায়?

আচ্ছা, জাহাজ থামছে না কেন?

এক খ্রিস্টান মহিলা যীশুকে স্মরণ করছে। 'হে প্রভু, আমাদেরকে পুড়িয়ে মেরো না!' কেউ তাকে বাধা দেয়ার সময়ই পেল না, রেইলিং টপকে লাফ দিল সাগরে। অনেকেই হায় হায় করে উঠে নিচে তাকাল। কয়েকবার হাবুডুবু খেয়ে অন্ধকার সাগরে হারিয়ে গেল মাথাটা।

বাবার কথা ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তৃষা। খুঁজতে যাবে কিনা ভাবছে, এই সময় ফিরে এলেন সিরাজুল ইসলাম, হাতে একটা বাদামী লেদার কেস। এক হাতে পেঁচিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিল মেয়ে। 'কি করব আমরা?' ভয়ে, উদ্বেগে গলা ভেঙে গেল। 'কোথায় যাব?'

'পানিতে,' বললেন বিজ্ঞানী বাবা। 'যতক্ষণ পারা যায় ওখানেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।' স্নেহ ও মায়া ভরা দৃষ্টিতে মেয়ের চোখে চোখ রাখলেন সিরাজুল ইসলাম। স্ত্রী ছিলেন রূপসী, মেয়ে মাকেও ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ার সুন্দরী শ্রেষ্ঠাদের সারিতে দাঁড়াতে পারবে। আজ হঠাৎ করে তিনি উপলব্ধি করলেন, স্ত্রী মারা যাবার পর মেয়ের প্রতি যে মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল তা তিনি দিতে পারেননি বিজ্ঞান সাধনায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে। তবে রূপের সঙ্গে মেধা থাকায় মেয়ে নিজের জীবনটাকে গড়ে নিতে পেরেছে, সেজন্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ। 'অন্তত এই ভেবে আমরা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করতে পারি যে এটা আমাদের পানি, একটু গরমই বলা চলে, কাজেই সাঁতরাতে ভালই লাগবে।' মেয়ের অ্যাথলেটিক কাঠামোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে হাসলেন।

'তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তাই না?' বাবার রসিকতায় সাহসে বুক বাঁধল তৃষা। 'আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও জাহাজ ছুটে আসবে?'

ব্রিজে দাঁড়িয়ে লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর গর্ব ওয়াটার লিলিকে পুড়তে দেখছেন ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান। তাঁর মাথা কাজ করছে না, তিনি এখন একটা জড়-পদার্থ বললেই চলে। কামানের গোলার মত ছুটে এসে ব্রিজে ঢুকল সেকেন্ড অফিসার গোয়েন। অটল মূর্তি বার্কম্যানকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'আপনি জাহাজ থামানোর নির্দেশ দেননি কেন?'

উত্তর বেরুল যেন একটা রোবটের গলা থেকে। 'সেটা ক্যাপটেনের দায়িত্ব।'

'তিনি কোথায়?'

'কতবার বলব। তিনি কোথায় আমি জানি না। ব্রিজ থেকে বেরুবার পর তাঁর আর কোন খবর নেই।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন তিনি।' গোয়েন বুঝতে পারছে সিদ্ধান্ত দেয়ার মত মানসিক অবস্থা ফার্স্ট অফিসারের নেই। টেলিফোনের রিসিভার তুলে চীফ এঞ্জিনিয়ারকে চাইল সে। 'চীফ, আমি গোয়েন। ক্যাপটেন নিখোঁজ, সম্ভবত মারা গেছেন। আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ করে তোমার লোকদের নিয়ে ওপরে উঠে এসো। মাঝখান দিয়ে উঠতে পারবে না, বো বা স্টার্ন দিয়ে চেষ্টা করো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফার্স্ট অফিসারের দিকে ফিরল গোয়েন। 'মেডে কল-এর কোন রেসপন্স পাওয়া গেছে?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বার্কম্যান। 'মেডে?'

'হায় যীশু! তাহলে তো সত্যিই দেরি হয়ে গেছে! এতক্ষণে রেডিও রূম পুড়ে ছাই!' আবার রিসিভার তুলে রেডিও রূমের নম্বরে ডায়াল করল গোয়েন, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া কোন সাড়া পেল না। দেয়ালে মাথা ঠুকল সে। 'এত লোক···দু'হাজারের বেশি, হয় ডুবে মরবে নয়তো পুড়ে–উদ্ধার পাবার কোন সুযোগ পর্যন্ত নেই।' কাঁদছে সে। 'ওদের সঙ্গী হওয়া ছাড়া আমাদেরও কিছু করার নেই।'

দুই

বারো মাইল উত্তরে কালো দীঘির মত গভীর একজোড়া মায়া ভরা চোখ উজ্জ্বল হতে শুরু করা পুব আকাশ থেকে ঘুরে গেল দক্ষিণ আকাশে ফুটে ওঠা লাল আভার দিকে। চিন্তামগ্ন, চোখ জোড়ার অধিকারী সুপুরুষ তরুণটি 'নুমা'-র ওশানাগ্র্যাফিক সার্ভে ভেসেল সী রবিন-এর ব্রিজ উইং থেকে পাইলটহাউসে ঢুকল, ব্রিজ কাউন্টারে পড়ে থাকা একজোড়া বিনকিউলার তুলে নিয়ে আবার ফিরে এল উইং-এ।

ভোরের সামুদ্রিক বাতাস বেশ আরামদায়ক, না গরম না ঠাণ্ডা। ওর পরনে নীল ডেনিম শর্টস আর বহু বর্ণের ফুল ছাপা হাওয়াইয়ান শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল। ডীপ ওয়াটার রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করার সময় সাধারণত এ-ধরনের কাপড়ই পরে মাসুদ রানা, বিশেষ করে এলাকাটা যদি হয় বঙ্গোপসাগরের মত গ্রীষ্মপ্রধান।

বিশ্বব্যাংকের অনুদান ও নুমার কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নতুন করে যাচাই করা হচ্ছে, এখানে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে নুমার রিসার্চ শিপ সী রবিনের উপস্থিতির এটাই কারণ।

লাল আভার দিকে মিনিট তিনেক তাকিয়ে থাকার পর পাইলটহাউসে ফিরে এসে রেডিও রুমে মাথা গলাল রানা। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুম-ঘুম চোখ তুলে রেডিও অপারেটর বলল, 'লেটেস্ট স্যাটেলাইট ওয়েদার ফোরকাস্ট রিপোর্ট হলো–ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতি নিয়ে ঝড় আসছে, সঙ্গে থাকবে তুমুল বৃষ্টি, ঢেউ পাবেন দশ ফুটী।'

'তুমি কোন ডিসট্রেস সিগন্যাল পেয়েছ?'

রানার উদ্বিগ্ন গলা শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রেডিও অপারেটরের। 'না তো!'

'দক্ষিণে বড় কোন জাহাজে আগুন লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। চেষ্টা করে দেখো তো ওটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো কিনা।' ডিউটিতে রয়েছে অফিসার ডাফ টিমোথি, তার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'ডাফ, আমি চাই জাহাজ দক্ষিণে ঘুরিয়ে ফুল স্পীড তোলো তুমি। ক্যাপটেন শেফার্ডকে জাগাও, বলো আমি তাঁকে পাইলটহাউসে ডাকছি।'

রানা এই প্রজেক্টের ডিরেক্টর, তাই পদের বিচারে ক্যাপটেনের চেয়ে ওর ওজন অনেক বেশি, তবে তারপরও জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব তারই। একটু পরই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড শুধু একজোড়া শর্টস পরে পাইলটহাউসে উঠে এলেন। 'কি ব্যাপার? কোন্ জাহাজে আগুন লাগল?' মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলছেন। রানার বাড়ানো হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলেন, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন দক্ষিণ দিকে। 'ঠিক ধরেছেন, মিস্টার রানা। দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি বলি–ওটা একটা

ক্রুজ শিপ। খুব বড়।'

'আশ্চর্য! কোনও মেডে পাঠায়নি!' রানা স্বস্তিবোধ করল, ক্যাপটেন আজ মদ বা অন্য কোন ড্রাগ নেননি।

'তারমানে রেডিও কাজ করছে না।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রানার দিকে ফিরলেন শেফার্ড। 'জাহাজ ঘোরাবার নির্দেশ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' ব্রিজে ফিরে এসে ফোনের রিসিভার তুললেন। 'চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনারকে জাগাও। আমি ফুল স্পীড চাই।' অপরপ্রান্তের কথা শোনার জন্যে থামলেন একবার। 'কেন? আমরা বিপদে পড়া একটা জাহাজের দিকে যাচ্ছি, আবার কেন!'

খবর ছড়িয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্ভে শিপে ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল, খবরের সঙ্গে কার কি কাজ ও দায়িত্ব তা-ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজের দুটো পঁয়ত্রিশ ফুটী হাইড্রোগ্র্যাফিক সার্ভে লঞ্চ পানিতে নামানোর জন্যে তৈরি রাখা হলো। দুটো টেলিস্কোপিক ডেক ক্রেইন-এর সঙ্গে স্লিং জোড়া লাগানোর কাজ চলছে, ওগুলোর সাহায্যে পানিতে সাবমারসিবল আর সার্ভে ইকুইপমেন্ট নামানো হয়। জাহাজের প্রতিটি মই আর রশি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলেই জাহাজের কিনারা থেকে নিচে ফেলে দেয়া হবে।

জাহাজের ডাক্তাররা মেরিন বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে আহত ও অসুস্থ লোকজনকে হাসপাতালে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিল। মেস রূমটাকে বানানো হলো হাসপাতালের বর্ধিত অংশ। গ্যালির কুকরা ভ্যাট-এ চড়িয়ে দিল সুপ। বোতলে পানি ভরা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে প্রচুর কফি। প্রত্যেকে যে যার অতিরিক্ত কাপড় এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, যাদেরকে উদ্ধার করা হবে তাদের লাগতে পারে ভেবে। মাত্র দুশো ত্রিশ ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া, কাজেই সী রবিন দু'হাজার প্যাসেঞ্জার গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। ধারণ ক্ষমতার বেশি লোক উঠলে জাহাজ উল্টে যাবে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে সার্ভিসিং-এর জন্যে হেলিকপ্টারটাকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে: ওটা থাকলে আহত লোকজনকে দ্রুত কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়তো সম্ভব হত।

পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা ক্যাপটেন শেফার্ড ডেকে পায়চারি করছেন, সেই সঙ্গে যখন যেটা মনে পড়ছে নির্দেশ দিচ্ছেন ক্রুদের। এলাকার অন্যান্য জাহাজকে খবর দেয়ার নির্দেশ পেয়ে সেটা পালন করেছে রেডিও অপারেটর, কিন্তু এখনও কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছে না সে। কাছাকাছি বলতে একশো মাইল দূরে দুটো জাহাজ আছে। একটা ফ্লাইং কার্পেট, ভারতীয় কন্টেইনার শিপ। ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন জানিয়েছেন ফুলস্পীডে রওনা হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়টা উত্তর কোরিয়ান মিসাইল ক্রুজার। সেটাও বঙ্গোপসাগরে ঢুকে পড়েছে। তবে অকুস্থলে পৌঁছাতে এখনও তেষট্টি মাইল পাড়ি দিতে হবে ওটাকে।

পনেরো মিনিট পর সী রবিনের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রু, অফিসার ও বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে যে অবিশ্বাস্য নাটক উন্মোচিত হতে শুরু করল তা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় থাকল না কারও। এক সময় যেটা ছিল হাসি-

আনন্দে ভরপুর বিলাসবহুল ভাসমান রাজপ্রাসাদ, এখন সেটা প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত চিতা।

বাতাস তীব্র হয়ে উঠছে, সাগর হয়ে উঠছে রুদ্র, আড়াআড়িভাবে ভেসে আসা ওয়াটার লিলিকে দেখে হতভম্ব রানা ও ক্যাপটেন শেফার্ড ভেবে পাচ্ছেন না সার্ভে শিপ সী রবিন এই করুণ বিপদে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে। 'হায় যীশু! বোটে কেউ চড়তেই পারেনি!' বিড়বিড় করলেন ক্যাপটেন।

'পানিতে নামানোর সময় পাওয়া যায়নি, তার আগেই পুড়ে গেছে,' আন্দাজ করল রানা।

ওয়াটার লিলির স্টার্নের দিকে বিনকিউলার তাক করলেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'লোয়ার ডেক থেকে লোকজন টপাটপ লাফ দিচ্ছে। কিন্তু ওপরের ডেকে ওরা সবাই যেন জমে পাথর হয়ে গেছে!'

'ওপরের ডেক নয় কি দশতলা উঁচু,' বলল রানা। 'ওখান থেকে নিচের পানি এক মাইল দূরে মনে হবে।'

রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে ক্রুদের নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন শেফার্ড, 'বোট ছাড়ো। লোকজন অন্ধকার সাগরে ভেসে যাবার আগে তুলে নাও।'

আফটারডেকে বেরিয়ে আসতে পারায় পুড়ে মরার ভয় আপাতত কেটে গেছে, আরোহীরা আগের চেয়ে শান্ত এখন, অন্তত একটা উদ্ধারকারী জাহাজ দেখতে পেয়ে বাঁচার স্বপ্নও দেখছে তারা। ইতিমধ্যে বুলহর্নের মাধ্যমে সী রবিন ও ওয়াটার লিলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে–একদিক থেকে রানা কথা বলছে, আরেক দিক থেকে নিক গোয়েন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়ে আছে এরকম পরিবারগুলোকে ক্রেইন ও ক্রেডলের সাহায্যে সবার আগে সী রবিনে নিয়ে আসা হবে। সী রবিন-এর বোটগুলো অবশ্য এরই মধ্যে পানি থেকে বহু লোককে তুলে নিয়েছে। তবে স্রোতের টানে বেশ কিছু লোক ভেসেও গেছে, বেশিরভাগই অবশ্য লাশ–পানিতে লাফিয়ে পড়ার সময় আহত হয়ে মারা গেছে।

ভয়ে তৃষার দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। 'নুমা' লেখা সার্ভে শিপটা এত কাছে মনে হচ্ছে, অথচ কত দূরে। সামনে এখনও দশজন লোক রয়েছে, তারা মই বেয়ে নেমে গেলে ওদের পালা। মেয়ের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছেন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম, শৃংখলা বজায় রেখে বাঁচার সুযোগ নিতে চান, হুড়োহুড়ি করে অন্যায় সুযোগ নিতে রাজি নন। কিন্তু পিছন থেকে জনস্রোতের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে পড়ছেন তিনি। আগুনের আঁচ আর ধোঁয়াও কম ভোগাচ্ছে না। অকস্মাৎ প্রকাণ্ডদেহী এক লালচুলো লোক ভিড়ের ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেও এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রাখলেন, যেন প্রাণ থাকতে ওটা ছাড়তে রাজি নন।

আতংকে নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে, বাবার সঙ্গে অচেনা এক লোককে ধস্তাধস্তি করতে দেখছে তৃষা। জাহাজের কালো এক অফিসার, ইউনিফর্মে এতটুকু দাগ বা ভাঁজ নেই, চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে ঘটনাটা দেখছে। পাথর কেটে

তৈরি করা নিষ্প্রাণ একটা অবয়ব। তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল তৃষা। 'কিছু একটা করুন! ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমার বাবাকে সাহায্য করুন!'

তৃষার কথা যেন শুনতেই পায়নি, বা শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করছে না, এগিয়ে এসে লালচুলো শ্বেতাঙ্গকে সাহায্য করল নিগ্রো অফিসার।

দু'জনের সঙ্গে একা পেরে উঠলেন না সিরাজুল ইসলাম, ভারসাম্য হারিয়ে রেইলিঙের ওপর শিরদাঁড়া দিয়ে পড়লেন, তারপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেলেন জাহাজ থেকে। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত, শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো দু'জনেই মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল, তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল জনস্রোতের ভেতর। আতংকে আর্তনাদ করে উঠে রেইলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল তৃষা, দেখল ঝপাৎ করে সাগরে পড়ে ডুবে গেলেন সিরাজুল ইসলাম।

তৃষার মনে হলো এক ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে আছে, আসলে মাত্র বিশ সেকেন্ড পর পানির ওপর ভেসে উঠল সিরাজুল ইসলামের মাথা। এত ওপর থেকে পতনের ফলে তাঁর শরীর থেকে লাইফ ভেস্ট খুলে বেরিয়ে গেছে। তৃষার মনে হলো, বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাঁর মুখ বারবার ডুবে যাচ্ছে পানিতে, ঘাড়টা যেন নড়বড় করছে।

হঠাৎ, আগাম কোন আভাস ছাড়াই, গলার চারধারে কার যেন শক্ত হাতের চাপ অনুভব করল তৃষা। মৃত্যুভয়ে উন্মাদিনী, পিছন দিকে পা ছুঁড়ছে, সেই সঙ্গে হাত দিয়ে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করছে সে। একটা শক্ত লাথি শত্রুর উরুসন্ধিতে লাগতে গলা পেঁচিয়ে ধরা আঙুলগুলোয় ঢিল পড়ল। বন করে ঘুরতেই আবার সেই কালো অফিসারকে দেখতে পেল তৃষা।

স্পর্শকাতর জায়গায় ব্যথা পেয়েছে, তাই এক পাশে সরে গিয়ে তার লালচুলো সহকারীকে তৃষার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিল নিগ্রো। কিন্তু তার আগেই লাইফ ভেস্টের কলার এক হাতে চেপে ধরে লাফ দিল তৃষা, রেইলিং টপকে জাহাজ থেকে বেরিয়ে গেল। লালচুলো স্যাৎ করে হাত বাড়িয়েও আধ ইঞ্চির জন্যে তাকে ধরতে পারল না।

বুদ্বুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পানির তলায় নেমে এল তৃষা, পানির ওপর মাথা তুলে দেখল দুই জাহাজের মাঝখানে রয়েছে সে, হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে চোখ বুলাতে বাবাকে দেখতে পেল প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে। লাইফ ভেস্ট ওকে ভেসে থাকতে সাহায্য করছে, সাঁতরে সেদিকে এগোচ্ছে, চিৎকার করে ডাকল, 'আব্বু!'

বাবার নাগাল পেয়ে তাঁর কাঁধ আঁকড়ে ধরল তৃষা, ঝাঁকি দিয়ে আবার চিৎকার করল, 'আব্বু!'

সিরাজুল ইসলাম এখনও জ্ঞান হারাননি। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর চোখের পাতা খুলল একটু। মুখ বিকৃত হয়ে আছে, যেন অসহ্য ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। 'তৃষা, লক্ষ্মী মা আমার, নিজেকে বাঁচাও,' থেমে থেমে বললেন তিনি। 'আমি পারব না।'

'বললেই হলো! আমি তোমাকে ধরে আছি। এখনি একটা বোট এসে তুলে নেবে আমাদের।'

বাদামী লেদার ব্যাগটা এখনও শক্ত করে ধরে আছেন, মেয়ের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন সিরাজুল ইসলাম। 'পানিতে পড়ার সময় ব্যাগটার বাড়ি খেয়েছি

পিছনে। কিছু করার নেই রে, মা—আমার শিরদাঁড়া বোধহয় ভেঙে গেছে।'

'না…কি…অসম্ভব!'

'তুই থাম। আমি ঠিক বলছি। আমার শরীরে কোন সাড় নেই, অবশ হয়ে গেছে; আমি সাঁতরাতে পারছি না।'

গায়ে এসে ধাক্কা মারল একটা লাশ। সেটাকে এক হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল তৃষা। 'তুমি যাই বলো, আমি তোমাকে ছাড়ছি না…'

সিরাজুল ইসলাম হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাগটা তো আগে ধর।' মেয়ের হাতে এবার জোর করে ব্যাগটা ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'শোন। এটাকে যত্ন করে, নিরাপদে রাখা চাই। কি বলছি বুঝতে পারছিস? নির্দিষ্ট, যথার্থ সময় পর্যন্ত…'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'সময় হলে পারবি–,' শব্দগুলো কোন রকমে শোনা গেল। হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে গেল শরীরটা, সিরাজুল ইসলাম মারা গেলেন।

বাবাকে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে তৃষা আর কাঁদছে।

তিন

প্রথম ত্রিশ মিনিটে পানি থেকে পাঁচশোর কিছু বেশি লোককে সী রবিনের বোটে তুলে নেয়া হয়েছে। আরও দুশো লোক সী রবিন থেকে ফেলা ভেলায় চড়েছে। উদ্ধারকারীরা শুধু জীবিত মানুষদের সাহায্য করছে। বোটে তোলার পর কাউকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে আবার পানিতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তাকে, তার জায়গায় তোলা হচ্ছে এখনও যারা বেঁচে আছে তাদের কাউকে।

বোটগুলো জাহাজের পিছন দিকে এসে খালি হচ্ছে। যাদের শক্তি আছে তারা মই বেয়ে উঠছে সী রবিনে। যারা ক্লান্ত ও অসুস্থ তাদেরকে ক্রেইন আর স্লিং-এর সাহায্যে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি বোট খালি হওয়া মাত্র আবার ফিরে যাচ্ছে পানি থেকে মানুষ তুলে আনতে। তারপরও সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারা যাচ্ছে না। যত লোককে বোটে তোলা সম্ভব হচ্ছে তারচেয়ে অনেক বেশি লোক ওয়াটার লিলি থেকে লাফ দিচ্ছে পানিতে।

রেসকিউ অপারেশন রানা পরিচালনা করছে, ওকে সাহায্য করছেন ক্যাপটেন শেফার্ড। একসময় ও লক্ষ করল, এখনও হাজারখানেক লোককে উদ্ধার করা বাকি, অথচ সী রবিন-এর অবস্থা দাঁড়িয়েছে ডুবু ডুবু। ছুটে পাইলটহাউসে চলে এল ও, টিমোথিকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা?'

কমপিউটর থেকে থমথমে মুখ তুলে মাথা নাড়ল টিমোথি। 'খারাপ, সার। জাহাজ আর তিন ফুট নিচু হলে সাবমেরিন হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখনও এক হাজার লোককে উদ্ধার করা রাকি।'

কথা না বলে টিমোথি শুধু মাথা নাড়ল।

'কেন, জাহাজ হালকা করলে?' রানা নাছোড়বান্দা। 'নোঙর আর চেইন কেটে ফেলে দাও। সাবমারসিবলগুলোও ভাসিয়ে দাও, পরে তুলে নেয়া যাবে। দশ পাউন্ডের বেশি ওজন এমন প্রতিটি ইকুইপমেন্ট ফেলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ হালকা করার কাজ শুরু হয়ে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যে পানির ওপর ছয় ইঞ্চি উঠল সী রবিন। এরপর প্রতিটি বোটকে রানার নির্দেশে পৌঁছে দেয়া হলো—সামর্থ্য অনুসারে পানি থেকে লোক তোলো, কিন্তু জাহাজ আর কাউকে নেবে না।

ওয়াটার লিলির সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েনের সঙ্গে আবার বুলহর্নের মাধ্যমে কথা বলল রানা। গোয়েনই প্রথমে জানতে চাইল, 'আপনারা আর কত লোককে নিতে পারবেন?'

'আপনারা বাকি আছেন কতজন?'

'এই ধরুন চারশো। প্যাসেঞ্জাররা পালাবার পর এরা বেশিরভাগই ক্রু।'

'নামিয়ে দিন ওদের,' বলল রানা। 'আর কেউ নেই তো?'

'আছে। ক্রুদের অর্ধেক রয়ে গেছে বো-তে।'

'সংখ্যাটা বলতে পারেন?'

'আরও সাড়ে চারশো।' গোয়েন এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'আপনার নামটা জানতে পারি, সার?'

'মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আপনি?'

'নিক গোয়েন, সেকেন্ড অফিসার।'

'আপনার ক্যাপটেন কোথায়?'

'তিনি নিখোঁজ,' জবাব দিল গোয়েন। 'ধারণা করা হচ্ছে মারা গেছেন।'

'ঠিক আছে, আপনার জন্যে গরম কফি নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা–,' চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়ে ঝট করে ঘুরল রানা, বুলহর্ন ছেড়ে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে লাইনে আটকানো ক্রেডল থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল ছোট্ট এক মেয়েকে, তুলে দিল বাড়ানো জিনা ক্যারল-এর হাতে। ক্যারল সী রবিনের তিন মেরিন বায়োলজিস্টের একজন। মা ও বাবাও পরবর্তী দুই ক্রেডলে চড়ে জাহাজে উঠলেন, নিজেদের বাচ্চাকে নিয়ে গাইডের সঙ্গে নিচে চলে গেলেন তাঁরা। এক মুহূর্ত পর দেখা গেল লোকজনকে পানি থেকে ওঅর্ক ডেকে তুলছে রানা, এতই ক্লান্ত যে নিজেরা তারা রেসকিউ বোটে উঠতে পারছে না। 'ঘুরে ক্রুজ শিপের পোর্ট সাইডে চলে যাও,' বোটের হেলমস্‌ম্যানকে নির্দেশ দিল ও। 'চেষ্টা করে দেখো স্রোতে ভেসে যাওয়া লোকজনকে তুলতে পারো কিনা।'

কচি গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারটা যেন ওর দু'পায়ের মাঝখান থেকে ভেসে এল। রেইলের দিকে ছুটে এসে নিচে তাকাল রানা। আট বছরের একটা ছেলে, জাহাজের গায়ে লেগে থাকা একটা রশি ধরে ঝুলছে। যেভাবেই হোক জাহাজে ওঠার পর কিনারা থেকে পড়ে গেছে. ব্যস্ত ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করেনি। একটা ঢেউ এসে ছেলেটাকে ওপর দিকে তুলল, নাগালের মধ্যে পেয়ে তাকে ধরে ডেকে নিয়ে এল রানা। জানা গেল মা-বাবা ও এক বোনের সঙ্গে জাহাজে ওঠার সময় পড়ে যায় সে, কিন্তু ঘটনাটা কারও চোখে

পড়েনি। একেও রানার কাছ থেকে চেয়ে নিল জিনা, ছেলেটার হাত ধরে বলল, 'চলো, তোমার মা-বাবাকে খুঁজে বের করি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে নীল সবুজ পানিতে কালো চকচকে সিল্কের মত কিছু একটা চোখের কোণে ধরা পড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার পরও জিনিসটা ঠিক চিনতে পারছে না রানা। তারপর একটা হাত দেখা গেল, যেন স্লো-মোশনে পানিতে আছাড় খাচ্ছে। ডেক ধরে বিশ ফুট ছুটে এল রানা ভাল করে দেখার জন্যে, ধারণা করছে কালো চকচকে সিল্ক আসলে কোন মেয়ের চুল। পানির ওপর মাথাটা সামান্য একটু তুলল—হ্যাঁ, একটা মেয়েই; তার আচ্ছন্ন কালো চোখ দেখতে পেল রানা। এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক, তবু ওর মনে হলো এত সুন্দর চোখ খুব কমই দেখা যায়, এবং এই চোখ কোথায় যেন আগেও দেখেছে।

'তোলো ওকে!' হাত তুলে রেসকিউ বোটের হেলমস্‌ম্যানকে বলল রানা। কিন্তু বোট ঘুরে এরইমধ্যে ওয়াটার লিলির স্টার্ন অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে, ওর কথা হেলমস্‌ম্যান শুনতেই পেল না। 'আমার দিকে সাঁতরান!' মেয়েটার উদ্দেশে চিৎকার করল, তারপর খেয়াল করল এদিকে তাকালেও ওকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে রেইলিঙের ওপর উঠে দাঁড়াল রানা, ভারসাম্য ঠিক করতে এক মুহূর্ত সময় নিল, তারপর ডাইভ দিল সাগরে। তখনি পানির ওপর মাথা না তুলে ডুব সাঁতার দিয়ে এগোল ও। বিশ ফুট এভাবে সাঁতরে মেয়েটার পাশে মাথা তুলল, পানিতে ডুবে থাকা মেয়েটার মুখ উঁচু করার সময় দেখল বুকের সঙ্গে এক হাত দিয়ে একটা লেদার ব্যাগ চেপে ধরে আছে সে।

'পাগল নাকি!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'ছেড়ে দিন ওটা!'

'না!' মেয়েটার গলায় জেদের সুর রানাকে অবাক করে দিল। 'এটা ছাড়া যাবে না!'

রানা খুশি যে মেয়েটা মারা যাচ্ছে না, তাই ব্যাপারটা নিয়ে কোন তর্ক করল না; তার শরীরে সেঁটে বসা নাইট ড্রেস-এর একটা প্রান্ত ধরে টেনে নিয়ে এল সী রবিনের পাশে। কয়েক জোড়া হাত ওপরে উঠতে সাহায্য করল মেয়েটাকে। রানা উঠল রশির মই বেয়ে। ইতিমধ্যে সী রবিনের এক মেয়ে বিজ্ঞানী কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটার গায়ে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, পিছন থেকে রানা জানতে চাইল, 'ব্রিফকেসটায় কি এমন আছে যে ওটাকে রক্ষা করতে গিয়ে ডুবে মরার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন?'

ক্লান্ত চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'এতে আছে আমার বাবার সারা জীবনের সাধনার ফল।'

লেদার ব্যাগটার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'আপনার বাবাকে উদ্ধার করা হয়েছে কি না জানেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল তৃষা, ঘাড় ফিরিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে সাগর আর ঢেউগুলোর দিকে তাকাল। ওদিকে অনেক লাশকেই ভাসতে দেখা যাচ্ছে। 'বাবাকে ওখানে ফেলে আসতে হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। তারপর ঘুরে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে গেল।

*

রানার নির্দেশ মত স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া লোকজনকে তোলা হচ্ছে বোটগুলোয়, তাদের মধ্যে শুধু অসুস্থদের সী রবিনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে, বাকি সবাই থেকে যাচ্ছে বোটেই।

সী রবিনের এঞ্জিন রুম, সায়ান্টিফিক স্টোর রুম, মেস রুম থেকে শুরু করে পাইলটহাউস, চার্ট রুম, রেডিও রুম পর্যন্ত আশ্রিত লোকজনে ভরাট হয়ে গেছে। প্রতিটি প্যাসেজওয়ে ভর্তি। ক্যাপটেন শেফার্ডের কেবিনে আশ্রয় নিয়েছে পাঁচটা পরিবার।

ওয়াটার লিলি থেকে সবার শেষে সী রবিনে এল নিক গোয়েন। তার পোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য যে সাহসী একজন লোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেইক করতে পারছি না।'

'দুঃখটা আপনার চেয়ে আমারই বরং বেশি,' জবাবে বলল গোয়েন। 'কারণ, সাহস যদি কেউ দেখিয়ে থাকে তো সে আমি নই, বরং আপনি। এতগুলো মানুষ কেউ বাঁচত না ঠিক সময়মত আপনি যদি আগুনটা লক্ষ্য করে ছুটে না আসতেন।' সাগরের দিকে তাকাল সে 'দুঃখ এই যে এখনও বো-র দিকে কত লোক ডুবছে জানি না...'

'ওদিকে বোট পাঠানো হয়েছে, যারা বেঁচে আছে তাদের সবাইকে উদ্ধার করা হবে।' তাকে আশ্বস্ত করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল রানা, তারপর ব্রিজ উইং-এ দাঁড়ানো ক্যাপটেন শেফার্ডের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল, 'এদিকে আর কেউ নেই, মিস্টার শেফার্ড। আমাদের এখন বো-র দিকে যাওয়া দরকার।'

ব্রিজে ফিরে এসে হেলম্‌স্‌ম্যান টিমোথিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন শেফার্ড। দুটো জাহাজ স্রোতের টানে ভাসছে; ওয়াটার লিলির এঞ্জিন অনেক আগেই থেমে গেছে, সী রবিনের চালু এঞ্জিনগুলোকে অলস বসিয়ে রাখা হয়েছে। ক্যাপটেনের নির্দেশ পেয়ে দিক বদলের জন্যে হেলম্‌স্‌ম্যান টিমোথি এতক্ষণে ওগুলোকে কাজে লাগাল। থ্রাস্টার কন্ট্রোল কনসোল অপারেট করার সময় যথেষ্ট মনোযোগী থাকল সে, কিন্তু আকস্মিক একটা জোরালো দমকা বাতাস এসে তার সমস্ত হিসাব ও আন্দাজ গোলমাল করে দিল। বাতাসের সঙ্গে ঢেউও উঠল স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু হয়ে, ওয়াটার লিলির স্টার্ন অকস্মাৎ প্রায় লাফ দিয়ে ছুটে এসে আঘাত করতে উদ্যত হলো সী রবিনের বো-তে। সাধ্যমত সব রকম চেষ্টা চালিয়ে টিমোথি যখন অবধারিত সংঘর্ষ এড়াতে পেরেছে বলে ধারণা করল ঠিক তখনই আরেকটা দমকা বাতাস—সী রবিনের বো-তে গুঁতো মারল ওয়াটার লিলির স্টার্ন।

প্রচণ্ড ঝাঁকি। সেই সঙ্গে সী রবিনের জনসমুদ্র থেকে একযোগে রোমহর্ষক আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ধাক্কাটা মারাত্মক হবার সম্ভাবনা কম, তারপরও কনসোলের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে টিমোথিকে নিচে পাঠালেন ক্যাপটেন শেফার্ড ক্ষতির পরিমাণ দেখে আসার জন্যে।

রিপোর্ট এল দু'জায়গা থেকে। চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার এঞ্জিন রুম

থেকে জানালেন, তাঁর ধারণা সামনের দিকে জাহাজের কাঠামোয় কোথাও ক্ষতি হয়েছে, সম্ভবত কোন একটা স্টোর রুমে। এঞ্জিন রুমে পানি ঢুকছে, মেইন পাম্প চালু করে পানি সরাবার কাজও তিনি শুরু করে দিয়েছেন।

পাইলটহাউসে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে টিমোথি রিপোর্ট করল, 'বেশ কয়েকটা প্লেট ভেঙে গেছে, তুবড়ে যাওয়ায় ফাটলও সৃষ্টি হয়েছে। পানি ঢোকার গতি খুব বেশি, পাম্প তারচেয়েও দ্রুত বের করে দিচ্ছে কিন্তু ফাটল আরও চওড়া হলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না। ঢেউ আট ফুট উঁচু হলে আমাদের কোন আশা নেই।'

'ড্যামেজ-কন্ট্রোল ক্রুদের কাজে লাগিয়ে দাও খোলে,' নির্দেশ দিলেন শেফার্ড। 'ক্ষতিগ্রস্ত প্লেট যতটা পারা যায় মেরামত করতে বলো। খারাপ বা ভাল, পরিস্থিতির যে-কোন পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

'ইয়েস, সার।' টিমোথি আবার বেরিয়ে গেল ব্রিজ থেকে।

কমপিউটরে চোখ, ক্যাপটেন শেফার্ড রানাকে বললেন, 'ঝড়টা আঘাত করবে আর দু'ঘণ্টা পর।' বাইরের আলোকিত আকাশে তাকালেন; ঘন কালো মেঘের স্তর খুব বেশি হলে দশ মাইল দূরে। 'সী রবিনকে ভাসিয়ে রাখার কোন উপায় আমার অন্তত জানা নেই।'

শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। 'লোকজন যা তোলা হয়েছে, আমার হিসেবে একশো বিশ টন অতিরিক্ত বোঝা বহন করছে সী রবিন,' বলল ও। 'বাঁচার উপায় আমাদের একটাই—যতক্ষণ দরকার ভেসে থেকে অন্য কোন জাহাজে মানুষগুলোকে তুলে দেয়া।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'আমাদের, মানে বাংলাদেশের কোন পোর্টে পৌঁছানো সম্ভব নয়?'

গম্ভীর, মাথা নাড়লেন শেফার্ড। 'এরকম ডুবুডুবু অবস্থায় এক মাইলও এগোতে পারব না, তার আগেই জাহাজ ডুবে যাবে।'

'ভারতীয় কন্টেইনার শিপ আর উত্তর কোরিয়ার মিসাইল ফ্রিগেট-এর খবর কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রেডার রিপোর্ট বলছে ফ্লাইং কার্পেট আর মাত্র দশ মাইল দূরে। উত্তর কোরিয়ার ফ্রিগেট ফুলস্পীডে আসছে, তবে এখনও ত্রিশ মাইল পেরুতে হবে ওটাকে।'

'ওদেরকে আরও তাড়াতাড়ি আসতে বলুন,' ভারী গলায় বলল রানা। 'ঝড়টা যদি ওদের আগে পৌঁছায়, ওরা এসে উদ্ধার করার মত কাউকে নাও পেতে পারে।'

চার

ওয়াটার লিলির ভেতরটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে—বাল্কহেড কাত হয়ে পড়ছে আরেক বাল্কহেডে, ডেক ধসে পড়ছে আরেক ডেকে। আগুন লাগানোর দু'ঘণ্টারও কম

সময়ের মধ্যে জাহাজটার বিলাসবহুল ও উঁচুমানের শিল্প সমৃদ্ধ ভেতরটা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভেতরের সুপারস্ট্রাকচার নারকীয় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল। শপিং অ্যাভিনিউ-এর সারি সারি দোকান, আটাত্তর মিলিয়ন ডলার মূল্যের আর্ট কালেকশন, প্রশস্ত ক্যাসিনো, সুদৃশ্য ডাইনিং রূম আর লাউঞ্জ, বিলাসবহুল স্টেট রূম, স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিজ, সবই ধূমায়িত ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। সী রবিনের খোলা ডেকে যারা ভিড় করেছে তাদের কারও চোখে যেন পলক পড়ছে না, এমন কি কাজের লোকেরাও কাজ ফেলে অবাক বিস্ময় এবং শোক মেশানো অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওয়াটার লিলির দিকে। ক্যাপটেন শেফার্ড অত্যন্ত সাবধানে তাঁর জাহাজকে ওয়াটার লিলির বো-র দিকে সরিয়ে আনছেন।

ওয়াটার লিলির আগুন বৃত্তাকার সুপারস্ট্রাকচার গিলে ফেলেছে। জাহাজের মাঝখানে এমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই যাতে আগুন ধরা বাকি। হঠাৎ জাহাজের গভীরে কোথাও বিস্ফোরণ ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল নতুন কিছু শিখা। ওয়াটার লিলি নির্যাতিত একটা পশুর মত কাঁপছে। অথচ এখনও যেন ডুবে যেতে রাজি নয় সে, ঢেউ-এর তলা থেকে প্রতিবার ঠিকই উঠে আসছে। একটু পরই শূন্য একটা ইস্পাতের খোলে পরিণত হবে ওটা। আগুন নেভার পরও যদি ভেসে থাকে, কোন শিপইয়ার্ডে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাঙা হবে ওটাকে।

বিষণ্ন, সর্বনাশা আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা; ওর পাশে এসে দাঁড়াল ওয়াটার লিলির সেকেন্ড অফিসার নিক গোয়েন। তার মুখে কোন কথা নেই, তাকিয়ে আছে সী রবিনের পিছু নেয়া এক ঝাঁক বোটের দিকে–প্রতিটি ওয়াটার লিলির প্যাসেঞ্জারে ঠাসা।

'আপনার হাতের কি অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

সাদা ব্যান্ডিজের ওপর চোখ রেখে গোয়েন বলল, 'বাথরূমে যাবার কথা ভাবলেই ভয় লাগছে।'

মৃদু একটু হাসল রানা।

চোখ ছল ছল করছে, ওয়াটার লিলির দিকে তাকাতে নিজেকে বাধ্য করল গোয়েন। 'এরকম একটা ঘটনা···উচিত হলো না, একদমই উচিত হলো না।' আবেগে শুধু গলা নয়, তার শরীরও কাঁপছে।

'আপনার কি ধারণা? কিভাবে ঘটল?'

ভাসমান অগ্নিকুণ্ড থেকে চোখ সারিয়ে এনে রানার দিকে তাকাল গোয়েন। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে এটা কোন দুর্ঘটনা নয়।'

'বলতে চাইছেন কোন টেরোরিস্টদের কাজ?' রানার গলায় অবিশ্বাস।

'আমার মনে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। দুর্ঘটনা হলে আগুনটা এত দ্রুত ছড়াল কিভাবে? কোন অটোমেটেড্ ফায়ার-ওয়ার্নিং বা ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ করেনি কেন? তারপর যখন ম্যানুয়ালি এনগেজ করা হলো, তখনও ওগুলো কাজ করল না।'

ছোট্ট করে শিস দিল রানা।

'আমাকে যেটা বিস্মিত করেছে, আপনাদের ক্যাপটেন ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাতে ব্যর্থ হলেন কেন। আমরা এগিয়ে আসি আকাশের গায়ে লাল আভা

দেখে। রেডিও সিগন্যালও পাঠাই, কিন্তু আপনারা জবাব দেননি।'

'এরজন্যে দায়ী আমাদের ফার্স্ট অফিসার এরিক বার্কম্যান। সিদ্ধান্ত নিতে একের পর এক ব্যর্থ হন তিনি। আমি যখন ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবার নির্দেশ দিই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে–রেডিও রূম ততক্ষণে পুড়ে ছাই।'

ওয়াটার লিলির উঁচু বো-র দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ওখানে বেশ কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে।'

ক্রুজ শিপের ফোরডেক থেকে হাত নেড়ে সী রবিনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে বহু মানুষ। চোখ ছোট করে সেদিকে তাকিয়ে গোয়েন চলল, 'বেশিরভাগই ক্রু, প্যাসেঞ্জার খুব কম। আগুনটা উল্টোদিকে যাচ্ছে, ধরে নিতে পারি আরও কিছুক্ষণ নিরাপদে ওখানে থাকতে পারবে ওরা।'

পাইলটহাউস থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাপটেন শেফার্ড বললেন, 'সত্যি উপায় নেই, থাকলে ওদেরকেও আমরা সী রবিনে তুলে নিতাম।'

কান্না চেপে মাথা নিচু করল গোয়েন। 'আমি জানি।'

'তবে, মিস্টার শেফার্ড,' বলল রানা, 'ঝড় আসার আগে আমরা একটা কাজ করতে পারি। সী রবিনকে ঘুরিয়ে এমন একটা পয়েন্টে দাঁড় করান, টানা বাতাস যেন ওদেরকে না লাগে। সী রবিন নিজেও স্রোতের দিকে মুখ করে থাকবে, ঢেউগলো যাতে স্টার্নে আঘাত করে, ফলে বো-র ফাটল দিয়ে খুব বেশি পানি ঢোকার ভয়টাও থাকবে না।'

'সত্যি চমৎকার একটা পরামর্শ।' মাথা ঝাঁকালেন শেফার্ড। 'ভাবছি আমাদের বোটগুলোকে স্টার্নের সঙ্গে বেঁধে রাখি। যদি দেখি ঝড় ওগুলোকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, প্যাসেঞ্জারদের জাহাজে তুলে নিতে পারব। তারপর? তারপর যা থাকে কপালে!'

সূর্য আগেই আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, সমস্ত নীলও ঢাকা পড়ে গেছে ঘন কালো দ্রুতগতি মেঘে; ঝড় শুরু হলো তুমুল বর্ষণের সঙ্গে, দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে না গেলেও ওয়াটার লিলির উঁচু বো সী রবিনের খোলা ডেক থেকে অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখাচ্ছে। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে নেভা তো দূরের কথা, ক্রুজ শিপের আগুন আরও যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

সী রবিনের অবস্থা ভাল নয়, তীব্র বাতাস আর বিশাল আকারের ঢেউ ডোবাবার আগে জাহাজটাকে নিয়ে যেন খেলছে।

'ওয়াটার লিলিতে যারা রয়েছে তাদের কারও কাছে রেডিও নেই?' গোয়েনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অফিসার সবার কাছে একটা করে পোর্টেবল রেডিও থাকে।'

'ফ্রিকোয়েন্সী?'

'টোয়েনটি-টু।'

রেডিওটা মুখের কাছাকাছি ধরে ওয়াটার লিলির যে-কোন অফিসারকে ডাকছে রানা। তিনবারের বার সাড়া পাওয়া গেল।

'শুনতে পাচ্ছি, সী রবিন। তবে অস্পষ্ট।'

চোখে একটু অবিশ্বাস ও বিস্ময়, গোয়েনের দিকে তাকাল রানা। 'ইনি একজন মহিলা।'

'গলার আওয়াজটা মনে হচ্ছে আমাদের চীফ পারসার লিয়া লিমন-এর,' বলল গোয়েন।

'আমি কি লিয়া লিমনের সঙ্গে কথা বলছি?' মাউথপীসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

'আপনার সেকেন্ড অফিসার আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'নিক গোয়েন? আল্লাহ মেহেরবান! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম উনি মারা গেছেন।'

সী রবিনের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা। সাড়ে চারশো কেন, দশজন লোককেও নেয়া যাবে না। কাজেই ওয়াটার লিলির বো থেকে কেউ যেন লাফিয়ে না পড়ে। হ্যাঁ, সী রবিনের বোটগুলোও লোকে ভর্তি হয়ে আছে। তবে হতাশ হবারও কিছু নেই, কারণ ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেট আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক পর্যায়ে রানার নাম জানতে চাইল লিয়া লিমন। তারপর বলল, 'দিলেন দুঃসংবাদ, অথচ শুনে মনে হলো সুসংবাদ–যদি দেখা হয় জানতে চাইব এই আর্ট আপনি শিখলেন কোত্থেকে।'

বৃষ্টি পড়ছে নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মত, তাসত্ত্বেও ওয়াটার লিলি এখনও পুড়ছে। জাহাজটার পাশগুলো টকটকে লাল হয়ে আছে, দাউ দাউ আগুনকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল বিশাল মেঘ আকৃতির বাষ্প।

রানার পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট একটা পজিশনে আনা হয়েছে সী রবিনকে, এখানে ঝড় ঠেকানোর উপযোগী একটা আড়াল হিসেবে কাজ করবে ওটা, ওয়াটার লিলির বোতে আশ্রয় নেয়া লোকজন যাতে ধকলটা সামলে উঠতে পারে।

রানার চোখে বিনকিউলার, ওর দিকে ফিরে ক্যাপটেন শেফার্ড জানতে চাইলেন, 'উত্তর কোরিয়ান ফ্রিগেটের কোন আভাস পাচ্ছেন?'

'বৃষ্টির জন্যে বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। তবে রেডার-এ দেখছি কন্টেইনার শিপ এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে।' একটা রুমাল বের করে গলা আর ভুরুর ঘাম মুছল রানা।

ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব ব্রিজ কাউন্টারে পা তুলে দিয়ে রেডার-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। এমনিতে হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু ডিসট্রেস কল পাবার পর গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন না জানি কি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়।

'ওই!' ফার্স্ট অফিসার সানি ওবরয় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ব্রিজ উইন্ডশীল্ড-এর দিকে হাত তুলে স্টারবোর্ড বো-র সামনেটা দেখাচ্ছে। বৃষ্টির দেয়ালে মুহূর্তের জন্যে ফাটল সৃষ্টি হলো, তার ভেতর ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল ধোঁয়া ও বাষ্পে মোড়া জ্বলন্ত ক্রুজ শিপ।

শিউরে উঠলেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তব। 'ক্ষতির পরিমাণ কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি।'

'সার, আমি তো কোন আমেরিকান সার্ভে শিপ দেখছি না।'

'বোট রেডি রাখো,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তব। ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে শুরু করেছে, ঢেউ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে আরও, তবে ফ্লাইং কার্পেট এত বড় জাহাজ যে সে যেন কিছু টেরই পাচ্ছে না। জ্বলন্ত ওয়াটার লিলিকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় সবুজ হরফে লেখা নামটা দেখতে পেলেন তিনি–সী রবিন। বঙ্গোপসাগরে আসা-যাওয়ার পথে নুমার এই সার্ভে ভেসেলকে আগেও দেখেছেন, এবার দেখে আঁতকে ওঠার সেটাই কারণ। সাগরে একটা মনোহর সাদা রাজহাঁস ওটা। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ঝড়ো কাক যেন, ডুবে যাচ্ছে। 'হে ভগবান! ওটা তো ডুবল বলে!'

রেডিও অপারেটর রেডিও রূম থেকে উঁকি দিল। 'সার, মার্কিন জাহাজ থেকে কেউ যোগাযোগ করছেন।'

'স্পীকারে সংযোগ দাও।'

'কন্টেইনার শিপের ক্যাপটেন ও ক্রুদের অভিনন্দন,' অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ভেসে এল পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। 'আপনাদের দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।'

'ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব বলছি। কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, সার্ভে শিপের ক্যাপটেন?'

'না, ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড এঞ্জিন রূমে গেছেন জাহাজে কি হারে পানি ঢুকছে দেখার জন্যে।' নিজের পরিচয় দিয়ে সী রবিনের বিপদ আর ওয়াটার লিলির বো-তে আটকা পড়া লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা।

শ্রীবাস্তব জানতে চাইলেন, 'কতজনকে উদ্ধার করেছেন আপনারা?'

'প্রায় উনিশশো,' জানাল রানা। 'আরও একশো আছে বোটগুলোয়।'

'ভগবান!' আঁতকে উঠলেন শ্রীবাস্তব। 'আমরা বোট পাঠাচ্ছি, ওদেরকে পাঠাতে শুরু করুন। জাহাজ হালকা হতে শুরু করলে ওয়াটার লিলির বো-তে আটকা লোকজনকে আপনারা উদ্ধার করবেন।'

'বিশ্বাস করুন, মিস্টার শ্রীবাস্তব, আপনারা নির্ভেজাল আশীর্বাদ হয়ে হাজির হয়েছেন...'

'তবে এই উদ্ধার কাজের বিনিময়ে আমরা একটা ফি নেব,' শ্রীবাস্তব বললেন। 'স্যালভিজ অপারেশন-এর আন্তর্জাতিক রেট অনুসারে।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলেও নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল রানা। ফি দিতে হবে ওয়াটার লিলির কোম্পানিকে, কাজেই এ নিয়ে ওর মাথা না ঘামালেও চলে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেটা আপনাদের ব্যাপার,' বলল ও। 'তবে আমরা এই কাজটা এমনিই করছি, কিছু পাবার আশায় নয়।'

সী রবিনের একটা স্টোর রূমের ডেকে বসে রয়েছে তৃষা, ভাঁজ করা হাঁটু দুটোর মাঝখানে চিবুক ঠেকে আছে। তার এখনকার অনুভূতি নিজের কাছেই অপরিচিত, সম্পূর্ণ নতুন; যেন একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর রয়েছে সে, সময় এখানে

ধরাছোঁয়ার বাইরে। ছোট্ট কমপার্টমেন্টের ভেতর আশ্রিতদের সংখ্যা এত বেশি যে শুধু মেয়েরা বসতে পেরেছে, পুরুষরা সবাই দাঁড়িয়ে। মাথায় হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেও ওর প্রতি কারও কোন মনোযোগ নেই। বাবার মৃত্যু শোক ও বেদনার ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছে তার গোটা অস্তিত্বে।

ঘটনাটা কেন ঘটল? লালচুলো লোকটা কে, কেনইবা সে বাবার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল? আর নিগ্রো অফিসারটা? শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাকে বাধা না দিয়ে তাকে বরং সাহায্য করল কেন? তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাবার কাছ থেকে লেদার কেসটা কেড়ে নেয়া। হাঁটু থেকে মুখ তুলে ব্যাগটার দিকে তাকাল সে। এখনও ওটা নিজের বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছে। লেদারের গায়ে লবণের দাগ পড়েছে। ভাবল, কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এটার ভেতর যার জন্যে বাবাকে প্রাণ হারাতে হলো?

ক্লান্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে তৃষা, যুদ্ধ করছে ঘুমের সঙ্গে; মনে ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে বা একটু অসতর্ক হলে লালচুলো গুণ্ডাটা এসে লেদার ব্যাগটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু মানুষের গায়ের গরম ভেজা শরীরে আরাম এনে দিচ্ছে, এত লোকের ভিড় মনে জাগিয়ে তুলছে নিরাপত্তার ভাব, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল তৃষা।

ঘুম ভাঙাল হঠাৎ, এখনও ডেকে বসে, পিঠ ঠেকে আছে একটা লকারে–কিন্তু কি আশ্চর্য, স্টোর রুম খালি! কামরা ভর্তি লোক কে জানে কখন চলে গেছে। রয়েছে মাত্র একটা মেয়ে। তৃষা তাকে চিনতে পারল। এই মেয়েটা নিজের পরিচয় দিয়েছিল, মেরিন বায়োলজিস্ট। ঝুঁকে তৃষার কপাল থেকে আঙুলের নরম ছোঁয়া দিয়ে চুল সরাচ্ছে, তৃষা যেন ছোট্ট এক খুকি। মেয়েটার চোখ-মুখে রাজ্যের ক্লান্তি, কিন্তু তারপরও সহানুভূতি জানিয়ে হাসল 'এবার তো যেতে হয়,' নরম সুরে বলল সে। 'একটা ভারতীয় কন্টেইনার শিপ এসেছে, সবাইকে আমরা ওটায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই আমার। বিশেষ করে যে ভদ্রলোক আমাকে পানি থেকে তুলে বাঁচালেন...'

'জানি না কার কথা বলছেন আপনি,' মৃদু হেসে বলল মেয়েটা, কপাল থেকে সোনালি চুল সরাল।

তার নীল চোখে চোখ রেখে তৃষা জানতে চাইল, 'আমি কি এই জাহাজে থাকতে পারি না?'

'দুঃখিত, ভাই, তা সম্ভব নয়। জাহাজে পানি ঢুকছে, ঝড় থামার আগেই হয়তো ডুবে যাবে।' তৃষাকে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল মেরিন বায়োলজিস্ট। 'তাড়াতাড়ি করুন, তা না হলে কিন্তু বোট মিস করবেন।' স্টোর রুম ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে, প্যাসেজ থেকে আরও লোকজনকে ওপরের ডেকে তুলতে হবে তার, সেখান থেকেই ভারতীয় জাহাজ ফ্লাইং কার্পেটের পাঠানো বোটে উঠবে সবাই।

সারা শরীরে ব্যথা, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তৃষার। ধীর পায়ে, সাবধানে এগোচ্ছে। দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় দীর্ঘদেহী এক লোক তাকে

দাঁড় করাল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল তৃষা, মুখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল এক পা। এ সেই লালচুলো লোকটা, ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলিতে বাবার সঙ্গে যে ধস্তাধস্তি করেছিল। চৌকাঠ পেরিয়ে স্টোর রুমে ঢুকল সে, তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল কবাট।

'কি চান আপনি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'তোমার বাবার ব্রিফকেসটা,' লোকটা শান্ত, গলার সুর ঠাণ্ডা ও ভারী। 'দিলে তোমার কোন ক্ষতিই হবে না। না দিলে আমি তোমাকে খুন করতে বাধ্য হব।'

লোকটার চোখে নিষ্ঠুরতা দেখতে পাচ্ছে তৃষা। আচরণে আরও কি যেন একটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সেটা ধরেও ফেলল তৃষা। লেদার ব্যাগটা পেলেও লোকটা তাকে খুন করবে। 'বাবার কাগজ-পত্র? ওগুলোর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আমি ভাড়াটে লোক। আমার কাজ ওই ব্যাগ আর ব্যাগের ভেতরের জিনিসগুলো ডেলিভারি দেয়া। ব্যস।'

'ডেলিভারি...কাকে?'

'এত প্রশ্ন করবে না!' লোকটা ধৈর্য হারাচ্ছে।

'আপনি সত্যি আমাকে খুন করবেন?' জিজ্ঞেস করল তৃষা, আসলে সময় নিচ্ছে। ভাবছে ঘরে কেউ ঢুকলে সাহায্য চাইতে পারবে। 'কিভাবে? গুলি করবেন?'

'পিস্তল বা ছুরি, এ-সব আমি ব্যবহার করি না।' প্রকাণ্ড ও লোমশ হাত দুটো তুলে দেখাল লালচুলো আততায়ী, দাঁত বের করে হাসল। 'আমার জন্যে এ-দুটোই যথেষ্ট।'

আতংকে নীল, পিছু হটছে তৃষা। এগোবার সময় দাঁত বের করে রাখল লোকটা। তার গোঁফ জোড়াও লালচে। চোখে পশুসুলভ হিংস্র উল্লাস, জানে অসহায় শিকারকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

তৃষার আতংক যত বাড়ছে ততই বাড়ছে বাঁচার আকুলতা। হৃৎপিণ্ড যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে পাঁজরে। ফোঁস-ফোঁস শব্দে হাঁপাচ্ছে সে। শরীরের নিচের অংশ এত দুর্বল যে অসাড় লাগছে, পা দুটো ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করল। লম্বা কালো চুল মুখ প্রায় ঢেকে ফেলেছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল।

লোকটা হাত বাড়াল। তার হাত যেন বাঘের থাবা। সেই থাবার স্পর্শ পেতেই এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তৃষা যে ইস্পাতের বাল্কহেড সহ ছোট্ট কমপার্টমেন্টে আওয়াজটা ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। শরীর মোচড় দিয়ে নিজেকে লোকটার হাত থেকে ছাড়াল সে, ঘুরে পালাবার পথ খুঁজছে। লোকটার হাসিতে এতটুকু শব্দ নেই, তার শান্ত অথচ হিংস্র ভাব দেখে মনে হলো তৃষাকে নিয়ে খেলছে, আঘাতের পর আঘাত করে ধীরে ধীরে মারবে বলে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে। ঘটলও তাই। তৃষার গলায় হাত দিয়ে একটু চাপ দিল লোকটা, একটা চড় কষল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আরেক চড় মারল, তারপর আবার তাকে সরে যাবারও সুযোগ করে দিল।

লোকটার কৌশল আর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তৃষার ইচ্ছে হলো বাঁচার আশা

ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, কামরার এক কোণে ঢলে পড়ল সে।

লোকটা আবার এগিয়ে আসছে। তৃষার কিছুই করার নেই। এমন কি চিৎকার করার সাহস ও শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে সে। লোকটা আসছে। তৃষা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে।

লোকটা ঝুঁকল। অনায়াস ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে তুলল তৃষাকে। ঠাণ্ডা, রক্তপিপাসু দৃষ্টিতে এখন চকচক করছে লোভ। যেন স্লো মোশন-এ তৃষার ঠোঁটে মুখ নামাল সে। বন্ধ চোখ বিস্ফোরিত হয়ে খুলে গেল, সেই সঙ্গে চেঁচাবার জন্যে মুখ খুলল তৃষা–চিৎকার নয়, তার বদলে ফোঁপানোর আওয়াজ বেরুল শুধু।

তৃষাকে ডেকে নামিয়ে দিয়ে আবার পিছু হটল লোকটা। দাঁত বের করা হাসিটা যেন তার ট্রেড মার্ক। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' বলল সে, 'যত খুশি চিৎকার করতে পারো। বাইরে তুমুল ঝড়, কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না। এরকম মজা লোটার সময় মেয়েরা চিৎকার করলে আরও ভাল লাগে আমার। তোমার ওই সুন্দর চোখে ভয় দেখে আমার উত্তেজনা হচ্ছে।'

আবার এগিয়ে এসে তৃষাকে দু'হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিল লোকটা। ভাবটা এমন, তৃষা যেন তুলোর পুতুল। বাহুহেডেয়থাকহয়ে ফেলে তাকে চেপে ধরল, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে আদর করার ছলে আঘাত করছে।

ফুঁপিয়ে উঠে তৃষা শুধু বলতে পারল, 'প্লীজ, আমাকে বরং মেরে ফেলুন!'

লোকটার প্রকাণ্ড হাত তৃষার গলাটা চেপে ধরল। 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক,' বলল সে, 'মৃত্যু হবে দ্রুত এবং যন্ত্রণাবিহীন।'

'না! প্লীজ, না!' ধস্তাধস্তি শুরু করল তৃষা। কিন্তু বৃথাই। এ লোকের শরীরে পাঁচজন মানুষের শক্তি, তৃষা তার সঙ্গে পারবে কিভাবে।

হঠাৎ একটা গলা শোনা গেল। 'এ তো দেখছি কুত্তারও অধম!'

লালচুলো খুনী তৃষার গলা ছেড়ে শিকারী বিড়ালের মত ক্ষিপ্র বেগে ঘুরল। ছায়ায় ঢাকা একটা মূর্তি সদ্য খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, একটা হাত কবাটের কিনারায়, পিছনের প্যাসেজওয়েতে আলো থাকায় মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ঝট করে মার্শাল আর্ট-এর একটা পজিশন নিল খুনী, শূন্যে বাঁকা হলো হাত দুটো, একটা পা চালাল আগন্তুককে লক্ষ্য করে।

তৃষার চিৎকার শুনতে পেয়ে শুধু ঠেলে রাখা দরজার কবাট ফাঁক করে ওখানেই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল রানা পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে দেরি হয়নি ওর। বুঝতে পারে অন্য কারও সাহায্য চাওয়ার সময় নেই। দেখামাত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ লোক শুধু জাতখুনী নয়, খুন করে মজা পায়। রানা এ-ও ভাবল, অসহায় একটা মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ আছে। জানে আক্রমণ আসবে, নিজেকে সেজন্যে তৈরি রাখল।

চোখ ধাঁধানো একটা ঘূর্ণির মত মোচড় খেয়ে প্যাসেজওয়েতে বেরিয়ে এল রানা, অনুভব করল এইমাত্র যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই জায়গার ওপর দিয়ে ছুটে গেল শত্রুর বিদ্যুৎগতি পা। আঘাতটা লাগলে ওর খুলি নির্ঘাত গুঁড়িয়ে যেত।

টার্গেট মিস করায় লাথিটা লাগল চৌকাঠে, লোকটার গোড়ালির হাড় ভাঙার শব্দটা সবাই ওরা শুনতে পেল।

অন্য কোন লোক হলে যন্ত্রণায় ছটফট করত। কিন্তু এই লোক সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। শরীরটা ইস্পাত-কঠিন পেশির সমষ্টিই শুধু নয়, যে-কোন ব্যথাকে অগ্রাহ্য করার ট্রেনিংও তার নেয়া আছে। প্যাসেজওয়ে-এর এদিকওদিক তাকিয়ে প্রথমে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে আশপাশে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। তারপর এগোল সে, হাত ও পা মার্শাল আর্ট-এর পরিচিত ভঙ্গিতে, একটা বিশেষ ছন্দে নড়াচড়া করছে। শিকারকে লক্ষ্য করে লাফটা দিল অকস্মাৎ, হাত দুটো যেন কুড়াল হানছে বাতাসে।

রানা দাঁড়িয়ে আছে যেন ভয়ে পাথর, এই অভিনয়ে স্থির থাকল একেবারে শেষ মাইক্রোসেকেন্ড পর্যন্ত। তারপরই খসে পড়ল মেঝেতে, নিজেকে শত্রুর দিকে গড়িয়ে দিয়েছে। শত্রুর গতিই তার জন্যে কাল হলো। ভারসাম্য হারিয়ে রানাকে ছাড়িয়ে, ওর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সে। খুলির একটা গুঁতো দিয়ে তার গতি আরও বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগটা রানা হাতছাড়া করল না। প্যাসেজওয়ে পার হয়ে উল্টোদিকের বাল্কহেডে ভারী বস্তার মত পড়ল সে, সেখান থেকে খসে ডেকে। চোখের পলকে ক্রুড ওপর চড়াও হলো রানা। শরীরের প্রতি পাউন্ড শক্তি ব্যবহার করে ডেকের সঙ্গে লোকটাকে চেপে ধরে রাখল, একটা হাঁটু গাড়ল অরক্ষিত পিঠে, হাতের সিধে পিঠ দিয়ে কষে চড় মারল দু'কানে বারবার।

লোকটার কানের পর্দা ফেটে গেল, যেন মাথার একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত সাইকেলের একটা স্পোক ঢোকানো হয়েছে। খুনীর গলা থেকে ঘর্ঘর ঘর্ঘর করে রোমহর্ষক আওয়াজ বেরুচ্ছে। হড়হড় করে বমিও করল। কিন্তু তারপরই এক ধাক্কায় রানাকে ছুঁড়ে দিল বন্ধ একটা দরজার গায়ে। লোকটার শক্তির আভাস পেয়ে রানাও স্তম্ভিত। উপলব্ধি করল, এ লোক ব্যথা পায় না, কিংবা পেলেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে। প্রায় শুয়ে আছে, এই অবস্থা থেকে দুই পা একসঙ্গে চালাল–লোকটার উরুসন্ধিতে নয়, মারল গোড়ালির ভাঙা হাড়টায়।

এবার কোন রোমহর্ষক শব্দ নয়, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা দু'সারি দাঁতের মাঝখান থেকে হিসহিস করে বাতাস বেরুল; রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে খেঁকাচ্ছে যেন, টকটকে লাল হয়ে ওঠা চোখে খুনের নেশা চকচক করছে। এবার সত্যিকার অর্থে ব্যথা পেয়েছে সে। তবে এখনও সে-ই আক্রমণকারী, নিজেকে দাঁড় করাতে পারল, আহত পা টেনেটেনে রানার দিকে এগোচ্ছে। কৌশল বদলে পরবর্তী হামলার জন্যে নিজেকে সে তৈরি করছে।

হঠাৎ খুনী লোকটার পিছনে দোরগোড়ায় দেখা গেল তৃষাকে। লেদার ব্যাগটা এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে, ওটা যেন তার বুক থেকে গজিয়েছে। রানার দিকে লালচুলো আততায়ীর গভীর মনোযোগ, পিছনে মেয়েটার উপস্থিতি সে টেরই পেল না।

'দৌড়ান!' মেয়েটার নিরাপত্তার কথাই আগে ভাবছে রানা। 'দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে পালান!'

লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখা গেল, ভাবছে রানা হয়তো সেই প্রাচীন

কৌশল খাটিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে সত্যিকার প্রফেশনাল সে, নিজের ভিক্টিমকে খুঁটিয়ে দেখে। রানার চোখের মণিকে ক্ষীণ একটু নড়তে দেখে বন করে ঘুরল। তবে ইতিমধ্যে সিঁড়ি লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করেছে তৃষা, ওই সিঁড়ি তাকে খোলা ওঅর্ক ডেকে পৌঁছে দেবে। আসল টার্গেট হাতছাড়া করতে রাজি নয়, লালচুলো তার পিছু নিল–খানিকটা দৌড়াচ্ছে, খানিকটা খোঁড়াচ্ছে, গোড়ালির ভাঙা হাড় থেকে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা হজম করছে নীরবে।

ঠিক এটাই আশা করছিল রানা।

এবার ওর হামলা করার পালা। দৌড় দিল, তারপর লাফ। নামল লোকটার চওড়া পিঠে। এ হলো ফুটবল খেলায় প্রচলিত নিষ্ঠুর একটা ট্যাকল্, দুটো শরীরের শক্তি কাজে লাগিয়ে পিছন থেকে রানারকে ফেলে দেয়া; লোকটার গায়ে নিজের সবটুকু ওজন তো চাপালই রানা, সেই সঙ্গে তার মুখ আর মাথা ঠুকে দিল ডেকে।

ইস্পাতের ডেকে মোটা কার্পেট ফেলা, তাসত্ত্বেও শব্দটা শুনে মনে হলো লোকটার খুলি ফেটে গেছে। রানা অনুভব করল ওর শরীরের নিচে অসাড় ও নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা। ভেঙে যদি না-ও থাকে, রানার ধারণা খুলিটা ফেটেছে তো অবশ্যই। কয়েক সেকেন্ড লোকটার গায়ে শুয়ে থাকল ও, হাঁপাচ্ছে। দম ফিরে পেয়ে উঠতে যাবে এই সময় খেয়াল করল আততায়ীর মাথা ও ঘাড় অস্বাভাবিক একটা পজিশনে মোচড় খেয়ে রয়েছে, চোখ দুটো খোলা অথচ সেখানে কোন দৃষ্টি নেই।

গলার পাশে হাত দিয়ে রানা কোন পালস্ পেল না। আততায়ী মারা গেছে। পতনের সময় তার মাথাটা নিশ্চয়ই বাঁকা হয়ে ছিল, ফলে ডেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা মটকে গেছে। একটু সরে এসে একটা বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিল রানা, কামরাটার ভেতর ব্যাটারি রাখা হয়।

পরিস্থিতি কি থেকে কি দাঁড়াল ভাবছে রানা। কি ঘটছে সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই। শুধু জানে, যে-মেয়েটাকে পানি থেকে উদ্ধার করেছিল সেই মেয়েটাই এক লোকের হাতে খুন হতে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে বাধা দেয় ও। এই মুহূর্তে এখানে বসে একটা লাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই লাশ ওর নিজ হাতে তৈরি। অচেনা একজন লোককে মেরে ফেলেছে সে, জানে না কেন।

তারপর আবার মেয়েটার কথা মনে পড়ল।

দাঁড়াল রানা, লাশটা টপকাল, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল আউটার ডেকে। ওঅর্ক ডেকে গিজ গিজ করছে লোকজন, সী রবিনের ক্রুদের বেঁধে দেয়া সেফটি রোপ ধরে আছে সবাই। ঝম-ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, কারও মুখে কোন অভিযোগ বা প্রতিবাদ নেই। সেফটি রোপ ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সবাই, সাবধানে চড়ছে ফ্লাইং কার্পেটের পাঠানো রেসকিউ বোটে।

লাইন দেয়া লোকজনের সামনে এসে ছুটোছুটি করে মেয়েটাকে খুঁজছে রানা। কিন্তু লাইনের কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। আরও কিছুক্ষণ খুঁজল ও। লেদার কেস সহ মেয়েটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যে বোটগুলো লোকজনকে নিয়ে ফ্লাইং কার্পেটের উদ্দেশে এইমাত্র রওনা হয়েছে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে

নিশ্চিত হলো, মেয়েটা এখনও সী রবিন ত্যাগ করেনি। তাহলে সে গেল কোথায়?

মেয়েটাকে রানার খুঁজে বের করতে হবে। তা না হলে ক্যাপটেন শেফার্ডকে লাশটা সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দেবে ও? তাছাড়া, কি ঘটছে তা-ও তো জানতে হবে ওকে, তাই না?

পাঁচ

এক সময় মনে হলো সী রবিন বিপদটা কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছে। বেলা সাড়ে তিনটের দিকে দেখা গেল একশো দশজন বাদে ওয়াটার লিলির বাকি সব প্যাসেঞ্জারকে ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেটে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে দশজন গুরুতর আহত, নাড়াচাড়া করা যাবে না; বাকি সবাই ওয়াটার লিলির ক্রু। লোকজন নেমে যাওয়ায় সী রবিন পানির নিচে থেকে পাঁচ ফুট ওপরে উঠে এসেছে। ক্রুরা হাল প্লেট মেরামতের কাজ প্রায় শেষ করে আনায় পানিও আগের চেয়ে অনেক কম ঢুকছে জাহাজে।

উত্তর কোরিয়ান গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট পৌঁছেই বোট নামিয়ে ফেরি অপারেশন শুরু করে দিল। প্রকৃতিকে ধন্যবাদ যে ঝড়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি বিনা নোটিশে চলেও গেছে। সাগরে ঢেউ আছে, তবে আকারে সেগুলো বিশাল নয়।

ওয়াটার লিলির ক্রুদের মধ্যে সবার শেষে বিদায় নিল নিক গোয়েন, ফ্লাইং কার্পেটের বোটে ওঠার আগে সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না সে।

গোয়েন চলে যাবার পর ক্যাপটেন শেফার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখন?'

'প্রথম কাজ সাবমারসিবলগুলো তুলে আনা, তা না হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার গর্দান নেবেন,' বললেন ক্যাপটেন। 'তারপর সিঙ্গাপুরের কোর্স ধরব, কারণ জাহাজ মেরামতের জন্যে ভাল শিপইয়ার্ড ও ড্রাই-ডক কাছাকাছি ওখানেই পাব।'

'সী হর্সকে খুঁজে না পেলে খুব একটা ক্ষতি নেই, বহু বছর ধরে সার্ভিস দিয়েছে। কিন্তু ব্লু নেভিগেটর একদম নতুন আর অত্যাধুনিক, তৈরি করতে খরচ পড়েছে বারো মিলিয়ন ডলার। ওটাকে পেতেই হবে।'

'না পাবার কোন কারণ নেই। ওটার বীকন সিগন্যাল পরিষ্কারই পাচ্ছি আমরা।'

'গুড।'

'ভেবে কিছু বের করতে পারলেন,' জিজ্ঞেস করলেন শেফার্ড, 'লাশটার কথা কর্তৃপক্ষকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'যতটুকু জানি বলব।'

'মেয়েটাকে সাক্ষী হিসেবে পেলে ভাল হত।'

'জাহাজ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমি তাকে দেখতে পাইনি, এ স্রেফ হতে পারে না।'

'আসলে, মিস্টার রানা, আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে,' বললেন ক্যাপটেন, ঠোঁটে খানিকটা শয়তানি হাসি।

তাঁর দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। 'সমাধান হয়ে গেছে?'

'আমি পরিচ্ছন্ন, সুশৃংখল জাহাজ চালাতে পছন্দ করি,' ব্যাখ্যা করলেন শেফার্ড। 'কাজটা আমার নিজেকেই করতে হয়েছে। আপনার বন্ধুকে জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছি। ওয়াটার লিলির দুর্ভাগা লোকজনের সঙ্গে ভেসে গেছে সে। আমি যতটুকু বুঝি, বিষয়টার সমাপ্তি ঘটেছে।'

'স্কিপার,' বলল রানা, চোখে কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল, 'লোকে আপনার সম্পর্কে কে কি বলল সে-সব আমি গ্রাহ্য করি না। আমি জানি আপনি ঠিক আছেন।'

এই সময় রেডিও রূম থেকে বেরিয়ে এসে অপারেটর খবর দিল, উত্তর কোরিয়ান মিসাইল ফ্রিগেট মেসেজ পাঠিয়েছে সী রবিন যদি সরে যায় ওরা তাহলে পানি থেকে লাশ তুলবে, টাগ বোট না আসা পর্যন্ত ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির সঙ্গেও থাকতে পারবে।

শেফার্ড বললেন, 'উত্তর কোরিয়ান ক্যাপটেন লিউ ফেংকে বলো আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

এক মিনিট পর রেডিও অপারেটর ফিরে এসে বলল, 'ক্যাপটেন লিউ ফেং ধন্যবাদ জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন, সী রবিন তাঁর সামনে যেন শান্ত সাগর পায়।'

রানা মন্তব্য করল, 'ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম একটা গাইডেড- মিসাইল ফ্রিগেট পাঁচশো সিভিলিয়ান প্যাসেঞ্জারকে আশ্রয় দিল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা,' বললেন শেফার্ড। 'আপনি কিন্তু একবারও এ প্রশ্ন তুললেন না যে মিসাইলগুলো কোথায় ডেলিভারি দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'প্রশ্ন তোলার দরকার কি।' হাসল রানা। 'কমপিউটর অন করলেই স্যাটেলাইট ফটো দেখে বলে দেয়া যায় কোথায় যাচ্ছিল ফ্রিগেটটা।'

'স্যাটেলাইট ফটো দেখেছি আমি। ফ্রিগেটের কোর্স দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে ওটা বাংলাদেশেই আসছিল।'

ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইল রানা। 'এটা আসলে আমার বা আপনার কোন বিষয় নয়।'

'তা নয়,' বলে পোড়া, নিঃশেষিতপ্রায় জলদানবটার দিকে তাকালেন শেফার্ড।

ঝম-ঝম বৃষ্টি আগুন নেভাতে তেমন কোন কাজে আসেনি। এখনও কমলা ও লাল রঙের শিখা দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়া আর বাষ্প ঘিরে রেখেছে পোড়া কাঠামোকে। 'প্রতি বছর কত জাহাজেই তো আগুন লাগছে,' বললেন ক্যাপটেন, 'কিন্তু ওয়াটার

লিলির এই আগুনের সঙ্গে তুলনা করার মত কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।'

'সেকেন্ড অফিসার গোয়েনের মতে ফায়ার-ওয়ার্নিং আর কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ না করায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।'

'কেউ বিশ্বাসঘাতকা করেছে? স্যাবটাজ?'

'একসঙ্গে সব কিছু বিকল হয়ে পড়লে যুক্তির বিচারে সেটাকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।'

'ক্যাপটেন,' রেডিও অপারেটর আবার বাধা দিল, 'ফ্লাইং কার্পেটের ক্যাপটেন নিখিল শ্রীবাস্তব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'স্পীকার অন করো।'

'শুরু করুন, সার।'

'ক্যাপটেন শেফার্ড বলছি।'

'আমি এখানে নিখিল শ্রীবাস্তব। আপনারা যদি সিঙ্গাপুরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, ফ্লাইং কার্পেট আপনাদের পথ-প্রদর্শক বা সঙ্গী হতে রাজি আছে।'

রানার দিকে তাকালেন শেফার্ড। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। সী রবিনের যে অবস্থা, মাঝসাগরে ডুবে যাবার পরিস্থিতি দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। সঙ্গে ফ্লাইং কার্পেট থাকলে ভালই হবে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার শ্রীবাস্তব,' বললেন শেফার্ড। 'সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ফ্লাইং কার্পেটকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমরা খুশিই হব।'

'এর জন্যে আমাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেও চলে,' বললেন শ্রীবাস্তব। 'ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলি লং লেলাং কোম্পানির জাহাজ, আর ওই জাহাজ কোম্পানির শাখা অফিস আছে সিঙ্গাপুরে। ওদের আঠারোশো প্যাসেঞ্জারকে নিরাপদে উদ্ধার করে ও পৌঁছে দিয়ে ন্যায্য ফি নিতে ওখানে আমাদেরকে এমনিতেও যেতে হবে।'

'তবু ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, প্লিজ!' বললেন শেফার্ড।

'আপনারা রওনা হলেই আমরা পিছু নেব,' জানালেন শ্রীবাস্তব।

ওয়াটার লিলির কাছে প্রথমে পৌঁছাল গ্লোবাল মেরিন অফশোর কোম্পানির টাগ বোট 'গ্রীন ড্রাগন'। একশো উনিশ ফুট লম্বা, আটান্ন ফুট চওড়া–দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টাগগুলোর একটা। জোড়া ডিজেল এঞ্জিনের মোট শক্তি নয় হাজার আটশো হর্সপাওয়ার। কাছাকাছি কুয়ালালামপুরে থাকায় অন্য কোন টাগের আগে গ্রীন ড্রাগনই অকুস্থলে প্রথমে পৌঁছাতে পারল।

পৌঁছাবার পর দশ ঘণ্টা লাগল ওয়াটার লিলির বো-তে লোহার শিকল পরাতে। আটটা ছোট বোটে করে আশিজন ক্রু রওনা হলো ওয়াটার লিলির দিকে, প্রত্যেকের পরনে ফায়ার-প্রুফ বিশেষ সুট। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কাজটায় সফল হলো তারা। ওয়াটার লিলির বো-র দিকে সবটুকুতে আগুন লাগেনি, লাগলে শিকল দিয়ে বাঁধতে আরও ভুগতে হত।

প্রকাণ্ড জলদানবকে নিয়ে ঘণ্টায় দুই নট গতিতে রওনা হলো গ্রীন ড্রাগন। বেশিরভাগ আগুনই নিভে গেছে ওয়াটার লিলির। শুধু দোমড়ানো-মোচড়ানো

সুপারস্ট্রাকচারের কয়েক জায়গায় এখনও কিছু শিখা নাচানাচি করছে। চাঁদ নেই, গোটা আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। রাতটা এতই কালো যে বলা সম্ভব নয় সাগর ঠিক কোথায় শেষ হওয়ার পর শুরু হয়েছে আকাশ।

টাগের বিরাট সার্চলাইট ওয়াটার লিলির দিকে তাক করা, আলোকিত করে রেখেছে বো আর বিধ্বস্ত ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচার। পালা করে নজর রাখছে ক্রুরা, নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে পোড়া জাহাজটা যাতে প্ল্যান অনুসারে পিছু পিছু আসে। মাঝরাতের পর শুরু হলো কুক-এর পাহারা দেয়ার পালা। একটা ফোল্ডিং ডেক চেয়ার নিয়ে এল সে, গ্যালিতে কাজ না থাকলে এটায় বসে গায়ে রোদ লাগায়। বেশ গরম পড়েছে, তাই কফি খাওয়া চলে না, তার বদলে মক্কা কোলা খাচ্ছে সে। ক্যানগুলো রয়েছে বরফ ভর্তি একটা বালতিতে। হাতে সফট ড্রিঙ্ক, একটা সিগারেট ধরিয়ে টাগের পিছু পিছু আসা প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল।

দু'ঘণ্টা পর। চোখ ঢুলু ঢুলু, দশ নম্বর সিগারেট আর তিন নম্বর মক্কা কোলার সাহায্য নিয়ে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কুক। ওয়াটার লিলি যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল কুক, মাথাটাও একদিকে কাত হয়ে গেল। ভারী, ভরাট, গমগমে একটা আওয়াজ। যেন বহুদূর দিগন্তের কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে। একটা নয়, পর পর কয়েকটা, দশ-পনেরো সেকেন্ড বিরতি দিয়ে। নিছক কল্পনা হিসেবে উড়িয়ে দেবে, এই সময় লক্ষ করল কি যেন একটা বদলে গেছে। ব্যাপারটা ধরতে মাত্র তিন সেকেন্ড লাগল তার। ওয়াটার লিলি আগের চেয়ে আরও একটু ডুবে গেছে পানিতে।

সার্চলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে জাহাজটার ফরওয়ার্ড অ্যামিডশিপ থেকে প্রকাণ্ড স্তম্ভের আকার নিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কুক সেদিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ আঁতকে উঠল সে, আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

ওয়াটার লিলি ডুবে যাচ্ছে! শুধু ডুবছে না, জাহাজটা ভেঙেও যাচ্ছে।

চিৎকার করতে করতে ব্রিজের দিকে ছুটল কুক। 'হায়, ঈশ্বর! জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে!'

টাগ বোট 'গ্রীন ড্রাগনে'র ক্যাপটেন টিম বাটার হৈ-চৈ শুনে নিজের কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। কুককে কোন প্রশ্ন করলেন না, একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন যদি এই মুহূর্তে টো কেইবল্ না কাটেন তাহলে ওয়াটার লিলির সঙ্গে গ্রীন ড্রাগনও ক্রুসহ সাগরের বিশ হাজার ফুট তলায় নেমে যাবে। ইতিমধ্যে ফার্স্ট অফিসার ডিক পটার ব্রিজে পৌঁছেছে, তাকে নিয়ে দৈত্যাকার উইঞ্চ-এর দিকে ছুটলেন তিনি।

উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ব্রেক রিলিজ করলেন ওঁরা, মোটা কেইবল্ ছাড়ছেন, প্যাঁচমুক্ত হয়ে অতলে তলিয়ে যেতে দেখছেন ওটাকে, প্রায় সরল রেখার আকৃতি থেকে বদলে নিচের দিকে খাড়া একটা রেখায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যেহেতু ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির বো ডুবতে শুরু করেছে পানিতে। উইঞ্চ ড্রামে জড়ানো বিশাল কেইবল্ এত দ্রুত খুলছে যে একসময় দৃশ্যটা ঝাপসা হয়ে গেল। ফার্স্ট অফিসার পটার আর ক্যাপটেন বাটার শুধু আশা করতে পারেন যে সবশেষে

কেইবলটা যখন প্যাঁচ মুক্ত হবে, ওটার শেষ প্রান্ত যেন কানেক্টর থেকে ছিঁড়ে যায়। তা না হলে গ্রীন ড্রাগনের স্টার্নই টাগ বোটকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

দগ্ধ এবং নিহত ক্রুজ শিপ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাগরে ডুব দিচ্ছে। এরই মধ্যে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটার সারফেস। পনেরো ডিগ্রি কোণ তৈরি করে ডুবছে জাহাজের কঙ্কালটা। কালচে, তোবড়ানো খোলের ভেতর থেকে ধাতব গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে আগুনে নিপীড়িত বাল্কহেড মোচড় খেয়ে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করায়। স্টার্ন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে পানির ওপর থাকল, তারপর সেটাও বো-র পিছু নিয়ে ডুব দিল কালো সাগরে, ওপরে রেখে গেল রাশি রাশি উথলানো বুদ্বুদ।

রীল-এর চারধারে মাত্র এক সারি কেইবল্ পেঁচিয়ে আছে। হঠাৎ সেটা টান টান ও স্থির হতেই গ্রীন ড্রাগনের স্টার্ন অকস্মাৎ ডেবে গেল নিচের দিকে, এক ঝাঁকিতে পানির ওপর শূন্যে তুলে ফেলল বো। টাগ বোটের প্রতিটি ক্রু পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে, তাকিয়ে আছে স্থির ড্রামের দিকে, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে মৃত্যুর চোয়াল বন্ধ হলো বলে। তারপর শেষবারের মত মাত্র এক পাক ঘুরল ড্রামটা, কেইবলের পুরোটা দৈর্ঘ্য হ্যাঁচকা টানে সাগরের অতল তলে নেমে গেল।

টান থেকে মুক্তি পেয়ে টাগের বো ঝপাৎ করে খসে পড়ল পানিতে, শান্ত হবার আগে সামনে-পিছনে দুলল কিছুক্ষণ। মৃত্যুর ছোঁয়া থেকে একটুর জন্যে রেহাই পাওয়া ক্রুরা এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে ফার্স্ট অফিসার বলল, 'অবিশ্বাস্য! চোখের পলকে এভাবে একটা জাহাজ ডুবে যাবে? এটা হয় কখনও? অথচ এইমাত্র ঠিক তাই হলো!'

'মনে হলো যেন জাহাজটার পুরোটা তলা খসে পড়েছে,' মন্তব্য করলেন ক্যাপটেন বাটার।

'ওই কেইবলের দাম এক মিলিয়ন পাউন্ড। কোম্পানি-ডিরেক্টররা খুশি হবেন না।'

'আমাদের করার কিছুই ছিল না। ঠিক যেন চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা।' থেমে একটা হাত তুলে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন ক্যাপটেন। 'শোনো!' তাঁর গলা তীক্ষ্ণ।

সবাই তাকিয়ে আছে ঠিক যেখানে ডুবে গেছে ওয়াটার লিলি। রাতের অন্ধকার চিরে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন চিৎকার করছে। 'হেলপ মি! বাঁচান আমাকে!'

ক্যাপটেন বাটার প্রথমে ভাবলেন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তাঁর কোন ক্রু টাগ থেকে পানিতে পড়ে গেছে। কিন্তু একটু পরই জানা গেল, কোন ক্রু নিখোঁজ নয়। চিৎকারটা আবার শোনা গেল, এবার আগের চেয়ে অস্পষ্ট ও দুর্বল।

'ওদিকে কেউ আছে!' বলল কুক, আওয়াজটার দিকে হাত তুলে দেখাল।

ফার্স্ট অফিসার পটার ছুটে সার্চলাইটের পিছনে চলে এসে ঘোরাল ওটাকে, পানিতে খেলাচ্ছে আলোটাকে। সাগরও কালো, তাই কালো চকচকে মুখটা বলতে

গেলে ভাগ্যগুণেই দেখতে পাওয়া গেল। স্টার্ন থেকে একশো ফুট দূরেও নয়, কাজেই আশা করা যায় পটারের চিৎকার শুনতে পাবে সে। 'আপনি সাঁতরে বোটের কাছে আসতে পারবেন?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না, তবে লোকটা যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তা-ও মনে হলো না। বেশ শক্তি খাটিয়েই হাত ও পা ছুঁড়ছে সে, দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে বোটের দিকে।

'ওকে একটা লাইন ছুঁড়ে দাও দেখি,' একজন ক্রুকে নির্দেশ দিল পটার। 'হাঙর নাগাল পাবার আগেই টেনে তোলো।'

কিনারা থেকে একটা রশি ফেলা হলো নিচে। লোকটা ধরল সেটা। ক্রুরা রশি টেনে স্টার্নে তুলে আনল তাকে।

'লোকটা আদিবাসী,' বলল পটার, সে নিজে একজন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী।

'কোঁকড়ানো চুল কিন্তু তা বলে না,' দ্বিমত পোষণ করলেন ক্যাপটেন বাটার। 'আমার মনে হচ্ছে আফ্রিকান।'

'পরনে ওটা কোন জাহাজী অফিসারের ইউনিফর্ম।'

দুর্ভাগ্য ও বিপজ্জনক ঘটনাপ্রবাহের এই শেষ পর্যায়ে কোন সারভাইভারকে দেখতে পাবেন বলে আশা করেননি ক্যাপটেন বাটার, লোকটার দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন তিনি। 'আমরা কি জানতে পারি কোত্থেকে এলেন আপনি?'

আগন্তুকের মুখে বিশাল এক হাসি ফুটল। 'আমি তো মনে করি এটা সবার কাছেই পরিষ্কার। আমি হলাম, বরং বলতে হয় ছিলাম, ওয়াটার লিলির প্যাসেঞ্জার রিলেশান্স অফিসার।'

'সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে নেয়ার পরও আপনি কিভাবে ওখানে থেকে গেলেন?' জানতে চাইল পটার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটা কোথাও এতটুকু আহত হয়নি, অথচ এটা তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু ইউনিফর্মটা ভিজে, এছাড়া আর কোন তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাকে ভুগতে হয়নি।

'প্যাসেঞ্জারদের রিসার্চ ভেসেলে পাঠাতে সাহায্য করার সময় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাই আমি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবাই নিশ্চয় ধরে নিয়েছিল আমি মারা গেছি, তা না হলে ওখানে আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেত না। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমাদের জাহাজকে আপনারা টো করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'তারমানে আপনি বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন!' ক্যাপটেন বাটার বিস্মিত।

'নিশ্চয়ই তাই।'

'খুবই অবিশ্বাস্য লাগছে যে আপনি পুড়ে মারা যাননি।'

'রাখে ঈশ্বর মারে কে।' আবার বিশাল এক হাসি দিল নিগ্রো অফিসার। 'ভাগ্যক্রমে এমন একটা কম্প্যানিয়নওয়েতে পড়েছিলাম, যেটায় আগুন লাগেনি।'

'আপনার কথায় মার্কিনি সুর।'

'আমি ক্যালিফোর্নিয়ার লোক।'

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করল পটার।

'ডেভিস মুরেল।'

'ঠিক আছে, মিস্টার মুরেল,' বললেন ক্যাপটেন বাটার। 'আপনি বরং ভেজা ইউনিফর্মটা খুলে ফেলুন। আপনার আর আমার ফার্স্ট অফিসারের গড়ন একই রকম, সে আপনাকে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় ধার দিতে পারবে। কাপড় পাল্টে গ্যালিতে চলে যাবেন। জানা কথা ক্ষুৎ-পিপাসায় আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন। কুককে বলে দিচ্ছি, সে আপনাকে প্রথমে শ্যাম্পেন দেবে, তারপর খেতে ডাকবে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে; ধন্যবাদ, ক্যাপটেন...'

'টিম বাটার।'

'সত্যি কথা বলতে কি, মিস্টার বাটার, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যেতে চাইছে।'

ডেভিস মুরেলকে বোটের কুক নিচে নিয়ে যাবার পর ফার্স্ট অফিস্যার একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত না? কী ভয়ংকর একটা আগুন জ্বলছিল ওখানে, অথচ লোকটার একটু আঙুল বা ভুরুর খানিকটা লোম, কিছুই পোড়েনি!'

চোখে সংশয়, হাত দিয়ে চিবুক ঘষছেন ক্যাপটেন। 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই।' একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তবে ও আমাদের কোন ব্যাপার নয়। আমাকে এখন অপ্রীতিকর একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে–কোম্পানি ডিরেক্টরদের জানাতে হবে টো তো হারিয়েইছি, সঙ্গে মিলিয়ন পাউন্ডের কেইবল্‌ও গেছে।'

রাগে ফার্স্ট অফিসারের মুখ থেকে গালি বেরিয়ে পড়ল। 'কাজটা ডাইনী ভাল করেনি।'

'কোন্ কাজটা?' ক্যাপটেন অবাক। 'কার কথা বলছ?'

'এই দেখলাম পানির ওপর উঁচু হয়ে ভাসছে, পরমুহূর্তে নেমে গেল সাগরের তলায়। এভাবে আমাদেরকে ফাঁকি দেয়া উচিত হয়নি ওয়াটার লিলির। ব্যাপারটাকে আমি স্বাভাবিক বলেও মেনে নিতে পারছি না।'

'আমি একমত,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ক্যাপটেন। 'তবে তখনও আমাদের কিছু করার ছিল না, এখনও নেই।'

'বীমা কোম্পানি ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে চাইবে না। এমন কিছু নেই যে ইনভেস্টিগেট করা যাবে।'

ক্যাপটেন ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন। 'প্রমাণ না পাওয়া গেলে এই ব্যাপারটাও সাগরের অমীমাংসিত অনেক রহস্যের একটা হয়ে থাকবে।' হেঁটে এসে সার্চলাইট নিভিয়ে দিলেন তিনি।

টাগ বোট গ্রীন ড্রাগন সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন বাটার ওয়াটার লিলির যে জাহাজী অফিসারকে সাগর থেকে উদ্ধার করেছিল সে নিখোঁজ হয়ে গেল। ডকসাইড ইমিগ্রেশন অফিসাররা চ্যালেঞ্জের সুরে জানাল, গ্যাঙওয়ে ধরে জাহাজ ত্যাগ করেনি সে, তা করতে দেখলে তাকে তারা ওয়াটার লিলিতে আগুন লাগার কারণ জানার জন্যে থামাত। ক্যাপটেন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, জাহাজ হারবারে ঢোকার সময় ডেভিস মুরেল পানিতে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছে।

ক্যাপটেন বাটার বীমা তদন্তকারীদের কাছে রিপোর্ট পাঠাবার পর তাদের কাছ থেকে জানতে পারলেন ডেভিস মুরেল নামে কোন লোক ওয়াটার লিলিতে অফিসার বা অন্য কোন পদে চাকরি করেনি।

ছয়

ফ্লাইং কার্পেট একপাশে অপেক্ষা করছে, সী রবিনের ক্রুরা ভেসে যাওয়া সাবমারসিবলের সিগন্যাল বীকন অনুসরণ করে ওগুলোকে তুলে নিচ্ছে জাহাজে। সবগুলো উদ্ধার করার পর ক্যাপটেন শেফার্ড মেসেজ পাঠালেন ক্যাপটেন শ্রীবাস্তবকে, তারপরই দুটো জাহাজ একযোগে সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

সাবমারসিবল তোলার কাজ শেষ করার পর সাংঘাতিক ক্লান্ত রানা, তবু ওকে এই মুহূর্তে নিজের কেবিন পরিষ্কার করতে হচ্ছে, কারণ ওয়াটার লিলি থেকে উদ্ধার পাওয়া পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে ছোট্ট এই জায়গাটায়। গোটা জাহাজ পরিষ্কার করার অপারেশন চলছে, কাজেই নিজের কাজ নিজে করা ছাড়া উপায় নেই। দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করে কেবিনটাকে বাসযোগ্য করা সম্ভব হলো। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে বিশ মিনিট গোসল করল ও। তারপর স্লিপিং গাউন পরে নিজের বিছানায় শুলো। ঘুমে চোখ বুজে আসছে, এই সময় হঠাৎ ঝট করে বিছানায় উঠে বসল ও। বাবার লেদার ব্যাগ হাতে সেই মেয়েটার চিন্তা একেবারে যেন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ওর মনে। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে, ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটার সী রবিন ত্যাগ করা ততই অবিশ্বাস্য লাগছে। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেয়েটা যায়নি। এখনও সে সী রবিনেরই কোথাও লুকিয়ে আছে।

ক্লান্তি ও ঘুম, দুটোকেই অগ্রাহ্য করে বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরল রানা। পাঁচ মিনিট পর প্ল্যাটফর্ম ডেকের স্টার্ন প্রান্ত থেকে তল্লাশী শুরু করল। জেনারেটার রূম, উইঞ্চ রূম, প্রপালশান মোটর রূম আর সায়ান্টিফিক ইকুইপমেন্ট রূমের প্রতিটি কোণ, অন্ধকার ঘুপচি, যেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, তন্নতন্ন করে খুঁজল। কাজটায় প্রচুর সময় লাগল, কারণ রসদ আর ইকুইপমেন্টগুলো রাখা হয়েছে প্রচুর জায়গা ফাঁকা রেখে।

রিপেয়ার পার্টস স্টোর রূমটাও রানা বাদ দিল না। এমন একটা জিনিস, চোখে পড়ার কথা নয়–পড়ল, এই জায়গায় বেমানান বলে। একটা নয়, অনেকগুলো লুব্রিকেটিং অয়েল-এর গ্যালন ক্যান একটা ওঅর্ক বেঞ্চে সাজানো রয়েছে। প্রথম দর্শনে বেমানান লাগল না। তবে রানা জানে ওগুলো থাকার কথা একটা কাঠের স্টোরেজ ক্রেইট-এ। ওঅর্ক বেঞ্চের দিকে নয়, ও ক্রেইটটার দিকে এগোল–পা টিপে।

ঢাকনিটা তুলল রানা।

একে তো চরম ক্লান্ত, তার ওপর শোকে কাতর, একেবারে মড়ার মত

ঘুমাচ্ছে তৃষা ইসলাম। লেদার ব্যাগটা ক্রেইটের এক পাশে পড়ে রয়েছে, সেটার ওপর তৃষার একটা হাত দেখল রানা। হাসল ও, বাল্কহেড হ্যাঙ্গার থেকে ক্লিপবোর্ড নামিয়ে টান দিয়ে একটা কাগজ ছিঁড়ল, তারপর তাতে লিখল: 'ঘুম ভাঙার পর আমার কেবিনে চলে আসুন, কৃতার্থ বোধ করব। ডেক লেভেল দুই, আট নম্বর। মাসুদ রানা।' কি যেন ভাবল, তারপর আরও একটা লাইন যোগ করল: 'খানাপিনার ব্যবস্থা থাকবে।'

কাগজটা তৃষার বুকের ওপর ছেড়ে দিল রানা, ক্রেইটের ঢাকনি নিঃশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে এল পার্টস রূম থেকে।

সন্ধে সাতটার খানিক পর রানার কেবিনের দরজায় নক করল তৃষা। দরজা খুলে রানা দেখল মাথা নিচু, চোখে-মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব, প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, লেদার কেসের হাতলটা এখনও শক্ত মুঠোর ভেতর। তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল রানা। 'খিদেতে আপনার জান বেরিয়ে যাচ্ছে,' বলে হাসল, বোঝাতে চাইছে ও রাগ করেনি বা বিরক্তও হয়নি।

'আপনিই কি মাসুদ রানা?' হাতটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ছাড়িয়ে নিল তৃষা।

'হ্যাঁ। আর আপনি?'

'তৃষা ইসলাম। আপনাকে বিব্রত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত...'

'কখন কে বিব্রত হলো!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ইঙ্গিতে একটা ডেস্ক দেখাল, সেখানে একটা প্লেটে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর এক গ্লাস দুধ রয়েছে। 'ডিনারের বিরাট আয়োজন নয়, অবশ্যই; সবাই সব কিছু খেয়ে চলে যাবার পর কুক যতটুকু পেরেছে করেছে।' একটা ব্লাউজ আর শর্টস তুলে দেখাল। 'আমাদের একজন বিজ্ঞানী আন্দাজ করেছেন তাঁর আর আপনার সাইজ একই হবে, তাই এগুলো দিয়ে গেছেন। খাওয়ার পর শাওয়ারটা সেরে নিন। আমি আধ ঘণ্টা পর ফিরব। তখন কথা হবে।'

ফিরে এসে রানা দেখল গোসল করে কাপড় পরেছে তৃষা, প্লেট ও গ্লাস দুটোই খালি। তার উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল ও। 'নিজেকে আবার মানব জাতির একজন বলে মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল তৃষা, দুষ্টামি করে ধরা পড়া স্কুল ছাত্রীর মত দেখাচ্ছে তাকে। 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন জাহাজ ছেড়ে আমি চলে যাইনি কেন।'

'হ্যাঁ, প্রশ্নটা মনে জেগেছে।'

'যাইনি ভয়ে।'

'কাকে ভয়? সেই লোকটাকে, যে আপনাকে আর আপনার বাবাকে আক্রমণ করেছিল? আপনি শুনে খুশি হবেন, আরও বহু লোকের সঙ্গে সে-ও ডুবে গেছে।'

'লোক আরও একজন ছিল,' থেমে থেমে বলল তৃষা। 'জাহাজেরই একজন অফিসার। যে লোকটা আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল, মাথায় লাল চুল, তার সহকারী বলে মনে হয়েছে। ওরা দু'জন আমার বাবার এই কেসটা ছিনিয়ে নিতে

চেষ্টা করে। বাবাকে বোধহয় খুন করতেও চেয়েছিল। ধস্তাধস্তির সময় বাবা জাহাজ থেকে পড়ে যান…'

'চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে?'

'হ্যাঁ।' বাবার মৃত্যুদৃশ্য স্মরণ করতেই চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল তৃষার। তার হাতে নিজের পরিষ্কার রুমালটা গুঁজে দিল রানা। চোখ মোছার পর রুমালটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমার ধারণা ছিল না যে এগুলো মানুষ এখনও সঙ্গে রাখে। ভেবেছিলাম সবাই টিস্যু ব্যবহার করে।'

'কিছু অভ্যেস আছে সহজে ছাড়তে পারি না,' বলল রানা। 'তাছাড়া, কে বলতে পারে কখন কার চোখ ভিজে ওঠে।'

ওর দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হাসল তৃষা। 'ঠিক আপনার মত কোন লোকের সঙ্গে কখনও আমার পরিচয় হয়নি। অদ্ভুত বলব না, তবে যেন অন্য জগতের কেউ। না, ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। যেন কোন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে যেমনটি হলে ভাল হয়, আপনি ঠিক তেমনি।'

'কেউ যখন আমাকে ভুল করে আদর্শ পুরুষ বা ওই ধরনের কিছু বলতে চায় তখন বুঝতে পারি আমার কপাল খারাপ, প্রাণ খুলে হাসার বা মন খুলে কথা বলবার সুযোগটাও কেড়ে নিচ্ছে।' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটার ইতি টানল রানা। 'অফিসার লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারব। লোকটা কালো–নিগ্রো, সম্ভবত আফ্রিকান-আমেরিকান; কারণ লং লেলাং কোম্পানির মালিকরা তো বেশিরভাগই আমেরিকান, ক্রুরাও প্রায় সবাই তাই।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না, জাহাজে আগুন না লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারা, তারপর হামলা চালাল?'

'বাবাকে এবারই প্রথম হয়রানি করা হয়নি,' একটু রেগেই উত্তর দিল তৃষা। 'বাবা আমাকে বলেছিলেন, বারবার তাঁকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমনকি মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে।'

'তা আপনার বাবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কি এমন ছিল যে এভাবে তাঁকে মরতে হলো?'

'আমার বাবা–,' এক মুহূর্ত থামল তৃষা, তারপর বলল, '–ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম উঅজ আ জিনিয়াস! একই সঙ্গে তিনি কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ছিলেন…'

'কি বললেন!' চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'উনি সেই ডক্টর সিরাজুল ইসলাম? সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে যিনি শ্রদ্ধেয় ইনভেনটর হিসেবে পরিচিত?' রানা উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছেই বলা যায়, তার অবশ্য কারণও আছে। 'কয়েক ধরনের ওয়াটার প্রপালশান এঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, তৈরি করেছেন হাইলি ইফিশান্ট ডিজেল ফুয়েল-এর ফর্মুলা?'

'আপনি এ-সব জানেন?' তৃষা অবাক।

'আপনার বাবা কি ইনিই?' বিস্ময়ের ধাক্কা তো কাটছেই না, রানা এমন কি

ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস করতেও পারছে না। 'বছর তিনেক আগে যিনি নিখোঁজ হয়ে যান…?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল তৃষা, চোখ-মুখ ম্লান হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তিন বছর আগে বাবাকে পালিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা আপনি কিভাবে জানলেন?'

'তার আগে কি ঘটেছিল আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ডক্টর ইসলামকে বন্দি করা হয়েছিল…গোপনে বিসিআইকে তিনি একটা মেসেজ পাঠান…আমরা তাঁকে টেক্সাসের ওডেসার কাছে চারশো একর বালিয়াড়ির মাঝখানে এক পাথুরে গুহা থেকে উদ্ধার করি…'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল তৃষা। 'আপনি আমার সব এলোমেলো করে দিচ্ছেন। আমি জানি বাবার সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু ঠিক কি ঘটেছিল তা কোনদিনই আমাকে বলেননি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে…'

রানা প্রথমে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিন বছর অতীতে ফিরে গেল।

গোটা ব্যাপারটায় এত রহস্য, ধাঁধা আর রোমাঞ্চ আছে যে প্রাচীন রূপকথাকেও যেন হার মানায়। রানা তখন ঢাকায়, হাতে কোন অ্যাসাইনমেন্ট না থাকায় বিসিআই অফিসে বসে প্রতিদিন ডেস্ক ওঅর্ক করছে, অর্থাৎ, ওর ধারণা, স্রেফ মাছি মারছে। হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বারে। নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া যাবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসের সামনে গিয়ে হাজির হলো রানা।

'বসো।' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রাহাত খান। রানা বসতে ই-মেইলে আসা এবং কমপিউটর প্রিন্টারে প্রিন্ট করা কয়েকটা শিট ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। 'প্রথমে ভাল করে দেখো। এখনি কোন মন্তব্য করার দরকার নেই।'

এক এক করে মোট পঁচিশটা কমপিউটর প্রিন্ট আউটে চোখ বুলাল রানা। জটিল সব অঙ্ক; বিচিত্র সব গ্রাফ, নকশা ও ডায়াগ্রাম, অদ্ভুত আকৃতির সাংকেতিক চিহ্ন; বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ের রেফারেন্স ইত্যাদির সমষ্টি পাতাগুলো, যার কোন অর্থই রানা বের করতে পারল না।

কাগজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'কিছুই বোঝোনি। সেজন্যে লজ্জা পাওয়ারও কোন কারণ নেই। দেশের নামকরা অনেক বিজ্ঞানীকে এগুলো দেখানো হয়েছে। তাঁরাও কেউ কিছু বলতে পারছেন না।'

'এ-সব আমরা পেলাম কোত্থেকে?' রানার কৌতূহল।

উত্তরে রাহাত খান আরও কয়েকটা প্রিন্ট আউট বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এজেন্টের দিকে। 'এগুলো পড়ে দেখো।'

শিটগুলো নিয়ে চোখ বুলাল রানা। সহজ ইংরেজিতে কিছু কথা লেখা আছে, বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়:

'এক থেকে পঁচিশ নম্বর পাতায় এমন কয়েকটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফর্মুলা লেখা আছে, যেগুলোর পরীক্ষা সফল হলে মানবসভ্যতা এক লাফে কয়েক

হাজার বছর এগিয়ে যাবে। ফর্মুলাগুলো কোড বা সাংকেতিক ভাষায় লেখা, আমার সাহায্য ছাড়া ওই কোড ভাঙতে কমপক্ষে একশো বছর লেগে যাবে। আমি একজন আমেরিকান নাগরিক, তবে জন্মসূত্রে বাঙালী, তাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন মাতৃভূমিকেই দান করে যাচ্ছি। এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যে-ফর্মুলার কোড ভাঙতে একশো বছর লাগবে তা পেয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কি লাভ? এর উত্তরে আমি সংক্ষেপে শুধু এ-কথাই বলতে চাই, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এত দুর্বল যে এখনই ফর্মুলাগুলোর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলে সেটা আশীর্বাদ না হয়ে বরং অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। ওগুলো কেড়ে নেয়ার জন্যে বহু শক্তিধর রাষ্ট্র বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে চাইবে। তবে দু'ভাবে এই একশো বছর সময়সীমা বিশ বছরে কমিয়ে আনা যায়। এক, প্রথমে সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারাটার কোড ভাঙতে হবে। আমার ধারণা এই কোডটা ভাঙতে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের দশ বছর লাগবে। এটা ভাঙতে পারলে পঁচিশ পাতার বাকিটুকুর অর্থ বের করতে আর লাগবে মাত্র দশ বছর। আর দুই, আমাকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা।

'হ্যাঁ, আমি এখন বন্দি জীবন কাটাচ্ছি। কে বা কারা আমাকে বন্দি করেছে, এটা জানাও বাংলাদেশের জন্যে একটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই তার বা তাদের পরিচয় এখানে আমি দিচ্ছি না। তবে আমার মুক্ত হওয়াটা বিজ্ঞানের স্বার্থে খুব জরুরী। ফর্মুলাগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার, নিখুঁত করা দরকার আরও নতুন কিছু আবিষ্কারের ফর্মুলা।

'আমি শুধু জানি টেক্সাসের পশ্চিম অংশে, ওডেসার বালিয়াড়ির মাঝখানে একটা পাথুরে গুহায় আমাকে আটকে রাখা হয়েছে। এটা সম্ভবত একটা র‍্যাঞ্চ—ঘোড়ার আওয়াজ পাই, কাছাকাছি কোথাও এয়ারস্ট্রিপও আছে, আমার গুহার দক্ষিণ দিকে কোথাও। কোবরা ক্লাব বলে মার্সেনারিদের একটা সংগঠন আছে, সেই সংগঠনের সদস্যরা আমাকে পাহারা দেয়। সংখ্যায় ওরা প্রায় বিশজন। প্রত্যেকের পরনে বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম।

'আমি আর মাত্র দশ দিন অপেক্ষা করব। যদি কোন সাহায্য না আসে, অগত্যা একাই চেষ্টা করব পালাতে, তারপর যা থাকে কপালে। শুভেচ্ছা। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম।'

দীর্ঘ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম যেখানে বাংলাদেশের বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন, সেখানে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই উচিত হবে—একদল মার্সেনারিই উদ্ধার করতে যাবে ডক্টর ইসলামকে, তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে ছদ্মবেশী রানা; কাউকে বুঝতেই দেয়া হবে না যে এই অপারেশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বা কোন বাঙালী জড়িত। পাঁচ দিনের মধ্যেই আমেরিকায় পৌঁছে টেক্সাসের দুর্গম পশ্চিম দিকটা খুব ভালভাবে চেনে এমন একদল মার্সেনারি যোগাড় করে ফেলল রানা, বেশিরভাগই তারা ওর পূর্ব-পরিচিত। মেশিন গান ও রকেট লঞ্চার ফিট করা হেলিকপ্টার গানশিপও চোরাবাজার থেকে ভাড়া করা হলো একজোড়া। দু'হাতে টাকা ছড়াতে কোবরা ক্লাবের বিশজন সদস্য চার হাজার একর জুড়ে বিস্তৃত বালিয়াড়ির মাঝখানে ঠিক কোন্ পাথুরে গুহায় বসবাস করছে তা জানা হয়ে গেল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।

এ-ও জানা গেল ঠিক কি ধরনের ইউনিফর্ম তারা পরে আছে। এরপর বাকি থাকে শুধু আক্রমণ। সেটাও শুরু ও শেষ হলো ছক কাটা প্ল্যান ধরে।

গুহার মুখে একটা হেলিকপ্টার নামল। হেলিকপ্টার থেকে নামল কোবরা ক্লাবের ইউনিফর্ম পরা গুণে গুণে বিশজন সদস্য। গুহার প্রহরী কোবরা সদস্যরা হকচকিয়ে গেছে। নতুন দলের লীডার, রানা, নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে জানাল—হেডকোয়ার্টার থেকে পালা বদলের নির্দেশ পেয়ে বিজ্ঞানী ডক্টর ইসলাম ও গুহার দায়িত্ব বুঝে নিতে এসেছে তারা। নির্ভেজাল সরীসৃপদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই নকল সাপগুলো রানার নেতৃত্বে গুহাটা দখল করে নিল, প্রতিপক্ষ সব ক'জনকে নিরস্ত্র করল, এবং বলাই বাহুল্য যে বিজ্ঞানী ভদ্রলোককেও গুহার ভেতর থেকে মুক্ত করা হলো।

গুহা থেকে ওরা তখনও বেরোয়নি, ব্যাকআপ টীম ওয়াকি-টকির মাধ্যমে রানাকে খবর পাঠাল, সম্ভবত কোবরাদের কেউ বোতামে চাপ দিয়ে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে র‍্যাঞ্চ থেকে রওনা হয়েছে তিন ট্রাক ভর্তি রাইফেলধারী 'কাউবয়'।

গুহাটা আসলে একটা গোলকধাঁধার মত, ভেতরে একাধিক অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি আছে, যত সহজে ঢোকা গেল তত সহজে বেরুনো গেল না। বেশি সময় লেগে যাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ট্রাক তিনটে কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে ভাগ্য ভাল যে রানার ব্যাক আপ টীমও ইতিমধ্যে আরেকটা হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে গেছে।

সবচেয়ে গুরুত্ব ডক্টর ইসলামের। রানা তাঁকে প্রথম হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে পাইলটকে এলাকা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট একটা পাহাড় চূড়ায় চলে যেতে বলল।

বিজ্ঞানীকে নিয়ে প্রথম হেলিকপ্টার চলে যাবার পর শুরু হলো র‍্যাঞ্চ থেকে আসা মার্সেনারিদের সঙ্গে তুমুল বন্দুকযুদ্ধ। দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে রকেট ছুঁড়ে ট্রাকগুলো উড়িয়ে দেয়া হলো। মেশিন গানের ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট শুইয়ে দিল সশস্ত্র মার্সেনারিদের। দূরত্ব বেশি হওয়ায় বেশিরভাগই তারা আহত হয়েছে, মারা গেছে অল্পই। ট্রাকে করে আরও মার্সেনারি আসতে দেখা গেল। তবে রকেট লঞ্চার আর মেশিন গান থাকায় সুবিধে করবে কি, গুহার কাছাকাছি তারা ভিড়তেই পারল না। ঘণ্টাখানেক পর তাদেরকে আরও পিছু হটতে বাধ্য করা হলো, তারপর দ্বিতীয় হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে এলাকা ত্যাগ করল ওরা।

বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল নির্দিষ্ট পাহাড় চূড়ায় পাইলটকে দেখে। সে আছে, কিন্তু তার হেলিকপ্টার নেই; না, পরিষ্কার ও সমতল চূড়ার কোথাও ডক্টর সিরাজুল ইসলামকেও দেখা যাচ্ছে না।

পাইলট জানাল, কপ্টার থেকে নেমে একটা ঝোপের দিকে প্রস্রাব করতে গিয়েছিল সে। ফিরে আসতে আরোহী ভদ্রলোক হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে তাকে কপ্টারে উঠতে নিষেধ করেন। তার করার কিছুই ছিল না, ভদ্রলোক কপ্টার স্টার্ট দিয়ে তাকে ফেলে রেখে চলে গেছেন।

হতভম্ব রানা কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল। তাতে ডক্টর ইসলাম বাংলাতে লিখে রেখে গেছেন:

'মনে হতে পারে আমি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতকতা করলাম, কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়। আমি আমার জন্মভূমিকে, দেশের জনগণকে ভালবাসি, সেজন্যেই চাইছি না আমার বিপদের সঙ্গে বাংলাদেশ কোনভাবে জড়িয়ে পড়ুক। আমাকে এখন বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারব, আমার জানা আছে। কিছু গোপন এক্সপেরিমেন্টও সারা দরকার, সেজন্যেও কিছুদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হবে আমাকে।

'ই-মেইলে ঢাকায় পাঠানো মেসেজের সতেরো নম্বর পেইজের শেষ প্যারার কোড ভাঙা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি কোন সাইফার বিশেষজ্ঞ রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতার একটা কবিতার বিশেষ একটা অংশের অক্ষরগুলোকে কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করেন। কবিতাটির নাম বসুন্ধরা, চাবি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কবিতাটির এই অংশ থেকে–

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর–
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে···"

'জননী সম মাতৃভূমিকে দেবার মত অনেক কিছুই আছে আমার ঝুলিতে, তবে সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে, এগোতে হবে সাবধানে পা ফেলে। ইতিমধ্যে যা দিয়েছি, সংকেত ভেঙে তার অর্থ উদ্ধার করার পর যন্ত্রগুলো বানাতে পারলে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সম পর্যায়ে উঠে আসবে, বলতে গেলে এক রকম রাতারাতি।

'যদি কোনদিন পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে দেশেই আমি ফিরব। তবে আমার লক্ষ্য শুধু দেশ নয়, আমি চাই গোটা দুনিয়ার সব মানুষ আমার আবিষ্কারের সুফল ভোগ করুক। এটাই অনেকে চাইছে না বলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে প্রাণ থাকতে আমি আমার আবিষ্কার নিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে দেব না। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।'

অদ্ভুত শোনালেও সত্যি, গোটা ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি ঘটে। সেই থেকে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে কোন খবর রানা অন্তত পায়নি। কি ঘটেছে রিপোর্ট পাবার পর গোটা ব্যাপারটা চেপে যাবার নির্দেশ দেন রাহাত খান। যেহেতু ডক্টর ইসলাম লুকিয়ে থাকতে চেয়েছেন তাই তাঁকে খুঁজে বের করতে বা তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেও রাজি হননি তিনি।

*

চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে দাঁড়াল তৃষা, হাত ধরে একটু ঝাঁকাল। 'এই যে, ভাই, আপনি পৃথিবীতেই আছেন তো?'

বর্তমানে ফিরে আসার পর রানার হাসিটা একটু আড়ষ্ট লাগল। 'আপনার বাবা সম্পর্কে আমার কৌতূহলের সীমা নেই। কাছাকাছি পেয়েও আবার তাঁকে হারালাম–এবার চিরকালের জন্যে। সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে বলুন আপনি, প্লীজ।'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'দুঃখিত। এক অর্থে বাবা আমার কাছে প্রায় অচেনা একজন মানুষ ছিলেন। আমরা যে যার নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম যে অনেক দিন পরপর দেখা হত...'

'আপনি তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুই জানেন না?' রানার চোখে-মুখে অবিশ্বাস।

হেসে ফেলল তৃষা। রানাকে মুহূর্তের জন্যে ধরে চেয়ারে বসাল। তারপর নিজেও বসল। 'কেন জানব না, বাবার অনেক আবিষ্কার সম্পর্কেই জানি আমি। এই যেমন জানি যে বাবার লেটেস্ট প্রজেক্ট ছিল ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন ডেভলপ্ করা। ওটারই একটা সংস্করণ, প্রপালশান ইউনিটস, ব্যবহার করা হয়েছে ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলিতে।'

'তাই!' রানা বিস্মিত। 'ওঁর ডিজাইন করা এঞ্জিনে চলছিল ওয়াটার লিলি?' একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনে। 'দেখুন, ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি জানি না। পত্র-পত্রিকা পড়ে যতটুকু বুঝেছি, এই প্রযুক্তি আসতে এখনও ত্রিশ বছর সময় লাগবে। অথচ আপনি বলছেন ওয়াটার লিলিতে ওই বিশেষ ধরনের এঞ্জিনের একটা সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বুঝেছিলেন–ওই প্রযুক্তি আসতে ত্রিশ বছরই লাগার কথা ছিল। তবে বাবা একটা ব্রেকথ্রু ঘটান–একটা বৈপ্লবিক ডিজাইন তৈরি করেন। বাবা প্রথমে সাগরের পানিতে পাওয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তারপর লিকুইড হিলিয়ামের সাহায্যে অ্যাবসলিউট জিরো টেমপারেচারে রাখা একটা হাইলি ম্যাগনেটিক কোর্ টিউবের ভেতর দিয়ে ওই বিদ্যুৎ চালিয়ে দেন। এ থেকে যে ইলেকট্রিক কারেন্ট তৈরি হয় সেটা এনার্জি ফোর্স-এ রূপান্তর হয়ে প্রপালশান ঘটাবার জন্যে থ্রাস্টার-এর মাধ্যমে পানি পাম্প করায়।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল রানা, সেজন্যেই তৃষার কথাগুলো উত্তেজনায় আড়ষ্ট করে তুলল ওকে। 'আপনি কি বলতে চাইছেন যে ওঁর এঞ্জিনের একমাত্র আউটসাইড ফুয়েল সী ওয়াটার? ওয়াটার লিলি শুধু সাগরের পানি দিয়ে চালানো হচ্ছিল?'

'স্যালাইন-এর খুব সামান্য ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড রয়েছে। বাবা এনার্জি উৎপাদনের জন্যে ওটাকে এক অবিশ্বাস্য মাত্রায় ইনটেনসিফাই করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।'

'কল্পনা করা সত্যিই খুব কঠিন যে ফুয়েলের অফুরন্ত, সহজপ্রাপ্য একটা উৎস ব্যবহার করে প্রকাণ্ড সব এঞ্জিন চালানো সম্ভব।'

পিতৃগর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তৃষার চেহারা। 'বাবা আমাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন...'

'কিন্তু আপনি না তখন বললেন যে উনি আপনার কাছে প্রায় অচেনা একজন মানুষ ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাই ছিলেন। তবে যখন দেখা হত তখন শুধু কাজের কথাই বলতেন। এত কিছু বলছি, তাহলে এ-ও বলতে হয় যে বাবা কিন্তু আমার ওপর খুশি ছিলেন না তাঁর লাইনে লেখাপড়া না করায়। আসলে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট টার্ম-এ আমি চিন্তা করতে পারি না। অ্যালজেব্রা করে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটাই নিজের ভেতর কখনও দেখতে পাইনি। সমীকরণ আমার কাছে সময়ের অপচয়। ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস-এ মাস্টার্স করেছি, চাকরি করি একটা কনসালট্যান্ট ফার্মে, মারচ্যানডাইজ অ্যানালিস্ট হিসেবে। আমাদের মক্কেল হলো ডিপার্টমেন্ট স্টোর আর ডিসকাউন্ট হাউস।'

কৌতুক বোধ করায় রানার ঠোঁট সামান্য লম্বা হলো। 'সম্পূর্ণ নতুন জাতের এনার্জি তৈরি করার মত উত্তেজক কিছু নয়।'

'তা হয়তো নয়,' বলল তৃষা, মাথাটা এত জোরে নাড়ল যে ঘাড় আর কাঁধে ঘন মেঘের মত স্তূপ হয়ে থাকা কালো চুলে ঝড় উঠল। 'তবে আমি খুব ভাল রোজগার করি।'

'ঠিক কি ধরনের সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রুর মাধ্যমে আপনার বাবা এই ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন টেকনোলজি নিখুঁত করতে পেরেছিলেন?'

'রিসার্চ আর ডেভলপ করার প্রথম দিকে বাবা একটা রোডব্লকের সামনে পড়েন যখন তাঁর এক্সপেরিমেন্টাল এঞ্জিন প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পাওয়ার আর এনার্জি তৈরি করতে পারলেও এক্সট্রিম ফ্রিকশন, অর্থাৎ প্রবল ঘর্ষণজনিত সমস্যার সৃষ্টি করছিল। হাই আরপিএম-এ মাত্র কয়েক ঘণ্টা চলার পর এঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বাবা তখন আমাদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ী, বাবার বন্ধু কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ফিরোজ ফাহিমের সাহায্য নিয়ে নতুন একটা তেল তৈরির সূত্র আবিষ্কার করলেন, যে তেল বাজারে প্রচলিত যে-কোন কমার্শিয়াল অয়েল-এর চেয়ে একশো ভাগ বেশি এফিশিয়্যান্ট। এবার বাবা নতুন একটা পাওয়ার সোর্স পেলেন, যা কিনা অনির্দিষ্ট কাল চলবে, মাপার যোগ্য ক্ষয় ছাড়াই বছরের পর বছর।'

'তারমানে ওই সুপার অয়েল-ই সেই জাদু, আপনার বাবার ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনকে ড্রইং বোর্ড থেকে বাস্তবে পরিণত করে।'

'হ্যাঁ।' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল তৃষা। 'পাইলট মডেলের সফল টেস্ট প্রোগ্রামের পর বাবা লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স সহ আরও দু'একটা শিপিং কোম্পানিকে তাঁর আবিষ্কৃত এঞ্জিনের ডিজাইন ও নতুন ফুয়েল ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। প্রতিটি চুক্তিতে লেখা আছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লভ্যাংশ বাবা পাবেন। বাবা মারা গেলে, শর্ত অনুসারে, ভবিষ্যতে যাই লাভ হোক...'

'আপনি পাবেন,' আগেই বলে ফেলল রানা।

'ভুল করলেন,' মাথা নেড়ে বলল তৃষা। 'আমি নই, চুক্তিপত্রে লেখা আছে বাংলাদেশ সরকার পাবে।'

'জাহাজই যখন নেই, লাভের কথা এখন আর ভেবে কি হবে...'

'আপনি বোধহয় মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন না,' একটু অভিমানের সুরে বলল তৃষা। 'বললাম না, বাবা বেশ কয়েকটা কোম্পানিকে এঞ্জিনের ডিজাইন আর তেলের ফর্মুলা দিয়ে গেছেন। লং লেলাং কোম্পানি আরও একটা জলযান তৈরি করছে–এটা হবে আন্ডারওয়াটার লাকশারি সাবমেরিন প্যাসেঞ্জার লাইনার। কিন্তু নামটা আমি ভুলে গেছি। ওটা তৈরি হচ্ছে ফ্লোরিডায়, কোম্পানির আরেক শিপইয়ার্ডে।'

'তেলের ফর্মুলাটা ডুপ্লিকেট করা সম্ভব নয়?'

'ফর্মুলা ডুপ্লিকেট করা, হ্যাঁ। কিন্তু প্রসেস, না। এগ্‌জ্যাক্ট প্রডাকশন প্রসেস রিপিট করার কোন উপায় নেই।'

'আমি ধরে নিচ্ছি উনি এ-সব পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছেন।'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বাবা এঞ্জিন ডিজাইনের বিভিন্ন অংশের কম করেও বত্রিশটা পেটেন্ট চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শত্রুরা টাকা খাইয়ে সেগুলোকে আটকে দেয়।'

'আর অয়েল ফর্মুলার?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নাড়ল তৃষা। 'এই রহস্যটা বাবা কারও কাছে ফাঁস করেননি, এমন কি পেটেন্ট অফিসকেও বিশ্বাস করতে পারেননি–তা সে যে দেশেরই হোক।'

'ডক্টর ইসলাম যদি বাংলাদেশ সরকারের, বিশেষ করে বিসিআই-এর সাহায্য নিতেন তাহলেই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল হত।'

'বাবা আসলে সবাই যে পথে হাঁটে সে-পথে হাঁটতে পছন্দ করতেন না। শুধু দেশ উপকৃত হোক, এটা চাননি; চেয়েছেন দুনিয়ার সব মানুষ তাঁর আবিষ্কার থেকে সুযোগ-সুবিধে পাক। আরেকটা কথা...'

'থামলেন কেন, বলুন।'

'বাবা অন্য একটা নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। আমাকে বললেন, এই কাজের ফর্মুলা বাংলাদেশকে তিনি আগেই পাঠিয়েছেন। তবে সেটা নিখুঁত কিনা তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এটার টেস্ট সফল হলে দুনিয়ার চেহারাই নাকি আমূল পাল্টে যাবে।'

'আপনাকে কিছু বলেননি, জিনিসটা কি?'

'না।' মাথা নাড়ল তৃষা। 'এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক সতর্ক ছিলেন। বলতেন, আমার না জানাই ভাল।'

'এটা ছিল মেয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তাঁর গোপন তথ্য কেড়ে নেয়ার জন্যে যারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তাদের হাত থেকে আপনাকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছেন।'

বিষণ্ন মূর্তি, চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে, তৃষা বিড়-বিড় করে বলল, 'মা মারা

যাবার পরও বাবা আর আমি খুব কাছাকাছি আসতে পারিনি। এমনিতে একমাত্র সন্তানের প্রতি তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ বা কমতি ছিল না, কিন্তু তাঁর কাছে প্রথম গুরুত্ব ছিল কাজ–বিজ্ঞান চর্চা। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি, সারাক্ষণ নিজের কাজে ডুবে আছেন। আমার ধারণা, ওয়াটার লিলির প্রথম যাত্রায় বাবা আমাকে দাওয়াত দেন দু'জনের দূরত্বটা কমিয়ে আনার ইচ্ছেতেই।'

প্রায় একমিনিট চুপচাপ চিন্তা করল রানা। তারপর চোখ ইশারায় লেদার ব্যাগটা দেখাল। 'এবার ওটা আপনার খোলা উচিত বলে মনে হচ্ছে না?'

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল তৃষা, সংশয় ও দ্বিধা গোপন করতে চাইছে। 'খুলতে চাই।' ইতস্তত করছে। 'কিন্তু ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ-মুখ একটু লালচে হলো তৃষার; এর জন্যে দায়ী ব্যাগের ভেতর কি পাবে না পাবে এই অনিশ্চয়তা। 'তা জানি না।'

'আপনি যদি ধরে নিয়ে থাকেন আমি একটা মন্দ লোক, আমার উদ্দেশ্য আপনার বাবার মহামূল্যবান কাগজ-পত্র চুরি করা, তাহলে ভুল করবেন। আমি এখানেই বসে থাকি, আপনি ব্যাগটা নিয়ে এক কোণে চলে যান, তারপর ঢাকনি খুলে ভেতরে এমনভাবে উঁকি দেন, আমি যেন কিছুই দেখতে না পাই।'

অকস্মাৎ ব্যাগটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল তৃষা, শব্দ করে কাঁপা কাঁপা নার্ভাস হাসি হেসে বলল, 'জানেন, আমার কোন ধারণাই নেই এটার ভেতর কি আছে। হয়তো নতুন কিছু ডিজাইন আছে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝব না।'

'তা না বুঝি, দেখতে তো কোন দোষ নেই।'

তারপরও দীর্ঘ এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে দেখা গেল তৃষাকে। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ব্যাগের ল্যাচ ক্লিক করে ঢাকনিটা তুলল সে। 'এ কি! হায় আল্লাহ, একি কাণ্ড!'

রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'কি···ভেতরে কি দেখছেন?'

যেন স্লো-মোশানে, হাতের ব্যাগটা ঘোরাল তৃষা, তারপর কোল থেকে খসে পড়তে দিল 'এ কিভাবে ঘটল আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি তো এটা এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করিনি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে লেদার কেসের ভেতরে তাকাল রানা।

ওটা খালি। ভেতরে কিছুই নেই।

সাত

সিঙ্গাপুর দুশো মাইল দূরে থাকতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হলো আগামী তিনদিন আকাশ পরিষ্কার ও সাগর শান্ত থাকবে। সী রবিনের আর যেহেতু ডুবে যাবার কোন ভয় নেই, নিখিল শ্রীবাস্তব তাঁর কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেটকে নির্দেশ দিলেন, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দরে পৌঁছাতে হবে।

অপ্রত্যাশিত দু'হাজার প্যাসেঞ্জার থাকায় ফুড সাপ্লাইয়ের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে উঠেছে।

সী রবিন সিঙ্গাপুরের অন্য এক বন্দরে পৌঁছাল আরও প্রায় সাত ঘণ্টা পরে। শিপইয়ার্ডে অপেক্ষা করছিল দেশী-বিদেশী মিডিয়ার একশোরও বেশি রিপোর্টার ও ফটোজার্নালিস্ট। ইতিমধ্যে সারা দুনিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে, সামুদ্রিক উদ্ধার অভিযানের গত কয়েকশো বছরের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটেনি যে একটা জাহাজ একাই প্রায় দু'হাজার লোককে তুলে নিয়েছে।

অভিনন্দন, মাল্যদান, শুভেচ্ছাবাণী পাঠ ইত্যাদির পাট শেষ হবার পর ব্রিজ উইং-এ রানার পাশে এসে দাঁড়াল তৃষা। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর তৃষাই মুখ খুলল, 'আমার ধারণা এখানেই আমরা বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছি।'

'আপনি কি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, প্রথম যে ফ্লাইটের টিকিট পাব সেটাতেই।'

'আমেরিকার কোথায়?'

'নিউ ইয়র্ক।' সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল তৃষা। 'আপার ওয়েস্ট সাইডে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে।'

'আপনি সেখানে একা থাকেন?'

'না।' হাসল তৃষা। 'নিশি নামে একটা বিড়াল আর টক্কা নামে একটা হাউন্ডও থাকে আমার সঙ্গে।'

'নিউ ইয়র্কে আবার কবে যাওয়া হবে জানি না, তবে যদি কোনদিন যাই তো ডিনার খাওয়াবার জন্যে যোগাযোগ করতে পারি।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বের করে খসখস করে ফোন নম্বর লিখল তৃষা। 'যোগাযোগ করলে সাংঘাতিক খুশি হব। তবে ডিনার আপনি নন, আমি খাওয়াব। প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে নয়—ওই ঋণ শোধ হবে না জানি, তাই চেষ্টা করে লাভ নেই। খাওয়াব আপনার সঙ্গ পাবার লোভে।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আপনি আমার প্রেমে পড়ে গেছেন, এরকম কোন ভুল সংকেত নিজেকে আমি দিচ্ছি না। তারপরও ধন্যবাদ।'

রানার চোখে তাকিয়ে কি দেখল কে জানে, অকস্মাৎ প্রচুর রক্ত উঠে এল তৃষার মুখে। রেইলিংটা ধরল সে, যেন নিজেকে সামলাবার প্রয়োজন অনুভব করছে। হঠাৎ রানার একটা হাত পড়ল তার কাঁধে। নিজের অজান্তে ওর গায়ে হেলান দিল তৃষা। যখন খেয়াল হলো, নিজেকে সরিয়ে নিল না। পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, সাগর দেখছে চুপচাপ। তারপর বিড়বিড় করল তৃষা, 'চলি।' কয়েক পা এগিয়ে থামল সে, ঘুরল। 'বাবার লেদার কেসটা।'

'হ্যাঁ?' রানার কথায় প্রশ্নের সুর, বুঝতে পারছে না তৃষা কি বলতে চায়।

'ওটা আপনার।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ওঅর্ক ডেকে নেমে গেল তৃষা। গ্যাঙওয়ে ডকে নামাতেই তীরে পা রাখল সে, রিপোর্টারদের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

*

সিঙ্গাপুর সরকার একটা ফাইভ স্টার হোটেলে সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করেছে, প্রকাশ্যে গর্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে রাজি নয় বলে ক্যাপটেন ফ্রান্সিস শেফার্ড সহ সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে জাহাজে একা রয়ে গেছে রানা।

আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে শিপইয়ার্ড থেকে কাল সকালে ড্রাই ডকে তোলা হবে সী রবিনকে। শিপইয়ার্ড ফোরম্যান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে জানিয়েছে মেরামত করতে খুব বেশি হলে দিন তিনেক সময় লাগবে।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ও নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে গোটা ব্যাপারটা রিপোর্ট করা হয়েছে আজ সকালে। রানা আশা করছে নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন যে-কোন সময় যোগাযোগ করে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাবেন। ওর ধারণা, বস্ নিজে টেলিফোন করবেন না, সম্ভবত পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার জন্যে সোহেলকে সিঙ্গাপুরে পাঠাবেন।

এ-সব নিয়েই ভাবছে রানা, হঠাৎ গ্লোবালস্টার স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল, একই সঙ্গে একটা টিভি মনিটরে ফুটে উঠল নুমা চীফের ছবি। রানাকে ফোনের রিসিভার তুলতে হলেও, মিস্টার হ্যামিলটন নুমার কমিউনিকেশন সেন্টার থেকে যোগাযোগ করছেন বলে আড়ালে ফিট করা স্পীকার ও মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তিনি রানার কথা শুনতে পাচ্ছেন, রানাকে নিজের কথা শোনাতেও পারছেন কোন ফোন রিসিভার ছাড়াই।

'গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রধান খবর এখন শুধু সী রবিন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'রিপোর্টে লিখেছ জাহাজের বেশ কিছু ক্ষতি হওয়ায় তুমি দুঃখিত। মাই সান, এতগুলো মানুষকে বাঁচাবার বিনিময়ে পুরো জাহাজটাও যদি হারাতে, কারও কিছু বলবার ছিল না। জ্বলন্ত ওয়াটার লিলির স্যাটেলাইট ফটো দেখেছি আমরা। এমন ভয়াবহ আগুন আগে কোন জাহাজে লেগেছে কিনা গবেষণার বিষয়। চারদিক থেকে এত বেশি অভিনন্দন আসছে যে নুমার ফোন লাইনে জ্যাম লেগে গেছে। সবার প্রতি, বিশেষ করে তোমার প্রতি, সবাই আমরা কৃতজ্ঞ। ক্যাপটেন শেফার্ড আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, আগুনের আভাটা ঠিক সময়মত তুমি যদি দেখতে না পেতে, লোকগুলোকে হয়তো বাঁচানো যেত না।'

রানা স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে জানাল, 'এরমধ্যে ভাগ্যের সহায়তাই সবটুকু, আমার কোন কৃতিত্ব নেই।' প্রসঙ্গটা দ্রুত বদলে ফেলল ও, বলল, 'ভাল কথা, রিপোর্টে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ভেসে থাকার প্রয়োজনে আমাদের বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট সাগরে ফেলে দিতে হয়েছে?'

'সাবমারসিবলগুলোও?' অ্যাডমিরালের গলার স্বরে উদ্বেগ।

'তারমানে রিপোর্টের সবটুকু আপনি পড়েননি,' বলল রানা। 'না, সাবমারসিবলগুলো নয়–ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, তবে পরে উদ্ধার করেছি।'

'খুশি হলাম। ওগুলো তোমাদের দরকার হবে।'

'দরকার হবে...কি রকম? আমাদের অর্ধেকেরও বেশি রিসার্চ গিয়ার পানিতে পড়ে রয়েছে, এই অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের তলায় তেলের উৎস মুখ খুঁজে বের

করার অপারেশন বাতিল না করে উপায় নেই।'

টিভি স্ক্রীনে হঠাৎ রহস্যময় একটুকরো হাসি হাসতে দেখা গেল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। 'রানা, এরপর আমি নই, তোমার সঙ্গে কথা বলবেন আমার এক বন্ধু। আশা করি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর তুমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়ে যাবে।'

'আপনার বন্ধু? কে তিনি? আমার পরিচিত কেউ?' রানা বিস্মিত। ক্ষীণ একটু সন্দেহও হচ্ছে।

'হ্যাঁ, তোমার পরিচিত–ঢাকা থেকে,' বললেন হ্যামিলটন। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনের একপাশে সরে গেল তাঁর ছবি, সদ্য তৈরি ফাঁকা জায়গায় দেখা গেল একটা সাদা দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ফিট করা আরেকটা স্ক্রীন–টিভির ভেতর আরেক টিভি–সেই স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টারে নিজের চেম্বারে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, হাতে চুরুট, কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কোঁচকানো।

'সার।' শব্দটা উচ্চারণ করে রানা শুধু জানাল পুরোপুরি মনোযোগী সে।

'তেলখনি আবিষ্কারের প্রজেক্ট আপাতত বাতিল করা হয়েছে, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'আমি চাই ডাইভ দিয়ে ওয়াটার লিলিতে নামো তুমি। এখন তোমার কাজ জাহাজটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা সার্ভে করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা, যাতে জানতে পারো কেন ওটায় আগুন লেগেছিল, হঠাৎ ওভাবে ডুবেই বা গেল কেন।' একটু থামলেন বিসিআই চীফ। 'তুমি জানো তো যে টো করার সময় হঠাৎ প্রায় টুপ করে ডুবে গেছে ওটা?'

'জ্বী, জানি। টাগ আর ওটার কোম্পানি অফিসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল।'

'ওয়াটার লিলি যেখানে ডুবেছে সেখানে ডুব দেয়ার মত প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট একমাত্র সী রবিনের আছে। আরও যদি কিছু দরকার হয়, নুমা হেডকোয়ার্টার সাপ্লাই দিতে পারবে।' ধীরে ধীরে কথা বলছেন রাহাত খান, রানা যাতে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার বুঝে নিতে পারে। 'আমি মনে করি, আগুনটা ছিল স্যাবটাজ। ওভাবে ডুবে যাওয়াটাও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছি না। তোমার রিপোর্ট পড়ার পর আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই যে এর সঙ্গে ডক্টর ইসলামের যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের সম্পর্ক আছে। কেউ তাঁর এই আবিষ্কারগুলো কেড়ে নিতে চাইছে। স্যাবটাজটা বলে দিচ্ছে তাকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। আগে দেখি ওয়াটার লিলি থেকে কি তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে পারো তুমি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে শায়েস্তা করা যায় তাকে বা তাদেরকে। তুমি কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'জ্বী-না,' বলল রানা। 'আপনি কি চাইছেন বুঝতে পারছি, সার। তবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'গুড লাক, রানা।' স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাহাত খান।

'হ্যাঁ, বলো,' বললেন অ্যাডমিরাল, স্ক্রীনের পুরোটা এখন একা তিনিই দখল করে আছেন।

'মিস্টার হ্যামিলটন, আমাদের বড় ক্রেনটা সাগরে ফেলে দিতে হয়েছে...'

'হয় একটা কেনো, নয়তো ভাড়া করো,' রানার কথা শেষ হবার আগেই সমাধান জানিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'বসকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি,' বলল রানা। 'ওয়াটার লিলিতে ঠিক কি পাব বলে আশা করতে পারি আমরা? আমি ফায়ার ইন্সুরেন্স ইনভেস্টিগেটর নই বলেই হয়তো এ-ব্যাপারে নিজেকে অজ্ঞ মনে হচ্ছে। তাই বলছিলাম, এমন একজনকে পেলে ভাল হত মেরিন ডিজাস্টার সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে।'

জর্জ হ্যামিলটন হেসে ফেললেন। 'প্রস্তাবটা ঘুরিয়ে করছ–ববি মুরল্যান্ডকে তোমার দরকার, এই তো?'

'দরকার হলেই বা কি, তাকে পাচ্ছি কোথায়,' বলল রানা। 'যতটুকু জানি, আর্কটিকে কি একটা প্রজেক্টে কাজ করছে সে।'

'বলো করছিল। এই মুহূর্তে সে একটা প্লেনে রয়েছে। প্লেনটা সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবে কাল সকালে।'

রানা খুশি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন। ওকে সত্যি আমার দরকার।'

উত্তরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'বন্ধুকে কথা দিয়েছি তোমাদের নতুন এই অ্যাসাইনমেন্টে নুমা সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবে, রানা। প্রয়োজনে আমাকেও তুমি ফিল্ডে পেতে পারবে।'

রানা না বলে পারল না, 'আপনার এই আন্তরিকতা আমরা কখনও ভুলব না, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'আসলে নুমা তোমাদের কাছ থেকে এত দিন ধরে যে উপকার পেয়েছে তার খানিকটা শোধ করার সুযোগ পেয়ে সত্যি আমি খুশি।'

চাকা লাগানো প্রকাণ্ড একটা সুটকেস নিয়ে পরদিন বেলা এগারোটায় সী রবিনে হাজির হলো ববি মুরল্যান্ড। সে যতটা লম্বা, তার কাঁধ দুটো প্রায় ততটাই চওড়া। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা কাঠামোর ওজন একশো পঁচাত্তর পাউন্ড, পুরোটাই পেশির সমষ্টি। কোঁকড়ানো চুল। মুখের গড়ন এমনই, না হাসলেও মনে হবে হাসছে।

'জাহাজে আমাদের নায়ক শালাটা আছে নাকি?'

তার চিৎকার শুনে পাইলটহাউস থেকে ব্রিজে বেরিয়ে এল রানা। দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল; মুরল্যান্ড তিন গুণ বেশি শক্তিশালী হলেও, জড়িয়ে ধরার সময় প্রতিবার রানা তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে মজা পায়। কুশল বিনিময়ের পর রানা জানতে চাইল, 'শেষবার খবর পেলাম তুমি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছ। কিন্তু দাওয়াতটা পেলাম না কেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করল মুরল্যান্ড। 'অ্যাডমিরাল আমাকে একটা প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দিলেন, কাজেই আমার প্রেমিকাও আমার জীবন থেকে সরে পড়ল।'

'কেন, এরকম ঘটল কেন?'

'কেউ আমরা নিজেদের পেশা ছাড়তে রাজি নই, এটাই আসল কারণ,' বলল মুরল্যান্ড। 'প্রাচীন চীনা লিপির পাঠোদ্ধার করার একটা কাজ পেল সে, সময়

লাগবে তিন বছর। সুযোগটা ছাড়তে রাজি নয়, কাজেই বেইজিং-এ চলে গেল সে।' হাসছে মুরল্যান্ড।

'এতবড় একটা ধাক্কা খেয়েও তুমি হাসতে পারছ দেখে সত্যি ভাল লাগছে...'

'তুমিই একদিন বলেছিলে আমার হাসি আর কান্নাতে নাকি এত মিল যে দুটোকে আলাদা করে চেনা অসম্ভব। তাহলে কি করে নিশ্চিত হচ্ছ আমি কাঁদছি না?'

'তোমার কান্নাও আমার কাছে খুশির খবর, ববি।' গোটা ব্যাপারটা কৌতুক হলেও রানাকে এই মুহূর্তে গম্ভীর ও সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'কাঁদলে মানুষের মন হালকা হয়, দুঃখটা অনেক কম ভোগায়। এসো, তোমার স্যুইটটা দেখিয়ে দিই।'

'স্যুইট না ছাই!' মুখ বাঁকাল মুরল্যান্ড। 'সী রবিনে আগে যেন আসিনি। কেবিন তো নয়, একেকটা মুরগীর খুপরি।'

আধঘণ্টা পর মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড়চোপড় পাল্টে রানার কেবিনে ঢুকল মুরল্যান্ড। দেখল ছোট একটা ডেস্কে বসে ওয়াটার লিলির ডেক প্ল্যান স্টাডি করছে রানা। ডেস্কের এক কোণে ছোট একটা ট্রে রাখল মুরল্যান্ড, আসার পথে গ্যালি থেকে দু'কাপ কফি নিয়ে এসেছে।

'ঠিক কোথায় ডুবেছে ওয়াটার লিলি?'

'কোকো চ্যানেলে। ল্যান্ডফল আর কোকো দ্বীপের মাঝখানে,' বলল রানা। 'ওদিকটায় সাগরের তলায় একটা ট্রেঞ্চ পাওয়া গেছে, এখনও নামকরণ হয়নি। ধরো, আন্দামান ট্রেঞ্চ। ওটার পশ্চিম ঢালে।'

'ট্রেঞ্চটার কথা আমিও শুনেছি।' মুরল্যান্ডের ভুরু উঁচু হলো। 'যথেষ্ট গভীর।'

'আমার হিসাবে, ক্রুজ শিপ উনিশ হাজার ফুট নিচে শুয়ে আছে।'

মুরল্যান্ড চোখ জোড়া ভুরুকে অনুসরণ করল। 'কোন্ সাব ব্যবহার করার কথা ভাবছ?'

'ব্লু নেভিগেটর। এ-ধরনের কাজের জন্যেই ওটা তৈরি।'

মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়লেও, চেহারায় সেটা ধরা পড়ল না, মুরল্যান্ড বলল, 'অবশ্যই তুমি জানো যে ওটার স্পেসিফাইড ডেপথ্ সাড়ে উনিশ হাজার ফুট। তাছাড়া, অতটা গভীরে এখনও ওটাকে টেস্ট করা হয়নি।'

'ওটার ডিজাইনাররা নিজেদের কাজ বোঝে কিনা সেটা পরীক্ষা করার মোক্ষম একটা সুযোগ পাচ্ছি আমরা।'

'এখন আমাকে নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হবার জন্যে মদ খেতে হবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'তা না হলে দুঃস্বপ্ন দেখব–সাগরের তলায় সাবমারসিবল বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছি।'

মাঝরাত পর্যন্ত দুই বন্ধু গল্প করল। ওয়াটার লিলির আগুন কিভাবে দেখতে পেল, কিভাবে উদ্ধার করল আরোহীদের, সংক্ষেপে সবই জানাল রানা। ভারতীয় কন্টেইনার শিপ ফ্লাইং কার্পেট আর উত্তর কোরিয়ান মিসাইল বহনকারী ফ্রিগেটের কথাও বলল। সবশেষে বলল তৃষা আর তার বাবা ডক্টর ইসলামের কথা।

রানা থামার পর মুরল্যান্ড মন্তব্য করল, 'ভাল ধকলই গেছে তাহলে।'

'তা গেছে। তবে হাতের কাজটা আরও কঠিন হবে বলে আমার ধারণা, ববি,' বলল রানা। 'তৈরি থেকো, আমাদেরকে হয়তো বড় একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে।'

কেবিনের কোণে পড়ে থাকা লেদার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে মুরল্যান্ড জানতে চাইল, 'ডক্টর ইসলামের যে ব্যাগটার কথা বললে, ওটাই কি সেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বলছি.ল ওটাকে নিয়ে এত কাণ্ড ঘটার পর দেখা গেল ভেতরে কিছু নেই?'

'বুচ ক্যা সেডি শহর ছেড়ে চলে যাবার পর ব্যাংক ভল্টের যা দশা হয়, খালি।'

ব্যাগটা তুলে এনে কোলে ফেলে গায়ে হাত বুলাল মুরল্যান্ড। 'পুরানো লাগিজ কেন যেন টানে আমাকে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে।'

ক্যাচগুলোর প্যাঁচ খুলে ঢাকনিটা তুলল মুরল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু'পাঁইট তেল হড় হড় করে গড়িয়ে তার কোলে পড়ল, কোল থেকে ঝরে পড়তে শুরু করল কার্পেটে। হতভম্ব মুরল্যান্ড বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকল, তার ট্রাউজার ভিজিয়ে দিয়ে জুতোয় নামছে তেলের ধারা। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে চোখ গরম করে তাকাল। 'এই প্রথম জানলাম যে তুমি প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করো।'

রানার চোখে-মুখে নিখাদ বিস্ময়। 'আরে, না!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে ডেস্ক ঘুরে মুরল্যান্ডের পাশে চলে এল ও, ঝুঁকে ব্যাগটার ভেতর তাকাল। 'আমার কথা বিশ্বাস করো। সত্যি বলছি, এ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। কালও ব্যাগটা যখন চেক করি খালি ছিল। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি আর চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার ছাড়া জাহাজে আর কেউ ছিল না। চুপিসারে জাহাজে উঠে কেউ ব্যাগটায় তেল ভরে রেখে যাবে, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না। তাতে কার কি লাভ?'

'তাহলে ব্যাগের ভেতর তেলটা এল কোত্থেকে?' মুরল্যান্ডের চেহারা থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত হাসি-হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। 'জানা কথা ওই তেল আপনাআপনি ওখানে তৈরি হয়নি।'

'বলছি তো, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই,' বলল রানা। ওর চোখে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। 'তবে কাজে যখন হাত দিতে যাচ্ছি, এই রহস্যেরও সমাধান হতে হবে, তুমি নিশ্চিত থাকো।'

আট

ডক্টর ইসলামের ব্যাগে কে তেল ভরেছে, এই রহস্যের কথা আপাতত ভুলে গিয়ে রানা ও মুরল্যান্ড সী হর্স-এর ইকুইপমেন্ট আর ইলেকট্রনিক সিস্টেম চেক ও টেস্ট করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সী হর্স হলো সার্ভে ভেসেল-এর অটোনমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল, সংক্ষেপে এইউভি। ওয়াটার লিলির কবরের দিকে যাওয়ার পথে ক্যাপটেন শেফার্ড ও জাহাজের এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘ

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাগরের অতটা গভীরে প্রথমেই মনুষ্যবাহী ব্লু নেভিগেটর না পাঠিয়ে অটোনমাস ভেহিকেল পাঠানোই নিরাপদ।

সাত ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া, সাত ফুট লম্বা, সী হর্সের ওজন সাত হাজার পাউন্ডের কিছু কম। ওটার বাইরের আবরণ, ত্বকও বলা যেতে পারে, টাইটেইনিয়ামের পুরু স্তর। দূর থেকে দেখলে বিশাল একটা ডিম বলে মনে হবে, পাশগুলো খোলা, দাঁড়িয়ে আছে স্লেজ রানার-এর ওপর। ভেতরে ভিডিও ও স্টিল ক্যামেরা আছে। আছে কমপিউটর হাউজিং। পানির উষ্ণতা, অক্সিজেনের মাত্রা ও লবণাক্ততা পরিমাপের জন্যে আছে সেনসর। একটা ডিসি মোটর চালায় ওটাকে, শক্তি যোগায় ম্যাঙ্গানিজ অ্যালকালাইন ব্যাটারি সিস্টেম। মাদার শিপে সিগন্যাল পাঠাবার ও সিগন্যাল রিসিভ করার আধুনিক সব সিস্টেম ফিট করা। গায়ে আছে বারো সেট আলোর ব্যবস্থা। সায়ান্স ফিকশন মুভিতে যেমন দেখা যায়, ভেহিকেলের একপাশ থেকে বেরিয়ে আছে একটা জটিল রোবোটিক আর্ম বা ম্যানিপিউলেটর। চারশো পাউন্ড নোঙর তোলার শক্তি রাখে ওই যান্ত্রিক হাত, আবার অনুভব শক্তি এত প্রখর যে চায়ের একটা কাপও তুলতে পারে। অন্যান্য রোবোটিক ভেহিকেল যেমন দেখা যায়, পাইলটহাউসের কন্ট্রোল-এর সঙ্গে কর্ড-এর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে, সী হর্স সেরকম নয়। এটায় গতি সঞ্চার ও ভিডিও ক্যামেরা অপারেট করা হয় কয়েক হাজার ফুট ওপরে ভেসে থাকা সী রবিনের কমান্ড রূম থেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে।

রোবোটিক আর্ম অ্যাডজাস্ট করতে মুরল্যান্ডকে সাহায্য করছে রানা, একজন ক্রু এসে জানাল, 'ক্যাপটেন শেফার্ড আপনাকে খবর দিতে বললেন যে টার্গেট থেকে আর মাত্র তিন মাইল দূরে রয়েছি আমরা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ক্যাপটেনকে গিয়ে বলো যে একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করছি আমরা, প্লীজ।'

টুলবক্সে একজোড়া স্ক্রুড্রাইভার ফেলে সিধে হলো মুরল্যান্ড, পিঠ পিছন দিকে বাঁকা করে বলল, 'সী হর্স তৈরি, দোস্ত।'

'চলো ব্রিজে গিয়ে দেখি সাইড স্ক্যান সোনার-এ কেমন দেখাচ্ছে ওয়াটার লিলিকে।'

'চলো।'

পাইলটহাউসের ঠিক সামনেই কমান্ড সেন্টার কমপার্টমেন্ট, ক্যাপটেন শেফার্ড আর নুমার কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী ওভারহেড লাইটিং-এর লালচে-নীল আলোয় দাঁড়িয়ে আছেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে লাইটের রেড-ব্লু ওয়েভ ব্যান্ড-এ ইন্সট্রুমেন্টের রীডিং পাঠ করা সহজ, বিশেষ করে কাজটা যদি দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়।

ওঁরা সবাই জড়ো হয়েছেন ক্লেইন কোম্পানির সিস্টেম ফাইভ থাউজেন্ড রেকর্ডার-এ ফিট করা কমপিউটর-নিয়ন্ত্রিত স্ক্রীনের সামনে, অপলক চোখে উন্মোচিত হতে দেখছেন বিশ হাজার ফুট নিচের সাগরের তলা। রঙিন ইমেজ, মসৃণ ঢাল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; নেমে গেছে আরও গভীর অতলে। মুরল্যান্ডকে

নিয়ে রানা ঢুকছে দেখে ক্যাপটেন শেফার্ড ইঙ্গিতে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—ওখানে ডিজিটাল রিডআউট-এ দেখা যাচ্ছে টার্গেটে পৌঁছাতে আরও কতটুকু দূরত্ব পেরোতে হবে। 'আরও মাইলখানেক ওপরে উঠতে হবে,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'টাগ কি এই জিপিএস পজিশনই দিয়েছিল?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা ঝাঁকালেন শেফার্ড। 'টো রোপ ছিঁড়ে যাবার পর লাইনার যেখানে ডুবে যায়।'

কমান্ড সেন্টারে উপস্থিত সবার চোখ স্ক্রীনে আটকে আছে। সী রবিনের অনেক পিছনে রয়েছে একটা কেইবল, জাহাজটাকে অনুসরণ করছে. সেই কেইবলে ফিট করা সেনসর গভীর সাগরতলের ইমেজ পাঠাচ্ছে স্ক্রীনে। অত নিচে সাগরের ঢাল মরুভূমির মত দেখতে, খয়েরি পলি জমে আছে; এবড়োখেবড়ো আকৃতির কোন পাথর বা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। সবার পেশিতেই টান পড়ছে, কারণ কিছু একটা দেখার আশায় অপেক্ষা করছে ওঁরা।

'পাঁচশো গজ,' বিড়বিড় করে জানালেন শেফার্ড।

সবাই চুপ করে গেল।

'কিছু একটা আসছে,' বললেন শেফার্ড, স্ক্রীনটা তিনিই সবার চেয়ে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

ধীরে ধীরে রেকর্ডারে নিরেট একটা জিনিস আকৃতি পেতে শুরু করল, দেখেই বোঝা গেল মানুষের তৈরি। আউটলাইন অসমান ও ভাঙাচোরা। আকারে খুব ছোট, বিশাল ক্রুজ লাইনারের যে ইমেজ দেখতে পাবে বলে আশা করছে তার সঙ্গে কোনভাবেই মিলছে না।

'হ্যাঁ, ওটাই,' জোর দিয়ে বলল রানা।

শেফার্ড এক গাল হেসে বললেন, 'একবারের চেষ্টাতেই পেয়ে গেছি।'

'কিন্তু ওয়াটার লিলির সাইজের সঙ্গে তো মিলছে না,' প্রতিবাদের সুরে বলল মুরল্যান্ড।

ক্যাপটেন স্ক্রীনের দিকে একটা আঙুল তুললেন। 'ববি ঠিক বলছে। আমরা ওটার মাত্র একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। পরের অংশটা ওই আসছে।'

স্ক্রীনের দিকে চোখ, রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'ওয়াটার লিলি ভেঙে গেছে, হয় নামার সময়, কিংবা তলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।'

জাহাজের বড় একটা অংশকে সরে এসে স্ক্রীনে জায়গা করে নিতে দেখা গেল, ক্যাপটেন ওটাকে ওয়াটার লিলির স্টার্ন বলে আন্দাজ করলেন। জাহাজের দুই অংশের মাঝখানে আবর্জনার স্তূপ নিয়ে বিশাল একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে—আবর্জনা বলতে ছোট-বড় নানা আকারের জিনিস-পত্র, এখন যেগুলোকে আর চেনার উপায় নেই, ছড়িয়ে পড়েছে যেন কোন টর্নেডোর আঘাতে।

একটা নোট প্যাডে জাহাজটার প্রতিটি অংশের স্কেচ এঁকে রাখছে মুরল্যান্ড। 'ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেছে।'

স্কেচগুলোর সঙ্গে সোনার ইমেজ মেলাল রানা। একটার সঙ্গে আরেকটার দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল।

শেফার্ড বললেন, 'আগুনে পুড়ে জাহাজের ইন্টারন্যাল স্ট্রাকচার দুর্বল হয়ে পড়াতেই সম্ভবত তলিয়ে যাবার সময় ভেঙে যায়।'

'নতুন কিছু নয়,' সায়ান্টিফিক টীমের একজন বললেন। 'টাইটানিকও ডুবে যাবার সময় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু টাইটানিক নেমে গিয়েছিল এক্সট্রীম একটা অ্যাঙ্গেল ধরে,' ক্যাপটেন শেপার্ড বললেন। 'টাগ বোটের ক্যাপটেনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ওয়াটার লিলিকে যিনি টো করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা হচ্ছে, ক্রুজ শিপ অত্যন্ত দ্রুত ডুবেছে, খুব বেশি হলে মাত্র পনেরো ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। টাইটানিক ডুবেছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।'

সামনের জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হলো, ওয়াটার লিলি অক্ষত অবস্থায় ডোবে, ভেঙে টুকরো হয় তলার সঙ্গে সংঘর্ষে। ওটার স্পীড ছিল সম্ভবত ঘণ্টায় ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।'

একমত হতে না পেরে মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে ভাঙা ছোট টুকরোগুলো—আবর্জনাই বলা চলে—আরও কম জায়গা দখল করত। কিন্তু চারদিকে যতদূর চোখ যায় সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো।'

'তাহলে ডোবার সময় ওটা ভাঙল কি কারণে?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন শেফার্ড, বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়।

'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'দেখা যাক সী হর্স রহস্যটার সমাধান দিতে পারে কিনা।'

হালকা নীল পুব আকাশের গায়ে চোখ-ধাঁধানো কমলা সূর্য উঠছে। ঠিক এই সময় নতুন বসানো একটা ক্রেইনের নিচে ঝুলতে দেখা গেল সী হর্সকে। সাগর আজ শান্তই, কোন ঢেউই তিন ফুটের ওপরে উঠছে না।

সী রবিনের পিছনে দাঁড়িয়ে জাহাজের সেকেন্ড অফিসার সী হর্সকে পানিতে নামানোর অপারেশন পরিচালনা করছে। নীলচে সবুজ বঙ্গোপসাগরে ধীরে ধীরে নামানো হলো এইউভি-কে। ওটাকে ভাসতে দেখে একটা সুইচ অ্যাকটিভেইট করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক স্ন্যাপ রিলিজ হতেই লিফটিং কেইবল্ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

কমান্ড সেন্টারের ভেতর, জয়স্টিকের চারধারে ভিড় করে থাকা এক গাদা নব আর সুইচসহ একটা কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে মুরল্যান্ড। এখানে বসেই সাগরের অতলতলে সী হর্সকে পথ দেখাবে ও। পোনে চার মাইল নিচে এইউভি-কে পরিচালনা করার যোগ্যতা তারই সবচেয়ে বেশি, যেহেতু প্রোবটার কমপিউটর সফটঅয়্যার সে নিজে তৈরি করেছে, ওটা বানাবার সময় প্রজেক্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারও ছিল সে-ই।

তার পাশে সামনে কী বোর্ড নিয়ে বসেছে রানা, এই মুহূর্তে এইউভি-র ভেতরে বসানো কমপিউটরকে কয়েকটা নির্দেশ দিচ্ছে। মুরল্যান্ড ভেহিকেলটাকে চালাবে, রানা অপারেট করবে ওটার আলো আর ক্যামেরা। ওদের পিছনে এক পাশে টেবিলে বসে ওয়াটার লিলির কনস্ট্রাকশন প্ল্যান-এ চোখ বুলাচ্ছে জিনা

ক্যারল। ডিজাইনের এই কপিটা জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে ই-মেইলের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জিনা ক্যারলকে প্রথমে দেখে বোঝা যাবে না যে সে মেয়ে। প্যান্ট-শার্ট তো পরেই, পরেও ছেলেদের স্টাইলে। হাবভাবে বিন্দুমাত্র জড়তা বা মেয়েসুলভ সংকোচ একেবারেই নেই। চুলও খুব ছোট। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, বিয়ে করেনি, করবে বলেও মনে হয় না। নিজের কাজের প্রতিই তার সমস্ত নিষ্ঠা, নুমার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেরিন বায়োলজিস্ট সে।

মুখ তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল জিনা। 'জাহাজটা যদি মাটির নিচে ডেবে গিয়ে থাকে, দেখার মত খুব বেশি কিছু সী হর্স পাবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা ওখানে পৌঁছানোর পর জানা যাবে।'

প্রোব পানিতে তো নামানো হয়েছে, কিন্তু সাগরের তলায় পৌঁছাতে সময় লাগবে ওটার সাড়ে তিন ঘণ্টা। যে-কোন আন্ডারওয়াটার সার্চ প্রজেক্টে কাজ করতে হলে ধৈর্য ধরতে জানাটা মস্ত গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কাজটা আসলে সত্যি খুব একঘেয়ে।

সময়টা ওরা কফি খাবার ফাঁকে গল্প করে পার করে দিল। দশ মিনিট পরপর প্রোব-এর অলটিমিটার থেকে আসা ডিজিটাল নম্বর দেখে দূরত্ব ঘোষণা করছে মুরল্যান্ড।

'সাগরের তলা এখন মাত্র পাঁচশো ফুট নিচে।'

'নিচের সারির লাইটগুলো জ্বালছি,' বলল রানা।

সী হর্সের নামার গতি কমাল মুরল্যান্ড। এই মুহূর্তে ওটার গতি প্রতি সেকেন্ডে দু'ফুট। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ একশো গজ বাকি থাকতে প্রোব দাঁড় করিয়ে ফেলল সে।

'গভীরতা?' জানতে চাইলেন শেফার্ড।

'উনিশ হাজার সাতশো ষাট ফুট,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'দৃষ্টিসীমা খুব ভাল, প্রায় দুশো ফুট পর্যন্ত।'

পানির প্রচণ্ড চাপে সী হর্সের গতি এক নটের সামান্য বেশি।

ক্যাপটেন শেফার্ড কমপিউটর স্ক্রীনে চোখ রেখে সী রবিনকে সারফেসের এমন জায়গায় নিয়ে এসে থামালেন, পোনে চার মাইল গভীরতায় ওয়াটার লিলি এখন সরাসরি ওটার নিচে।

'টার্গেট ডেড অ্যাহেড,' ঘোষণা করল মুরল্যান্ড।

ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত জাহাজটার অবশিষ্টাংশ মনিটরে ধরা পড়ছে। রানা বোতামে চাপ দিতেই ওয়াটার লিলির বো সেকশন প্রায় পুরোটাই আলোকিত হয়ে উঠল। 'ক্যামেরা ও টেপ, দুটোই চালু করলাম।'

এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে ওয়াটার লিলি পুরোপুরি খাড়া হয়ে বসে নেই, পঁচিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে বিশ্রাম নিচ্ছে পলির ভেতর–নিচের খোল প্রায় তলা পর্যন্ত বের করে।

খোলটা যেখানে ভেঙেছে সেখান থেকে দশ ফুট দূরে এইউভি-কে স্থির করাল মুরল্যান্ড।

'জুম,' নির্দেশ দিল রানা।

দোমড়ানো, ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো অংশটার ওপর ফোকাস করল ক্যামেরার লেন্স।

'হোল্ড ইট!' দ্রুত বলল রানা। 'ইন্টারেস্টিং তো!'

সী রবিনের একজন ক্রু বলল, 'এটা আগুনের কাজ নয়।'

'এই ভাঙচুরটা ভেতর থেকে করা হয়েছে,' বলল রানা। 'তৈরি ফাঁকটার কিনারাগুলো বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে।'

'একটা ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছিল?' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে প্রশ্ন করলেন শেফার্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন দাহ্য ফসিল ফুয়েলে চলে না।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল ও। 'ববি, খোল বরাবর নিয়ে চলো আমাদের, দেখতে চাই ওয়াটার লিলি মাঝখানে ঠিক কোথায় ভেঙেছে।'

আরও দুশো ফুট এগোবার পর দ্বিতীয় ফাঁকটার সামনে চলে এল সী হর্স, এটার আকার আরও বড়। এটাও ইঙ্গিত দিচ্ছে বিস্ফোরণ ভেতরেই ঘটেছিল, তাতে খোলের স্টীল প্লেট বাইরের দিকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

'ফাঁকের ভেতর এয়ার-কন্ডিশনিং ইকুইপমেন্টের হাউস ছিল,' বলল জিনা। 'ওখানে এমন কিছু থাকার কথা নয় যাতে এ-ধরনের কোন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

সী হর্সকে ওপরে তুলল মুরল্যান্ড। ওয়াটার লিলির বোট ডেক দেখতে পাচ্ছে ওরা। এখনও কিছু পোড়া লাইফবোট রয়ে গেছে এদিকে, বাকিগুলো ছিটকে পড়েছে কোথাও। জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খোলের অংশবিশেষের ওপর আলো ও ক্যামেরা তাক করা হলো। মোটা মোটা ভাঙা পাইপ, মোচড়ানো বীম, তোবড়ানো ও ফাটা ডেক প্লেইটিং চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, এটা যেন পুড়ে নিঃশেষিত একটা অয়েল রিফাইনারি। নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে তিনশো গজ এগোবার সময় দেখা গেল এদিকের তলায় ছড়িয়ে আছে সম্ভাব্য সব রকম আবর্জনা, বেশিরভাগই এমন পোড়া পুড়েছে যে চেনার উপায় নেই কোন্‌টা কি। শুধু ছড়ানো-ছিটানো সিরামিক-এর স্তূপগুলো টিকে গেছে।

'স্টার্ন কামিং আপ,' বলল মুরল্যান্ড। আবর্জনা ভর্তি মাঠ পিছিয়ে পড়ল মনিটরে, ডোবা ওয়াটার লিলির শেষ অংশটা এইউভি-র তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'একবারও ভাবিনি যে এটাকে আবার দেখতে পাব!' বিজ্ঞানীদের একজন, শেলী বারবি, বিড়বিড় করে বলল; এই জ্বলন্ত জাহাজ থেকে ক্রুদের সঙ্গে সে-ও দু'হাজার প্যাসেঞ্জারকে উদ্ধারে সাহায্য করেছে।

'ফরওয়ার্ড সেকশন, ববি,' বলল রানা। 'স্টার্ন যেখানে জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'

'কামিং অ্যারাউন্ড,' সাড়া দিয়ে বলল মুরল্যান্ড।

'নিচে নেমে পলির পাঁচ ফুট ওপরে রাখো সী হর্সকে,' বলল রানা। 'আমি তলাটা দেখতে চাই।'

মুরল্যান্ডের কমান্ড পেয়ে সী হর্স খাড়া হয়ে থাকা স্টার্নকে ঘিরে এগোল। অত্যন্ত সাবধানে, আবর্জনার ভেতর ও ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ওটাকে থামাল যেখানে জাহাজের স্টার্ন সেকশন ভেঙে গেছে। প্রকাণ্ড স্টীল হাল-এ পলি জমেনি। সবার চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ল, ভেঙে ও ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হবার জায়গাগুলো নিচের দিকে গুটিয়ে ও ভাঁজ খেয়ে আছে।

'সন্দেহ নেই, কাজটা এক্সপ্লোসিভ-এর,' মন্তব্য করল রানা।

'তলাটা যেন বিস্ফোরিত হয়ে খসে পড়ে,' বলল মুরল্যান্ড। 'বোধহয় সেজন্যেই প্রায় চোখের পলকে ডুবে যায় ওয়াটার লিলি।'

'এ থেকে প্রমাণিত হয় ওয়াটার লিলিতে আগুনটা কেউ ধরিয়েছিল, ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না। পোড়া জাহাজ যাতে কেউ পরীক্ষা করতে না পারে, তাই পরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়।'

'আ সাউন্ড থিওরি,' বলল হাইড্রোগ্রাফার মাইকেল কনকর্ড। 'কিন্তু নিরেট প্রমাণ কোথায়? আদালতকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করানো যাবে কি দিয়ে?'

রানা চিন্তিত, তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। 'সী হর্স তার কাজ ভালভাবেই শেষ করল, জানিয়ে দিল ওয়াটার লিলি নিজে থেকে ধ্বংস হয়নি, প্রকৃতির মারেও মরেনি। অপরাধীর পরিচয় ও ঠিকানা জানতে হলে গভীরে ডুব দিতে হবে আমাদের।'

'গভীরে ডুব দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, তার হাসি দেখে মনে হলো জবাবটাও সে জানে। 'কিভাবে?'

'তুমি আর আমি,' বলল রানা। 'ব্লু নেভিগেটর নিয়ে ওখানে নামছি। প্রমাণ সংগ্রহ করার এটাই একমাত্র উপায়।'

ফোর সিটার সাবমারসিবল ব্লু নেভিগেটরের নার্ভ সেন্টার হলো একটা গোলাকার টাইটেইনিয়াম অ্যালয় বল, ওই বলে পাইলট আর টেকনিশিয়ানরা বসে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম, বাইরে বসানো লাইটিং, ক্যামেরা ও একজোড়া রোবোটিক আর্ম বা যান্ত্রিক বাহু। বৃত্তাকার নার্ভ সেন্টারের চারধারে রয়েছে টিউব আকৃতির প্রেশার হাউজিং—অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি আর কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট জায়গা পেয়েছে ওখানে।

এই অভিযানে ব্লু নেভিগেটরে ওরা তিনজন রয়েছে। রানা ও মুরল্যান্ডের সঙ্গে জিনা ক্যারল যোগ দিয়েছে সাগরের গভীরতম তলদেশে মেরিন অরগানিজম স্টাডি করার সুযোগ পাবার আশায়। তাছাড়া, ডিজাইনটা খুঁটিয়ে দেখায় ওয়াটার লিলির কোথায় কি থাকার কথা ওদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভাল জানে।

দু'হাজার ফুট গভীরে নেমে আসার পর ওদের মনে হলো পৃথিবীর বাইরে এ সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে এসেছে। ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা মাছের গায়ে এত রকমের রঙ, সে-সব রঙের উজ্জ্বলতা এত বেশি, দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। শুঁড়সহ শরীরটা একশো বিশ ফুট লম্বা এমন জলজ প্রাণী যেমন আছে, তেমনি আছে টেনেটুনে এক ইঞ্চি লম্বা খুদে প্রাণ। জেলিফিশগুলো এত স্বচ্ছ, তাদের শরীরের ভেতর দিয়ে বহুদূর দৃষ্টি চলে। কোন কোন জেলিফিশের পেট

সংখ্যায় একশোরও বেশি। আবার একই সঙ্গে কয়েক ধরনের আলো জ্বালে এমন মাছও চোখে পড়ল।

পরবর্তী কয়েক হাজার ফুট নিচে নামার সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আর নোট প্যাডে খস খস করে কি সব লিখল জিনা, বিচিত্র প্রাণিজগৎ তাকে উত্তেজিত ও বিস্মিত করে তুলেছে।

'বটম কামিং আপ,' এক সময় ঘোষণা করল রানা, পাইলটের সিটে ও-ই বসে রয়েছে। মনিটরে চোখ রেখে ব্লু নেভিগেটরকে অপারেট করছে ও। তলা থেকে বিশ ফুট ওপরে স্থির হলো ওদের সাব।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

প্রায় চার মাইল ওপরে রয়েছেন ক্যাপটেন শেফার্ড, কমান্ড সেন্টার থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'তলায় পৌঁছেছি। দিক নির্দেশনা দরকার।'

'আপনি ওটাকে দু'শো গজ দক্ষিণ-পুবে পাবেন,' স্পীকফোনে ভেসে এল ক্যাপটেনের গলা। 'একশো চল্লিশ ডিগ্রি কোর্স ধরে এগোলে পিছনের অংশে পৌঁছাতে পারবেন, ওটা যেখানে ভেঙে গেছে।'

চোদ্দ মিনিট পর জাহাজের ভেঙে যাওয়া অংশটা জানালা দিয়ে দেখতে পেল ওরা। মনিটরে দেখে আসলে কিছুই বোঝা যায়নি, সামনে থেকে সরাসরি তাকিয়ে আগুনের সর্বনাশা কাণ্ড দেখে আঁতকে উঠতে হলো তিনজনকেই। এমন কোন আকৃতি নেই যেটা চেনা যাচ্ছে। এটা যে এক সময় একটা জাহাজ ছিল সেট বোঝা যাচ্ছে ওয়াটার লিলির খোলের আউটলাইন দেখে।

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওয়াটার লিলির ডেক প্ল্যানে আরেকবার চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় একট বৃত্ত আঁকল জিনা, তারপর সেটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

'আমরা ওয়াটার লিলির ভেতর ঢুকছি,' সী রবিনকে মেসেজ পাঠাল রানা।

স্পীকফোন থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না।

'অদ্ভুত,' বলল রানা। 'ওঁরা জবাব দিচ্ছেন না।'

মুরল্যান্ড বলল, 'সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের কাজটা শেষ করি আগে। বোঝাই তো যাচ্ছে যে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।'

তারপরও মিনিট দুয়েক চেষ্টা করল রানা। সারফেস থেকে সী রবিন ওর মেসেজের উত্তর দিচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকাল ও, অক্সিজেন গজ আর লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম চেক করল। তলায় আরও এক ঘণ্টা থাকতে পারবে ওরা। 'ভেতরে ঢুকছি,' সঙ্গীদের বলল ও।

জাহাজটার ভেতর এরই মধ্যে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী। এত গভীরেও প্রচুর চিংড়ি মাছ দেখে জিনি রীতিমত হাঁ হয়ে গেল। একটা মাছের পিছন দিকটা হুবহু যেন একটা ইঁদুর।

পোড়া, বিধ্বস্ত জাহাজের ভেতরটা দেখে ভয় লাগল। সামান্য স্রোত আছে, তবে রানার তাতে ব্লু নেভিগেটরকে সিধে বা স্থির রাখতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। ডেক ও বাল্কহেডের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, অন্ধকার থেকে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে।

‘ফোর্থ ডেকে ওঠো, রানা,’ বলল জিনা। ‘একটা শপিং মল হয়ে চ্যাপেলে পৌঁছাতে পারবে।’

থ্রাস্টার ব্যবহার করে ব্লু নেভিগেটরকে সাবধানে ওপরে তুলছে রানা। চতুর্থ ডেকে উঠল ওরা ঠিকই, কিন্তু দুজোড়া উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলোয় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখতে পেয়ে থামতে বাধ্য হলো। শত শত মোটা পাইপ গলে গেছে, ছিন্নভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং সহস্র শুঁড়ের মত ঝুলে আছে। চারদিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ধ্বংসকাণ্ডের ছবি নিচ্ছে মুরল্যান্ড।

‘এটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়,’ বিড়বিড় করল সে।

‘পাশ কাটাব না, ভেতর দিয়ে ঢুকব,’ বলল রানা। কাজটা করেও দেখাল ও। তাড়াহুড়ো না করে সাবধানে পাইপগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিল। ওগুলোর সঙ্গে ঘষা খেলো ব্লু নেভিগেটর, সঙ্গে সঙ্গে ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ল সব, আসলে পুড়ে ভঙ্গুর হয়ে আছে।

খোলা থ্রী-ডেক অ্যাভিনিউয়ের সুসজ্জিত বাটিক শপগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। পোড়া বাল্কহেডগুলো কোন রকমে চেনা যাচ্ছে শুধু।

‘এখানে দেখার কিছু নেই,’ ম্লান সুরে বলল মুরল্যান্ড।

‘চ্যাপেলটা দেখে যাই,’ বলল রানা।

‘এই জঞ্জালের মধ্যে চিনব কিভাবে?’ জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

জবাব দিল জিনা। ‘প্ল্যানের সঙ্গে মিলছে এমন কিছু কিছু জিনিস তো পাচ্ছি। আর ত্রিশ ফুট এগিয়ে থামো তো দেখি।’

তিন মিনিট পর আবার যেখানে থামল ব্লু নেভিগেটর, আশপাশে অসংখ্য স্তূপ হয়ে থাকা ভিজে ছাই ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। একটা পাথরের বেদি দেখা গেল, কালো হয়ে গেছে, একমাত্র এটা দেখেই ধারণা করা যায় জায়গাটা জাহাজের চ্যাপেল ছিল। ছাই ও আবর্জনার ভেতর মেকানিক্যাল বাহু ডুবিয়ে খুঁজছে রানা, যদি কিছু পায় এই আশায়। এর জন্যে কয়েকবার জায়গা বদলও করতে হলো। পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেল, কপালে ইন্টারেস্টিং কিছু জুটল না। তারপর রানার চোখে পড়ল তোবড়ানো ও মোচড় খাওয়া ডেকের একটা অংশে অদ্ভুতদর্শন কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। জিনিসটা দু'ইঞ্চি লম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া। কি কারণে কে জানে, ওটা পোড়েনি। পোড়েনি মানে, জিনিসটা মসৃণ ও সুডৌল লাগছে। ওটার রঙও ভারি অদ্ভুত বলতে হবে। কালো নয়, নয় ছাই রঙা, বরং বলা যায় হালকা সবুজ।

‘সময় শেষ হয়ে আসছে,’ সাবধান করে দিল মুরল্যান্ড। ‘সারফেসে নিরাপদে পৌঁছাবার মত যথেষ্ট রিজার্ভ অক্সিজেন নেই আমাদের।’

‘যা খুঁজছিলাম তা বোধহয় পেয়ে গেছি,’ বলল রানা। ‘আর পাঁচ মিনিট লাগবে।’

ছাইয়ের ভেতর অর্ধেক ডুবে থাকা অদ্ভুত আকৃতির জিনিসটা যান্ত্রিক বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে, সাবধানে বের করা হলো। এখন ওটা ওপরে তোলা হচ্ছে, ফেলা হলো আর্টিফ্যাক্ট বাস্কেটে।

‘চলো হে, ফিরি এবার!’ তাগাদা দিল মুরল্যান্ড।

সাবমারসিবলকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিল রানা, তারপর শপিং অ্যাভিনিউ এরিয়ার দিকে তাক করল।

ওয়াটার লিলির পোড়া কঙ্কাল থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে ওঠার সময় আবার মাদারশিপ সী রবিনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। কোন সাড়া না পাওয়ায় ওর চোখ দুটোয় পলক পড়ছে না। কিছুক্ষণ এটা-সেটা পরীক্ষা করল ও, তারপর বলল, 'কমিউনিকেশন কাজ না করার কোন কারণ দেখছি না আমি। সিস্টেমটার এদিকে অন্তত কোন ত্রুটি নেই। আর ওপরে ওদের ইকুইপমেন্ট এত ভাল যে এ-ধরনের সমস্যা হবার কথা নয়, হলেও মেরামত করা খুব সহজ।'

'কত জায়গায় কত বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, এটা হয়তো সেরকম একটা,' কৌতুক করে বলল মুরল্যান্ড।

'আমিও এটাকে সিরিয়াস কোন সমস্যা বলে মনে করছি না,' বলল জিনা।

কথা না বলে একটু পর পরই সী রবিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে গেল রানা। ইমার্জেন্সির সময় লাগতে পারে ভেবে ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে বাইরের সমস্ত আলো আর সব ক'টা ক্যামেরা বন্ধ করে দিল ও। এরপর পাইলটের আসন মুরল্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে তার সিটে বসে চোখ বুজে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করল।

তিন ঘণ্টা পর গভীর কালো পানি ধীরে ধীরে রঙ বদলে গভীর নীল হয়ে উঠল আবার। ওভারহেড ভিউ পোর্ট দিয়ে সাগরের অশান্ত সারফেস দেখতে পেল ওরা, ঝলমল ও চিক চিক করছে। এরপর এক মিনিটও লাগল না, ব্লু নেভিগেটর সারফেস ভেঙে পানির ওপর মাথা তুলল। দেখে সবাই খুশি হলো ঢেউগুলো আসছে মাত্র দুই কি আড়াই ফুট উঁচু হয়ে। সাবমারসিবলের বেশির ভাগটাই সারফেস থেকে কয়েক ফুট নিচে ডুবে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় খুব একটা ঝাঁকি খাচ্ছে না, তেমনি দোলও খাচ্ছে না।

সার্ভে-শিপ সী রবিনের সঙ্গে এখনও কোন যোগাযোগ নেই ওদের। জাহাজটাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, কারণ ওদের সবগুলো ভিউ পোর্ট পানির নিচে রয়েছে, সাব-এর ক্রুরা শুধু ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। টপ পোর্ট থেকে দিগন্ত বরাবর কিছু দেখার কোন সুযোগ নেই। ডাইভারদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, তারা এসে লিফটিং কেইবল আটকাবে ব্লু নেভিগেটরে। কিন্তু দশ মিনিট পরও তাদের কাউকে আসতে দেখা গেল না। প্ল্যান মত কিছুই ঘটছে না।

'এটা কেমন কথা?' রানা যতটা না বিরক্ত তারচেয়ে বেশি চিন্তিত। 'কোন যোগাযোগ তো নেইই, ডাইভিং টীমও পাঠাচ্ছে না। সবাই কি একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল?'

'সী রবিন হয়তো ডুবে গেছে,' হাই তোলার সময় কৌতুক করল মুরল্যান্ড।

'এরকম অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!' জিনার কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার।

তার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো না, এরকম শান্ত সাগরে সী রবিনের ডোবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'ঢেউ যখন আমাদের টপ ছুঁতে পারছে না, হ্যাচ খুলে চারদিকটা দেখি না কেন?'

'ভাল প্রস্তাব,' বলল জিনা। 'পুরুষদের গায়ের গন্ধে শ্বাস কষ্টে ভুগছি আমি।'

'কথাটা তুমি আগে বলবে তো,' নরম, আদরের সুরে বলল মুরল্যান্ড। নতুন একটা কার অডর স্প্রে-র বোতল উঁচু করে দেখাল সে। বোতামে চাপ দিতে ব্লু নেভিগেটরের ভেতরটা কুয়াশার মত ঝাপসা হয়ে গেল। 'নোংরা বাতাস–দূর হ! দূর হ!'

হেসে উঠে সরু টানেলের ভেতর দাঁড়াল রানা, তারপর হ্যাচের ঢাকনিটা ঠেলে খুলে ফেলল। হ্যাচের ওপর মাথা তুলে প্রথমে তাজা বাতাসে বুক ভরে নিল ও, তারপর সার্ভে শিপ সী রবিন ও ডাইভ রিকভারি টীম সহ ছোট বোটগুলোর খোঁজে চারদিকে তাকাল। ওর চোখ ধীরে ধীরে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গোটা দিগন্ত চষে ফেলল।

যে আবেগ ও অবিশ্বাসের প্রবল ঝড় বয়ে গেল রানার দেহ-মন জুড়ে তার বর্ণনা দেয়া এক কথায় অসম্ভব। স্তম্ভিত বিষয়ে ওর সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে।

সাগর খালি। সী রবিন গায়েব। জাহাজটার যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না কোন কালে।

নয়

ব্লু নেভিগেটর সাগরের তলায় পৌঁছানোর একটু পরই সী রবিনে এল ওরা। ক্রুরা সবাই যে-যার রুটিন ডিউটি করছে, সায়ান্টিফিক টীম রানা ও মুরল্যান্ডের ইনভেস্টিগেশন মনিটরিং করছে কমান্ড সেন্টারে বসে। হাইজ্যাকিঙের ঘটনাটা এত দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে চোখের সামনে সব দেখেও সী রবিনের কেউ ব্যাপারটা ধরতেই পারল না।

ক্যাপটেন শেফার্ড নিজের চেয়ারে বসে আছেন, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে তাকিয়ে আছেন মনিটরে; পাশে দাঁড়িয়ে ডাফ টিমোথি রেডার ইকুইপমেন্টে চোখ বুলাবার সময় স্ক্রীনে দেখতে পেল দ্রুতগামী একটা ব্লিপ।

'দক্ষিণ-পুব থেকে আমাদের দিকে কিছু আসছে,' জানাল সে।

মনিটরের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে শেফার্ড বললেন, 'সম্ভবত একটা যুদ্ধজাহাজ। কমার্শিয়াল শিপিং লাইন থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে রয়েছি আমরা।'

'যুদ্ধ জাহাজ? এদিকে?' টিমোথি বিস্মিত।

'প্রথমে বলে নিই, বাপের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে বুশ ভায়া যা শুরু করেছেন, তা যারা সমর্থন করে না আমি তাদের দলে,' বললেন শেফার্ড। 'ইরাক আক্রমণ করা স্রেফ গোয়ার্তুমি আর অযৌক্তিক। কে জানে, হয়তো বঙ্গোপসাগরেও যুদ্ধ জাহাজ পাঠাচ্ছে পেন্টাগন। ওদের মতিগতি বোঝা সত্যি কঠিন।'

'তবে, ক্যাপটেন, এটাকে আমার যুদ্ধজাহাজ বলে মনে হচ্ছে না,' বলল টিমোথি। 'স্পীড খুব বেশি, আসছেও সোজা আমাদের দিকে।'

ক্যাপটেনের ভুরু উঁচু হলো। আর কোন কথা না বলে একজোড়া

বিনকিউলার তুলে নিয়ে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলেন। সেভেন-বাই-ফিফটি লেন্স-এর সাহায্যে দূরে উজ্জ্বল কমলা ও সাদা রঙের বোটটাকে আকারে বড় হতে দেখলেন, এ-ও দেখলেন যে ওটা সরাসরি সী রবিনের দিকেই আসছে। মন থেকে সংশয় ও উৎকণ্ঠা দূর হলো। ছুটে আসা বোটটাকে কোন বিপদ বা হুমকি বলে মনে হচ্ছে না।

'কি বুঝছেন, ক্যাপটেন?' টিমোথি অস্বস্তি বোধ করছে।

'একটা অয়েল কোম্পানির ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট, বড় মাপের,' জানালেন শেফার্ড। 'বো-র দু'দিকে পানি কি রকম উড়ছে দেখছ? স্পীড সত্যি বেশি। অন্তত ত্রিশ নটের কম নয়।'

'ভাবছি ওটা এল কোত্থেকে? হাজার মাইলের মধ্যে কোন অয়েল রিগ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আমি বরং জানতে চাই, আমাদের কাছে কি কারণে আসছে।'

'খোলে কোন নাম বা কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন আছে?'

'আশ্চর্য,' ধীরে ধীরে বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'বো-তে লেখা নাম আর কোম্পানির প্রতীক যেখানে থাকার কথা সেই জায়গাগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে।'

ব্রিজ উইং-এ এবার রেডিও অপারেটরও বেরিয়ে এল। 'ফোনে অয়েল কোম্পানির স্কিপারকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি, ক্যাপটেন।'

একটা ওয়াটারটাইট বক্স খুলে ব্রিজ উইং স্পীকার-এর সুইচ অন করলেন শেফার্ড। 'নুমা শিপ সী রবিনের ক্যাপটেন শেফার্ড। বলুন।'

'গ্লোবাল অয়েল কোম্পানির বোট সান্তা মারিয়া থেকে ক্যাপটেন নক্স। আপনাদের জাহাজে কোন ডাক্তার আছেন?'

'অবশ্যই। আপনাদের সমস্যাটা কি?'

'গুরুতর জখম এক লোক।'

'পাশে চলে আসুন, আমাদের জাহাজের ডাক্তারকে পাঠাচ্ছি।'

'তারচেয়ে ভাল হয় আমরা যদি রোগীকে আপনাদের জাহাজে তুলে দিই। আমাদের এখানে না আছে মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, না আছে সাপ্লাই।'

টিমোথির দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'শুনলে?'

'খুবই অদ্ভুত,' মন্তব্য করল টিমোথি।

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন শেফার্ড। 'ওঅর্ক বোটে ডাক্তার না থাকাটা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাই বলে কোন মেডিকেল সাপ্লাইও থাকবে না? ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়।'

কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে পা বাড়াল টিমোথি। 'স্ট্রেচার ধরার জন্যে একজন ক্রুকে দাঁড় করিয়ে রাখি।'

সার্ভে শিপ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থামল ওঅর্ক বোট। কয়েক মিনিট পর পানিতে একটা লঞ্চ নামানো হলো। লঞ্চের সীটগুলোয় শোয়ানো হয়েছে কম্বল ঢাকা আহত লোকটাকে। তার সঙ্গে চারজন লোক রয়েছে। একটু পরই দেখা গেল সী রবিনের খোলের পাশে ঢেউয়ের সঙ্গে উঁচু-নিচু হচ্ছে লঞ্চটা। অপ্রত্যাশিতভাবে লঞ্চের তিনজন লোক লাফ দিয়ে সী রবিনে চলে এল, আহত

লোকটাকে ওঅর্ক ডেকে নিয়ে আসতে সাহায্য করছে, এক রকম ধাক্কা দিয়েই সী রবিনের ক্রুকে সরিয়ে দিল।

অকস্মাৎ লোকগুলো এক ঝটকায় কম্বলগুলো সরিয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল লুকিয়ে রাখা অটোমেটিক উইপন। সেগুলো সী হর্সের ক্রুর দিকে তাক করল তারা। শুয়ে থাকা লোকটা লাফ দিয়ে সিধে হলো, হাতে নিল এক সঙ্গীর বাড়িয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র, তারপর স্টারবোর্ড সিঁড়ির দিকে ছুটল, ধাপ বেয়ে ব্রিজে উঠে যাবে।

দেরিতে হলেও ক্যাপটেন শেফার্ড ও হেলমস্‌ম্যান টিমোথি বুঝতে পারল সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে। এটা যদি কমার্শিয়াল শিপ বা প্রাইভেট ইয়ট হত, ছুটে গান লকারের কাছে গিয়ে ক্রুদের মধ্যে অস্ত্র বিলি করতেন ক্যাপটেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন সার্ভে শিপে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারবে না। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই কারও করার নেই।

হাইজ্যাকারদের দেখে বোম্বেটে অর্থাৎ জলদস্যু বলে মনে হচ্ছে না। ব্রিজে যে লোকটা ঢুকল তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা বললে অবিশ্বাস করা কঠিন। মুখের রঙ গাঢ়, চুলে অকালে পাক ধরেছে। যথেষ্ট লম্বা, কোমরের চেয়ে পেট একটু বড়। গলফ শার্ট আর বারমুডা শর্টস-এ দারুণ স্মার্ট লাগছে তাকে। চেহারায় কর্তৃত্বের ভাবটুকু শুধু যে স্পষ্ট তা নয়, মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমীহ জাগিয়ে তোলে। অনেকটা যেন সৌজন্য দেখিয়েই সে তার অটোমেটিক রাইফেল ক্যাপটেন বা টিমোথির দিকে তাক করল না, ব্যারেল খাড়া করে রেখেছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেটে গেল। দু'জনের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে সে। অবশেষে টিমোথিকে অগ্রাহ্য করে ক্যাপটেন শেফার্ডের দিকে ফিরল। 'ক্যাপটেন শেফার্ড, ধরে নিচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি?'

'আমার নামের কোন তাৎপর্য নেই,' লোকটার গলার আওয়াজটা এমন, যেন আগুনে পানি ছিটানোয় ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে শব্দ হচ্ছে। 'আশা করি আপনি কোন বাধা দেবেন না।'

'জানতে পারি আমার জাহাজে কি করছ তুমি?'

'বলতে পারেন সী রবিনকে আমরা বাজেয়াপ্ত করলাম,' বলল লোকটা। 'কিংবা মনে করুন এটাকে আমরা দখল করে নিয়েছি। তবে নিশ্চিত থাকুন, কাউকে আঘাত করা হবে না।'

ক্যাপটেনের চোখ-মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ভাব এখনও স্পষ্ট। বললেন, 'এই জাহাজ মার্কিন সরকারের সম্পত্তি। পৃথিবীর কারও অধিকার নেই এটাকে দখল করবে।'

'কেন, শোনেননি, জোর যার ইরাক তার?' লোকটা হাসল, তারপর ইঙ্গিতে হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা দেখাল। 'এই অস্ত্রই আমাদেরকে অধিকার আর ক্ষমতা এনে দিয়েছে।'

সে ব্রিজে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, ওদিকে তার তিন সঙ্গী সার্ভে শিপের ক্রুদের এক জায়গায় জড়ো করছে। লঞ্চটা ফিরে গিয়ে আরও দশজন সশস্ত্র লোককে

নিয়ে এসেছে, এখন তারা সী রবিনের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

'তোমাদের এই ব্যাপারটা পাগলামিকেও হার মানায়,' মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'এটা একটা সার্ভে শিপ। এখানে তোমরা সোনাও পাবে না, ডলারও পাবে না। তাহলে কিসের আশায়...'

কালো লোকটা গম্ভীর। 'সে-সব বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। বুঝে কোন লাভও হবে না।'

সশস্ত্র একজন হাইজ্যাকারকে আসতে দেখা গেল। 'সার, জাহাজ এখন সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ক্রু আর বিজ্ঞানীদের ডাইনিং এরিয়ায় জড়ো করা হয়েছে।'

'এঞ্জিন রূম?'

'আপনার হুকুমের অপেক্ষায়।'

'গুড। তাহলে রওনা হবার প্রস্তুতি নাও। আমি ফুল স্পীড চাই।'

'স্পীড তুলে পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই,' এই প্রথম মুখ খুলল টিমোথি। 'সী রবিনের স্পীড দশ নটের বেশি তোলা যায় না।'

হাইজ্যাকার হেসে উঠল। 'দশ নট? আপনি নিজের জাহাজকে অসম্মান করছেন, সার। যেভাবেই হোক আমি জানি, ওয়াটার লিলিকে উদ্ধার করার জন্যে বিশ নট স্পীডে ছুটে গিয়েছিল সী রবিন। তবে বিশ নটও কম স্পীড।' ইঙ্গিতে বো-র দিকটা দেখাল সে। ওদিকে সার্ভে শিপকে টো করার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট এক পজিশনে আসার চেষ্টা করছে ওঅর্ক বোট। 'আমরা ছাড়া কেউ যেন শুনতে না পায়,' ফিসফিস করল লোকটা। 'আমাদের উচিত পঁচিশ নট স্পীড তোলা।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের?' জানতে চাইল টিমোথি, আগে কখনও তাকে এত রাগতে দেখেননি শেফার্ড।

'সেটা আপনাদের কোন মাথাব্যথা নয়,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল লোকটা। 'আপনি কথা দিচ্ছেন তো, ক্যাপটেন, আপনি বা আপনার লোকজন আমাদের কোন কাজে বাধা দেবেন না? আমার প্রতিটি নির্দেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলবেন?'

'তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে,' ম্লান সুরে জবাব দিলেন শেফার্ড। 'কিচেন নাইফ ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নেই।'

ওরা কথা বলছে, তারই মধ্যে টো রোপ জাহাজে তুলে ফরওয়ার্ড বোলার্ড-এর গায়ে আটকে দেয়া হয়েছে। অকস্মাৎ ক্যাপটেন শেফার্ডের চোখে নগ্ন আতংক ফুটে উঠল। 'এই জায়গা ছেড়ে কোথাও আমরা যেতে পারি না! অন্তত এখুনি তো নয়ই!'

হাইজ্যাকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, 'আপনি এরইমধ্যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন।'

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো,' জরুরী তাগাদার সুরে বলল টিমোথি। 'আমাদের একটা সাবমারসিবল রয়েছে সাগরের তলায়। তাতে দুই ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা আছেন। ওদেরকে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'দুঃখজনক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দস্যু লোকটা। 'নিজেদের চেষ্টায়

তীরে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে।'

'অসম্ভব। তা তাঁরা পারবেন না। এভাবে ফেলে যাবার অর্থ হবে তাঁদের খুন করা।'

'কেন, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই?'

'ছোট একটা পোর্টেবল রেডিও আর একটা আন্ডারওয়াটার ফোন আছে শুধু,' ব্যাখ্যা করল টিমোথি। 'দু'মাইলের মধ্যে থাকলে তবেই অন্য কোন ভেসেল বা এয়ারক্রাফটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ওঁরা।'

'গুড লর্ড, ম্যান,' আবেদন জানালেন ক্যাপটেন শেফার্ড। 'সারফেসে ফিরে এসে যখন দেখবেন আমরা চলে গেছি, ওদের মাথায় সত্যি বাজ পড়বে, কারণ এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশাই নেই।'

'সেটা আমার কোন সমস্যা নয়।'

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পা এগোলেন শেফার্ড, কিন্তু লোকটা দ্রুত রাইফেল তুলে তাঁর বুকে ঠেকাতে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। 'আমার সঙ্গে লাগতে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ক্যাপটেন।'

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিগ্রো লোকটার দিকে পিছন ফিরলেন শেফার্ড। শরীরের দু'পাশে ঝুলে থাকা হাতের মুঠো বারবার খুলছেন আর বন্ধ করছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সাগরের যেখানটায় শেষবার দেখেছেন ব্লু নেভিগেটরকে। 'ওঁরা যদি মারা যান, খোদা যেন তোমাদের ভাল করেন,' এমন সুরে বললেন, তা দিয়ে যেন ইস্পাতও কাটা যাবে। 'কারণ অবশ্যই এর বদলা নেয়া হবে।'

'আমার সঙ্গে যদি কেউ লাগতে আসে, তাদের সঙ্গে আপনারা অন্তত থাকবেন না,' হেসে উঠে বলল লোকটা। 'এই, এদেরকে ডাইনিং হলে নিয়ে যাও।'

ব্লু নেভিগেটর পানির ওপর ফিরে আসার অনেক আগেই দিগন্ত পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সী রবিন।

নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিজের ডেস্কে বসে কাজ করছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ অফিসে ঢুকলেন। রেডক্লিফ হাসিখুশি, মিষ্টভাষী ভদ্রলোক; চোখে হর্ন-রিমড্ গ্লাস পরেন। খুক্ করে কেশে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে অ্যাডমিরালকে সচেতন করতে চাইলেন তিনি, তারপর বললেন, 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল, আমরা সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছি।'

'আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, মুখ না তুলেই। 'কোনও প্রজেক্টে বাজেটের চেয়ে বেশি খরচ পড়ে যাচ্ছে?'

'আরও অনেক বড় দুঃসংবাদ, অ্যাডমিরাল।'

এবার ফাইল থেকে মুখ তুললেন হ্যামিলটন। 'কি?'

'সী রবিন সবাইকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

কোন বিস্ময় দেখা গেল না। চোখে-মুখে কোন প্রশ্ন নেই। বিড়বিড় করে 'নিখোঁজ' শব্দটা পুনরাবৃত্তিও করলেন না। শান্ত হয়ে বসে থাকলেন, রেডক্লিফ

আরও কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'আমাদের রেডিও আর স্যাটেলাইট ফোন ইনকোয়্যারি কোন সাড়াই পাচ্ছে না–' শুরু করলেন রেডক্লিফ।

'কমিউনিকেশন ব্রেকডাউনের একশো একটা কারণ থাকতে পারে,' বাধা দিয়ে বললেন হ্যামিলটন।

'কিন্তু ব্যাকআপ সিস্টেমস?' রেডক্লিফও শান্ত। 'সবগুলো তো আর সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে না।'

'শেষ কখন সাড়া পাওয়া গেছে?'

'দশ ঘণ্টা আগে,' বলে নিজেকে শক্ত করলেন রেডক্লিফ, জানেন একটা ঝড় আসছে।

'দশ ঘণ্টা!' এবার ঠিকই বিস্ফোরিত হলেন নুমা ডিরেক্টর। 'অথচ আমার নির্দেশ দেয়া আছে সমস্ত সার্ভে ও রিসার্চ শিপকে দু'ঘণ্টা পর পর আমাদের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠাতে হবে।'

'আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। সী রবিন শেডিউল ধরে নিয়মিতই রিপোর্ট পাঠিয়েছে।'

'আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন!'

'নিজেকে ক্যাপটেন শেফার্ড বলে দু'ঘণ্টা পর পর ওয়াটার লিলির ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট পাঠিয়েছে এক লোক। পরে আমরা জানতে পারি লোকটা ক্যাপটেন শেফার্ড নয়, কারণ ভয়েস সিস্টেম রেকর্ডিং-এ তার ভয়েস প্যাটার্ন মিলছিল না। কেউ একজন নিজেকে ক্যাপটেন শেফার্ড বলে চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।'

'কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে জাহাজটা সবাইকে নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট আমাকে সতর্ক করার পর ন্যাশন্যাল ওশনোগ্রাফিক অ্যাটমাসফেরিক এজেন্সিতে ফোন করি আমি। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে। তাকে অনুরোধ করি সী রবিন যেখানে কাজ করছিল সেই এলাকার স্যাটেলাইট ওয়েদার ফটো যেন খুঁটিয়ে দেখে। ফটো এনলার্জমেন্ট করে কোন লাভ হয়নি। একশো মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ নেই।'

'আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম?'

'শান্ত সাগর। আকাশ নীল। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় দশ মাইল।' রেডক্লিফকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

অ্যাডমিরাল চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন। 'কোন কারণ ছাড়া জাহাজটা ডুবে যেতে পারে না। ওটায় এমন কোন রাসায়নিক পদার্থও নেই যে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেন বিস্ফোরিত হবে! অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ?'

'নিয়মিত শিপিং লেইনগুলোর বাইরে ছিল ওটা। কাছাকাছি অন্য কোন জাহাজ ছিল না।'

'অন্য কোন গলা থেকে আপ-টু-ডেট রিপোর্ট এসেছে,' রেডক্লিফের সামনে

পায়চারি থামিয়ে বললেন হ্যামিলটন, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'আপনার কি ধারণা, জর্জ, সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে?'

'দেখে-শুনে এখন তাই তো মনে হচ্ছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'স্যাটেলাইটে বসানো ওয়েদার ক্যামেরা ওই এরিয়ার ছবি তোলার আগেই হাইজ্যাকাররা সী রবিনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'কিন্তু হাইজ্যাক করা হলে কোথায় ওটাকে নিয়ে যাওয়া হবে? দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে কিভাবে ওটা গায়েব হয়? লাস্ট স্ট্যাটাস রিপোর্ট যেখান থেকে পাঠিয়েছে সেখান থেকে ওই সময়ের ভেতর দেড়শো নটিকেল মাইলের বেশি যাওয়া সম্ভব নয়।'

'ভুলটা আমার,' বললেন রেডক্লিফ। 'ক্যামেরা রেঞ্জ বাড়াবার অনুরোধ করা উচিত ছিল। তবে বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলি ভয়েস প্যাটার্ন মিলছে না এ-কথা জানার আগে। তাছাড়া, তখন হাইজ্যাকিং-এর কথা ভুলেও ভাবিনি।'

চেয়ারে ফিরে এসে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন অ্যাডমিরাল। তারপর হাত নামিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। 'আপনি কি জানেন, রানা আর মুরল্যান্ড সী রবিনে ছিল, নাকি ব্লু নেভিগেটরে?'

'আমাদের ক্যাপটেনের শেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ব্লু নেভিগেটর নিয়ে সাগরের তলায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।'

'দিস ইজ ম্যাডনেস!' প্রায় গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'কার এত সাহস, হলো যে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা জাহাজ হাইজ্যাক করবে? অন্তত ওদিকটায় তো কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতি নেই, তাই না? আল-কায়েদার কোন তৎপরতার কথা আমি অন্তত শুনিনি। তাহলে এটা কাদের কাজ? তাদের মোটিভ কি?'

'আমিও আপনার মত অন্ধকারে, সার।'

'বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'আমি নিজে কথা বলেছি আপনার বন্ধুর সঙ্গে। জেনারেল খান বলেছেন, তিনি তাঁদের নৌ-বাহিনীকে ওই এলাকায় সার্চ করতে অনুরোধ করবেন।'

'এদিক থেকেও যা-যা করার সব করুন,' নির্দেশ দিলেন নুমা চীফ। 'সী রবিন ওদিকেই কোথাও আছে। ওরা ডুবে গেছে, এ আমি মানতে রাজি নই।'

সাগরের খাঁ-খাঁ আদিগন্ত শূন্যতায় সী রবিন হারিয়ে গেছে, এটা মেনে নেয়ার পর রানার পরামর্শ অনুসারে সাবমারসিবলের ছোট্ট পরিসরের ভেতর নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে মনোযোগী হলো ওরা।

চারদিকে কোন ভেলাকে ভাসতে দেখা যায়নি, সাগরের সারফেসে তেলের আস্তরণও পড়েনি। অবশ্য মনে মনে হাল ছাড়তে রাজি হয়নি কেউ, ভেবেছে জরুরী কোন কারণে সী রবিন চলে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে আবার।

কিন্তু রাত নামল এবং কেটেও গেল। সূর্য আরও দু'বার উঠল ও ডুবল। না, তারপরও মাদারশিপের কোন দেখা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সীমাহীন দিগন্তে চোখ

বুলানো চলছে। কোন জাহাজ বা এমনকি উড়ন্ত কোন জেটলাইনারও চোখে পড়ল না। জিপিএস দেখে জানা গেল ভারত মহাসাগরের আরও অনেক গভীর এলাকায় সরে যাচ্ছে ওদের ব্লু নেভিগেটর। সাগরের এত গভীরে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ।

নিজেদের ওরা বোকা বানাচ্ছে না। যদি কোন জাহাজ একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়ে শুধু তাহলেই খুদে সাবমারসিবল ব্লু নেভিগেটরের আরও খুদে হ্যাচ দেখতে পাবে। ওদের হোমিং বীকন বিশ মাইল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু এটার সিগন্যাল এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে শুধু সী রবিনের কমপিউটরই রিসিভ করতে পারবে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোন জাহাজ বা প্লেনের এই সিগন্যাল ধরতে পারার কথা নয়। ওদের একমাত্র আশা, যদি কোন রেসকিউ ভেসেল ওদের রেডিওর দু'মাইল রেঞ্জের মধ্যে চলে আসে।

সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন পানি। ভাগ্য ভাল যে খানিক পর পর ছোট আকারের কিছু মেঘ শুধু যেন ওদেরকে সাপ্লাই দেয়ার জন্যেই বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল। মেঝেতে বিছানো ছিল একটা প্লাস্টিক কাভার, সেটা তুলে হ্যাচের ওপর মেলা হলো, বৃষ্টির পানি ওখান থেকে গড়িয়ে বোতলে পড়তে লাগল। স্যান্ডউইচ শেষ হয়ে যেতে মাছ ধরা শুরু করল ওরা। ইমার্জেন্সি রিপেয়ারিং-এ কাজে লাগবে, এরকম কিছু টুলস আছে একটা বাক্সে, সেগুলোর সাহায্যে কয়েকটা বড়শি বানাল রানা। পরিত্যক্ত খাদ্যকণা কাজে লাগিয়ে টোপ তৈরি করল জিনা। ফিশিংলাইন হিসেবে ইলেকট্রিক তার যোগান দিল মুরল্যান্ড। একটার ওপর ভরসা নেই, তিনটে লাইন ফেলা হলো পানিতে। একটু পরই সাগর থেকে তিনটে ছোট মাছ উপহার পাওয়া গেল। জিনা দেখে ফ্রিগেট ম্যাকরল বলে সনাক্ত করল। দ্রুত কেটে নতুন টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হলো ওগুলোকে। দশ ঘণ্টার মধ্যে ছোট মাছের ভাল একটা স্টক তৈরি হলো, দক্ষ হাতে কেটে-বেছে পরিষ্কার করে ফেলল জিনা। জাপানি স্টাইলে কাঁচাই খেতে হলো, তেমন স্বাদ পাওয়া না গেলেও পুষ্টির চাহিদা মিটছে বলে কেউ কোন অভিযোগ করল না।

সী রবিনের অবস্থান নিয়ে সীমাহীন জল্পনাকল্পনা শেষে একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে প্রসঙ্গ পাল্টে দর্শন থেকে শুরু করে সামুদ্রিক খাদ্য পর্যন্ত হেন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ওরা আলোচনা করল না।

ওয়াটার লিলির ধ্বংসাবশেষ থেকে যে জিনিসটা উদ্ধার করা হয়েছে, সারফেসে ওঠার খানিক পর বাস্কেট থেকে তুলে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা হয়েছে সেটা। হাতে যেহেতু সময়ের কোন অভাব নেই, জিনিসটার কেমিকেল কমপজিশন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করল ওরা।

'ভেসে কত দূর এলাম আমরা?' এবার নিয়ে সম্ভবত একশোবার জানতে চাইল জিনা।

'প্রায় বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, কাল এই সময়ের পর থেকে,' জবাব দিল রানা।

'এই হিসেবে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে কয়েক বছর লাগতে পারে, তাই না?'

'কেন, সোজা দক্ষিণে এগোলে দক্ষিণ মেরুতেও তো পৌঁছানো যায়।' হেসে উঠল মুরল্যান্ড।

'ওখানে আমি গেছি,' বলল রানা। 'এক জায়গায় দু'বার যেতে চাই না।'

'তোমার এই আপত্তির কথা বাতাস আর স্রোতকে জানিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'মেঝের প্লাস্টিক শিট দিয়ে আমরা কিন্তু অনায়াসে একটা পাল তুলতে পারি,' জিনা প্রস্তাব দিল।

'নব্বুই শতাংশ পানির নিচে, এই সাবমারসিবল বাতাস পেয়ে ছুটবে বলে মনে হয় না।'

'ভাবছি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমাদের এই অবস্থার কথা জানেন কিনা,' বিড়-বিড় করল জিনা।

'আমি যতটুকু চিনি তাঁকে,' বলল রানা, 'বাজি ধরে বলতে পারি, এরইমধ্যে সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ অপারেশন শুরু করে দিয়েছেন।'

চোখ বুজে একটা চীনা রেস্তোরাঁর টেবিলে সাজানো ডিনার কল্পনা করছে মুরল্যান্ড, বলল, 'কেউ যদি বলতে পারে সী রবিন এখন কোথায় তাকে আমি এক বছরের বেতন দিয়ে দেব।'

'এই রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না,' বলল রানা। 'আমরা আগে সাগর থেকে উদ্ধার পাই, তার আগে পর্যন্ত কোন ক্লু পাওয়া যাবে না।'

চতুর্থ সকালের আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা দেখল ওরা। তবে রুটিন সেই একই। বৃষ্টি হলে পানি ধরো। প্রয়োজন হলে মাছ মারো। চোখ রাখো দিগন্তে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে না, উন্নতিও নেই। পালাবদলে ডিউটি দিচ্ছে, প্রত্যেকে দু'ঘণ্টা করে। সাবমারসিবলের হ্যাচ টাওয়ার পানির সারফেস থেকে মাত্র চার ফুট উঁচু, ফলে যে ডিউটিতে থাকছে তাকে সাধারণত ভিজতে হচ্ছে, কারণ দু'ঘণ্টার মধ্যে বেশ কিছু ঢেউ টপ রিম-এর ওপর আছড়ে পড়ে।

জিনার ডিউটির সময় সাবমারসিবলের এক মাইল দূর দিয়ে একটা এয়ারক্রাফট উড়ে গেল। উন্মত্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়েও কোন লাভ হলো না; নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্লাস্টিক শিটটা দোলাতে শুরু করল সে, কিন্তু ততক্ষণে প্লেনটা আরও অনেক দূরে চলে গেছে। 'ওটা একটা রেসকিউ প্লেন ছিল,' চেঁচিয়ে উঠল সে, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। 'প্রায় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল অথচ দেখতে পেল না!'

'এটা কারও চোখে পড়া খুব কঠিন,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল রানা।

ওকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'পাঁচশো ফুটের বেশি ওপর থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আমাদের হ্যাচ টাওয়ার খুবই ছোট, আকাশ থেকে দেখলে গোলাবাড়ির দরজায় একটা মাছির মত।'

'কিংবা স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে পড়ে থাকা মটরশুঁটির দানা,' বলল রানা।

'তাহলে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা, ধৈর্য ও বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছে।

অভয় দিয়ে হাসল রানা, কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'ল অভ অ্যাভারেজ। আমাদেরকে খুঁজে পেতে বাধ্য ওরা।'

'তাছাড়া,' মাঝখান থেকে আবারও মন্তব্য করল মুরল্যান্ড, 'আমরা ভাগ্যবান। তাই না, দোস্ত?'

'যত বেশি হওয়া সম্ভব।'

ভেজা ভেজা চোখ দুটো মুছল জিনা, নিজের ব্লাউজ আর শর্টস টেনেটুনে সোজা করল, একটা হাত চালাল চুলে। 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। যতটা মনে করেছিলাম ততটা শক্ত আসলে নই আমি।'

পরবর্তী দু'দিন হাসিখুশি ভাবটা ধরে রাখার জন্যে যে যার নিজের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ করল ওরা। ওপর দিয়ে আরও তিনটে প্লেন উড়ে গেল, কিন্তু ওদেরকে দেখতে পেল না। পোর্টেবল রেডিওর সাহায্যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কোন সাড়া পেল না রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ায়। উদ্ধারকারী দল ওদের খোঁজে সাগর চষে ফেলছে, দু'একটা দল একেবারে কাছে চলে আসছে, অথচ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না–এটা আরও হতাশ ও অসহায় করে তুলল ওদেরকে। রানার উৎসাহ পাবার মত বিষয় একটাই, প্লেনগুলো দেখে ওগুলোকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ বলে চেনা গেছে। দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বসে নেই। নিশ্চয়ই তারা নুমা হেডকোয়ার্টার থেকেই দুঃসংবাদটা পেয়েছে।

আজও সারাদিন মেঘলা কাটল। তবে সূর্য পাটে বসতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পশ্চিমের কমলা আকাশ আর মখমল নীল পুবাকাশে গাঢ় হলো গোধূলি। পাহারায় মুরল্যান্ড, হ্যাচ টাওয়ারের কিনারার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। এরকম আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতেও কিছুক্ষণের মধ্যে একটু করে ঘুমিয়ে নেয়ার একটা অভ্যাস গড়ে তুলল সে–ঘুম মানে ঝিমিয়ে নেয়া, এবং প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক পনেরো মিনিট পর পর চোখ খুলছে। সন্ধ্যার দিকে বারদশেক দিগন্তে চোখ বুলিয়ে কিছুই দেখতে পেল না, ফলে আবার স্বপ্ন দেখার লোভে ঘুমের জগতে ডুব দিল।

এরপর যখন ঘুম ভাঙল, বুঝতে পারল এর জন্যে দায়ী মিউজিক। প্রথমে ভাবল, সে আসলে হ্যালুসিনেইশানের শিকার। কিনারা থেকে বাইরের দিকে হাত নামিয়ে সাগরের পানি নিল হাতে, চোখ-মুখে ছিটাল বাস্তবে ফেরার আশায়।

কিন্তু মিউজিক তারপরও থামল না।

সুরটাও এখন ধরতে পারছে মুরল্যান্ড। একটা ওয়ালয্–'টেইলস ফ্রম দা ভিয়েনা উডস'। তারপর আলো দেখতে পেল সে। তারা ভরা আকাশে আরও একটা তারা, তবে কোন তারা কি আগুপিছু করে–দক্ষিণ আসমানে এটা যেমন করছে?

রাতের বেলা পানির ওপর দূরত্ব আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন, তবে মুরল্যান্ড বাজি ধরে বলতে পারে মিউজিক আর আলোটা খুব বেশি হলে চারশো গজ দূরে।

হ্যাচ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, হাতড়ে একটা টর্চ খুঁজে নিল, তারপর আবার উঠল ওপরে। এবার ছোট একটা ভেসেলের অস্পষ্ট আউটলাইন দেখতে পেল সে, চৌকো জানালা দিয়ে ম্লান আলো বেরুচ্ছে। আঙুলের পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব, বোতামে ঘন ঘন চাপ দিয়ে টর্চটা জ্বালল আর নেভাল, চিৎকার শুরু করল যেন একটা অসুস্থ ছাগল।

'এদিকে! মাথা খাও! এদিকে!'

'অ্যাই, কি হয়েছে?' নিচে থেকে হাঁক ছাড়ল রানা।

'তুমি তোমার আল্লাহ্‌কে ডাকো, দাদা,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমি আমার গডকে স্মরণ করছি। একটা বোট, রানা, একটা বোট!'

রানার কানের কাছে বোমা ফাটাল জিনার গলা, 'ধরো! এই ধরো!' বোট যেন কোন মাছ, বড়শি থেকে ছাড়ানো যায়। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, 'ফ্লেয়ার ছোঁড়ো, ববি!'

তার এই ভুলটা ভেঙে দিল রানা। 'ব্লু নেভিগেটরে কোন ফ্লেয়ার নেই, জিনা। আমরা শুধু দিনের বেলা ডাইভ দিচ্ছিলাম, মনে আছে? উঠে আসছিলাম মাদার শিপের কাছাকাছি।' ও শান্ত, পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে পাঁচটা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে কল করতে শুরু করল।

কি ঘটছে দেখার জন্যে জিনার মন ছটফট করছে, কিন্তু হ্যাচ টাওয়ারে একজনের বেশি লোকের জায়গা হবে না। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে তাকে। রানাকে দেখছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে, কান পেতে আছে মুরল্যান্ড কি বলে শোনবার জন্যে।

'ওরা আমাদের দেখতে পায়নি,' ছাগলের মত চিৎকার করার ফাঁকে নিস্তেজ গলায় প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুরল্যান্ড, হাতের টর্চ এখনও পাগলের মত নাড়ছে। কিন্তু টর্চটা থেকে আলো বলতে গেলে বেরুচ্ছেই না। ব্যাটারি প্রায় নিঃশেষ বলা যায়। 'আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'হ্যালো, হ্যালো, প্লীজ সাড়া দিন,' এক মনে বারবার ডাকছে রানা।

উত্তরে শুধু যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে আসছে।

সাবমারসিবলের ভেতর ভেজা কম্বলের মত চেপে বসল হতাশা। মুরল্যান্ড দেখতে পেয়ে জানাল, ভেসেলটার আলো দূর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওটা থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পায়নি। অসহায় একটা ভাব আর কষ্ট নিয়ে দেখছে উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভেসেলের আলো। 'এত কাছে, অথচ কত দূরে,' ম্লান সুরে বিড় বিড় করল সে।

অকস্মাৎ সাবমারসিবলের স্পীকার ঘর্ঘর করে উঠল, তারপর বেরিয়ে এল ভারী একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'এই মহা সমুদ্রে কার সঙ্গে আমি কথা বলছি?' ভাষাটা ইংরেজি, একটু বোধহয় ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ টান আছে; কেন যেন চেনা চেনা লাগল রানার।

'থামুন!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'আপনি আমাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছেন। প্লীজ রিভার্স কোর্স।'

'টিকে থাকুন। ফিরছি আমি।'

'ভেসেলটা ঘুরছে!' আনন্দে হাততালি দিল মুরল্যান্ড। 'ওরা ফিরে আসছে!'

'আমার বো-র কোন্ দিকে আপনি?' মার্জিত কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্ন করা হলো।

'ববি!' হ্যাচের দিকে মুখ তুলে গলা চড়াল রানা। 'উনি একটা পজিশন চাইছেন।'

'বলো, তাঁর পোর্টের দিকে বিশ ডিগ্রিতে আছি আমরা।'

রেডিওতে পজিশনটা জানাল রানা।

এক মিনিট পর মেসেজ এল। 'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এবার—সোজা একশো গজ সামনে ম্লান একটু আভা।' তিন সেকেন্ড বিরতির পর একটা প্রশ্ন। 'চেনাচেনা লাগে কেন? গলাটা?'

'আরে, আমারও তো! তুমি কি ভিনসেন্ট? ভিনসেন্ট গগল?'

এক মুহূর্ত পর উত্তর এল, হতাশ ভাবটা চাপা থাকল না। 'ভিনসেন্ট গগল? এই নামে কাউকে আমি চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন, আপনি কে? মঁসিয়ে, মিস্টার, নাকি সিনর?'

'জনাব,' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা।'

'ভেরি স্যাড অ্যান্ড ভেরি ব্যাড!' প্রায় নিস্তেজ কণ্ঠস্বর। 'এই নামেও কাউকে আমি চিনি না!'

বোট মালিক তার ইয়টের গায়ে বসানো এক সারি আলো জ্বালল, তার মধ্যে একটা সার্চলাইট; পানির সারফেসে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে স্থির হলো মুরল্যান্ডের ওপর—হ্যাচ টাওয়ার থেকে এখনও পাগলের মত হাতের নিভু-নিভু টর্চটা নাড়ছে সে।

'ভয় পাবেন না,' আবার সেই যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আমি আপনাদের ওপর দিয়ে পার হব। থামব আপনাদের ছোট্ট টাওয়ারের মাথায়, ওটা যখন আমার বোটের স্টার্ন-এর সঙ্গে একই পজিশনে আসবে। আমি একটা মই ফেলে দেব, আপনারা উঠে আসবেন।'

বোট মালিকের বক্তব্য রানা ঠিক বুঝতে পারল না। 'আমাদের ওপর দিয়ে পার হবেন?' ভাবল, এ আবার কেমন কথা! 'আমি আপনার কথা শুনতে পাইনি।'

বোট মালিক সাড়া দিল না। এক মুহূর্ত পর মুরল্যান্ড হায়-হায় করে বলে উঠল, 'সর্বনাশ! লোকটা বোধহয় বলল আমাদেরকে চাপা দেবে।'

'তার মানে লোকটা আমাদেরকে ডুবিয়ে মারতে এসেছে!' জিনার গলায় আতংক।

রানাও প্রথমে ভাবল, ওদেরকে খুন করতে চায় এমন কেউ একজন ব্লু নেভিগেটরকে খুঁজে পেয়েছে। এ-ও হয়তো সেই দলেরই লোক যারা তৃষাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। জিনাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ও, বলল, 'তুমিও ভাল করে ধরো, ধাক্কা লাগলে ছিটকে পড়বে না। যদি দেখো সাবমারসিবল ডুবে যাচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারো হ্যাচ গলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে ঠেলব।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জিনা, তারপর রানা তাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরতে ওর চওড়া বুকে মুখ গুঁজল সে।

'যখন বুঝবে যে সংঘর্ষ ঘটবেই,' মুরল্যান্ডকে নির্দেশ দিল রানা, 'তখন চিৎকার কোরো। তারপর লাফ দিয়ে সরে যেয়ো।'

আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত লঞ্চ বা ইয়টটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, সেটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে হ্যাচ টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মুরল্যান্ড এরকম কোন সমুদ্রগামী ইয়ট জীবনে কখনও দেখেনি সে। ধীরে ধীরে তার

চোখের সামনে দুই খোল বিশিষ্ট অদ্ভুত আকৃতির জলযান স্পষ্ট হচ্ছে। চওড়া বো ঢালু, ওপরে উঠে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে খিলান আকৃতির একটা পিকচার উইন্ডোকে, তারপর পাশ কাটিয়েছে ডিম্বাকৃতি হুইলহাউসকে। জলযানটা ভাসছে প্রকাণ্ড একজোড়া চওড়া স্কী স্টিক-এর ওপর, দুই খোল-এর মাঝখানটা সম্পূর্ণ ফাঁকা।

বোটটা এগিয়ে এসে থামতে এখন সেই ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ব্লু নেভিগেটর, তারপরও দু'পাশে পাঁচ ফুট করে জায়গা খালি পড়ে থাকল। বোটটার মেইন সুপারস্ট্রাকচার ধীরে ধীরে মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এখন, আবার থামল সাবমারসিবল সরাসরি স্টার্ন-এর নিচে চলে আসতে। দু'ফুট সামনে ক্রোম-এর তৈরি মই নেমে আসতে দেখে খপ করে ধরে ফেলল মুরল্যান্ড। এতক্ষণে তার রানাকে রিপোর্ট করার কথা মনে পড়ল।

'চিন্তার কিছু নেই। এটা একটা ক্যাটাম্যারান। আমরা সরাসরি ওটার স্টার্নের নিচে রয়েছি।' পরমুহূর্তে হ্যাচ টাওয়ার থেকে গায়েব হয়ে গেল সে।

হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল জিনা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে ছোটা ছিপির মত, মাথার ওপর ক্যাটাম্যারান-এর আকার-আকৃতি দেখে বিহ্বল। সে দাঁড়িয়ে আছে বিলাসবহুল রিয়ার ডেকে, মেহগনি কাঠের টেবিল আর কাউচগুলো অবাক হয়ে দেখছে, মনে করতে পারছে না সিঁড়ি বেয়ে কখন বা কিভাবে উঠে এল।

সাবমারসিবল-এর বীকন রিসেট করল রানা, তারপর ক্যাটামারান-এ ওঠার আগে বন্ধ করে বোল্ট লাগিয়ে দিল হ্যাচে। এক মুহূর্ত ওখানেই শুধু নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। কোন ক্রু বা প্যাসেঞ্জার ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসছে না। সাবমারসিবলকে পিছনে ফেলে ইয়টকে সামনের দিকে চালাচ্ছে হেলম্‌স্‌ম্যান। প্রায় দুশো গজ এগোবার পর বোটের স্পীড কমে এল, তারপর শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলল। সবাই চোখ তুলে দেখল লোকটাকে, হুইলহাউস থেকে নেমে আসছে।

অত্যন্ত সৌখিন ব্যক্তি, পরনে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ বীরযোদ্ধার মত বেশভূষা, সঙ্গে আছে ঢাল-তরোয়াল থেকে শুরু করে শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত। শিরস্ত্রাণ থেকে বেরিয়ে এসে মুখের দু'পাশ আর কান ঢেকে রেখেছে লাল সিল্ক কাপড়ের ঝালর। বেশ লম্বা-চওড়া শরীর, দেখেই বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে। এই যুগে এরকম প্রাচীন যোদ্ধার বেশ শুধু যে বেমানান তাই নয়, হাস্যকরও বটে। তবে রানা হেসে উঠল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ও ওর বন্ধুকে চেনে, তার এই 'যেমন খুশি সাজি' অভ্যাসটা সম্পর্কে জানা আছে। ও হাসল গগলকে চিনতে পেরে। যতই উদ্ভট পোশাক পরে থাকুক, নাক আর চোখ দেখেই গগলকে চিনে ফেলল ও। 'ওহ্, গড! সত্যি তুমি?'

'হ্যাঁ, দোস্তো, তোমার সেই আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু ভিনসেন্ট!' গগল হাসতে গিয়েও হাসল না, তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'তোমরা তিনজন? আমি তো ধরে নিয়েছিলাম ছোট্ট ওই ভেলায় কোন রকমে একজন আছ।'

'ভেলা নয়, হে,' বলল রানা, 'ওটা ডীপ ওশান সাবমারসিবল।'

'বলো কি!' গগল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। 'ফর গডস্ সেইক!

তোমরা একা কেন, মানে সাবমারসিবল থাকলে আশপাশে মাদার শিপ তো থাকবে–কোথায় সেটা?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী,' বলল রানা। 'আমরা আসলে ডুবে যাওয়া একটা ক্রুজ শিপের খোল ইনভেস্টিগেট করছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি–ওয়াটার লিলি। ভয়ানক একটা ট্রাজিডি। মিরাকলই বলতে হবে যে এত মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হলো।'

উদ্ধার কাজে নিজেদের কি ভূমিকা ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গেল না রানা, সংক্ষেপে শুধু জানাল কিভাবে ওরা সাগরে হারিয়ে গেছে।

'হোয়াট! বল কি, সারফেসে ওঠার পর নিজেদের জাহাজকে দেখতে পাওনি?' গগল বিশ্বাস করতে পারছে না।

'রানা ঠাট্টা করছে না,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমাদের জাহাজ সী রবিন সত্যি গায়েব হয়ে গেছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ববি মুরল্যান্ড, নুমার একজন বিজ্ঞানী, এবং আমার রহস্যময় বন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না?'

হ্যান্ডশেক করার সময় হাসল মুরল্যান্ড। 'আপনি নিশ্চয়ই রানার মুখে আমার কথা শুনেছেন।'

'আমি রানার আরও একজন বন্ধু,' বলে নিজের হাতটাও বাড়িয়ে দিল জিনা। 'জিনা ক্যারল। কিন্তু রানাকে আপনি রহস্যময় বললেন কেন? আমরা তো বরং উল্টোটাই শুনেছি, আপনাকে নাকি প্রায় একটা ভৌতিক চরিত্রই বলা যায়।'

'কেন? কি রকম?' গগলকে রাগানো সহজ নয়, তার চোখ-মুখ থেকে কৌতূহল উপচে পড়ছে।

'আপনিই তো সেই ভদ্রলোক, রানার ঠিক বিপদের সময় অকস্মাৎ আকাশ থেকে পড়েন, ওকে সাহায্য করে প্রায় বিনা নোটিশে অদৃশ্য হয়ে যান; লাখ লাখ ডলার ব্যয় করেন বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশে, অথচ রোজগারের উৎস সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না বললেই চলে। জেরুজালেমে আপনাকে অন্ধ সেজে ভিক্ষা করতেও দেখা গেছে, আবার ভারতের কর্নাটকে কোন এক ন্যাংটো সন্ন্যাসীর সঙ্গে একই পোশাক পরে আপনাকে নাচতেও দেখা গেছে...'

'এসব আমি স্বীকার বা অস্বীকার, কোনটাই করব না,' বলল গগল। 'শুধু এটুকু ব্যাখ্যা করব–রানাকে কেন আমি রহস্যময় বলি।'

'এবার সত্যি মনোযোগী না হয়ে পারছি না,' হালকা সুরে বলল রানা।

'আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না,' শর্ত দিল গগল। 'যতটুকু বলব তাতেই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। রানাকে আমার রহস্যময় বলার কারণ হলো, ওর যে যোগ্যতা আর ক্ষমতা, এ-সব থাকলে যা খুশি হতে চাওয়া যায়, যা খুশি হতে পারা যায়–কিন্তু কখনোই কিছু হতে চায়নি ও।' এক মুহূর্ত থেমে আরও একটু বলল, 'যদি কিছু হয়েও থাকে, দুনিয়ার মানুষ সে-সম্পর্কে খুব কমই জানে। ও চিরকাল আড়ালেই থেকে গেল। ও যদি মূর্তিমান একটা রহস্য না হয়, তাহলে দুনিয়ায় আর কোন রহস্য নেই।'

মুরল্যান্ড আর জিনা বোধহয় হাততালি দিতে যাচ্ছিল, তার আগে তাড়াতাড়ি

বলে উঠল রানা, 'এ-সব গল্প-গুজব পরে হবে। নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে এখুনি জানানো দরকার যে আমাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে। উনিই বিসিআই-কে খবরটা পৌছে দেবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকাল গগল। 'এসো, হুইলহাউসে উঠি। সী-টু-শোর রেডিও কিংবা স্যাটেলাইট ফোন, যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারো। ইচ্ছে হলে এমন কি ই-মেইলও পাঠাতে পারো। পানিতে যত ইয়ট আছে তার মধ্যে আমার অ্যাঞ্জেলিনার কমিউনিকেশন সিস্টেমই সবার সেরা।'

ওদের পিছু নিয়ে হুইলহাউসে উঠছে মুরল্যান্ড আর জিনা, দেখল ওরা দু'জন পরস্পরের কাঁধে একটা করে হাত রেখেছে।

দশ

হুইলহাউসে উঠে এসে রানা জানতে চাইল, 'এবার বলো, তুমি এদিকে কোত্থেকে এলে?'

'আমি তো অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছি,' জানাল গগল। 'শেষ বন্দর ছেড়েছি ইন্দোনেশিয়ার জাভা। ভাবলাম বঙ্গোপসাগরে ঢুকে বিশ মিনিট ধ্যান করলে টের পেয়ে যাব তুমি ভাল আছ কিনা। যদি ভাল থাকো তাহলে আর বাংলাদেশের কোন বন্দরে ভিড়ব না, কোর্স বদলে শ্রীলঙ্কার দিকে চলে যাব।'

'ধ্যান করে আপনি টের পেলেন রানার বিপদ?' চোখ বড় বড় করল জিনা।

'টের না পেলে বাংলাদেশের দিকে আমি যাচ্ছিলাম কেন?'

বিলাসবহুল ক্যাটাম্যার‍্যান-এর চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'আমি কোন ক্রু দেখছি না।'

'আমি একাই বেরিয়েছি,' বলে ভুরু কোঁচকাল গগল। 'তুমি যেন মনে হচ্ছে আমার স্বভাব ইত্যাদি সব ভুলে গেছ? আমি তো চিরকাল যা করার একাই করি।'

'কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা মোটর বোট নিয়ে?'

গগল হাসল। 'বড় তো কি হয়েছে, অটমেইটেড সিস্টেম আর কমপিউটরের সাহায্যে অ্যাঞ্জেলিনা নিজেই চলতে পারে, বেশিরভাগ সময় চলেও তাই।'

হুইলহাউসের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নুমার সদস্যরা যারপরনাই বিস্মিত। টিনটেড উইন্ডো তিনশো ষাট ডিগ্রি বৃত্ত রচনা করায় সবগুলো দিগন্ত দেখতে কোন অসুবিধে নেই। লেআউটে ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। প্রচলিত ইন্সট্রুমেন্ট বা গজ, হুইল বা হেল্‌ম্‌, লিভার বা থ্রটল, কিছুই নেই। সাতটা লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে—এলসিডি—স্ক্রীনের সামনে বড় আকারের এগজিকিউটিভ চেয়ার ফেলা আছে। চেয়ারটার ডান হাতল ধরে আছে একটা কমপিউটর ট্র্যাকবল, বাম বাহুতে ফিট করা একটা জয়স্টিক। প্রতিটি স্ক্রীন ওয়ালনাট কেবিনেটে আটকানো। সাজানোর দিক থেকে স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের চেয়েও অ্যাঞ্জেলিনার হেল্‌ম্‌ স্টেশন অনেক বেশি চোখ-ধাঁধায়।

হেল্‌ম্‌ চেয়ারটা দেখিয়ে রানাকে বসতে বলল গগল। 'তোমার ডান দিকের প্যানেলে গ্লোবস্টার ফোন। নীল বোতামটা টিপলেই তোমরা সবাই কথা বলতে ও অপরপ্রান্তের কথা শুনতে পাবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারের নির্দিষ্ট একটা নম্বর ডায়াল করল রানা। বরাবরের মত প্রথমবার রিঙ বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'হ্যামিলটন।'

'রানা, মিস্টার হ্যামিলটন।'

এক মুহূর্তের জমাট নিস্তব্ধতা। তারপর ধীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তোমরা সবাই বেঁচেবর্তে আছ?'

'সেদ্ধ খাবারের অভাবে ভুগছি, বাকি সব ঠিক আছে।'

'জিনা? ববি?'

'আমার পাশে দাঁড়িয়ে।'

এয়ারপীস-এর মধ্যে দিয়ে নুমা চীফের স্বস্তির নিঃশ্বাস শুনতে পেল রানা। 'অফিসে আমার সঙ্গে রেডক্লিফ রয়েছেন, আমি স্পীকার অন করছি।'

'মিস্টার রানা!' রেডক্লিফের হর্ষধ্বনি শোনা গেল। 'ভাবতে পারবেন না আপনারা ভাল আছেন জেনে কি আনন্দ হচ্ছে আমাদের। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার নৌ ও বিমান বাহিনী আপনাদের আর সী রবিনের খোঁজে ভারত মহাসাগর চষে ফেলছে...'

'ভাগ্য নিতান্ত ভাল, হঠাৎ এদিকে চলে আসা একটা ইয়ট আমাদেরকে উদ্ধার করেছে।'

'তোমরা সী রবিন থেকে বলছ না?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'ব্লু নেভিগেটর নিয়ে ঘণ্টা কয়েক সাগরের নিচে থাকার পর সারফেসে উঠে দেখি সী রবিন নেই—বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'তাহলে তোমাদের জানার কথা নয়।'

'কি কথা জানার নয়?'

'আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে দেখে-শুনে মনে হচ্ছে সী রবিনকে হাইজ্যাক করা হয়েছে।'

'এরকম মনে হবার কারণ?'

'গতকাল এই সময় আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম ধরতে পারে যে-লোকটা ক্যাপটেন শেফার্ডের নামে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠাচ্ছে সে অন্য কেউ, শেফার্ডের সঙ্গে তার ভয়েস প্যাটার্ন মিলছে না। তার আগে পর্যন্ত আমরা কেউ কিছুই সন্দেহ করতে পারিনি।'

'আমরা যখন জাহাজ ছাড়ি তখন সব স্বাভাবিক ছিল,' বলল মুরল্যান্ড।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'হাইজ্যাক করে জাহাজটাকে কোথায় নিয়ে গেছে, কোন ধারণা আছে আপনাদের?'

'না, কোনই ধারণা নেই,' হতাশ গলায় বললেন রেডক্লিফ।

'অত বড় একটা জাহাজ নিশ্চয়ই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়নি,' বলল জিনা।

'ভিনগ্রহ থেকে কেউ এসে মহাশূন্যেও নিয়ে যায়নি।'

'আমি ভয় পাচ্ছি ওটাকে ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে,' থমথমে গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। এ-কথা বলতে গিয়েও বললেন না যে সী রবিনের সঙ্গে সমস্ত ক্রু ও বিজ্ঞানীদেরও সলিল সমাধি ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা।

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন মুরল্যান্ডের। 'একদল জলদস্যুর কাছে একটা ওশনাগ্র্যাফিক সার্ভেশিপের কি মূল্য থাকতে পারে? জাহাজে কোন গুপ্তধন ছিল না। সী রবিনকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। স্পীড কম; দেখলেই চেনা যাবে। মোটিভ কোথায়?'

'মোটিভ হলো, কেউ জানতে দিতে চাইছে না ওয়াটার লিলিতে আগুনটা লাগানো হয়েছিল,' বলল রানা।

'সাগরের নিচে ওয়াটার লিলি সার্ভে করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'হ্যাঁ, হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ওয়াটার লিলির তলা খসিয়ে দেয়া হয়।'

মুরল্যান্ড বলল, 'প্রমাণ গোপন রাখার জন্যে সাগরের বিশ হাজার ফুট তলা আদর্শ জায়গা।'

রেডক্লিফ সায় দিলেন। 'ক্রিমিন্যালরা কল্পনাও করেনি কাছেপিঠে নুমার একটা সার্ভে শিপ থাকবে, সেই শিপের সাবমারসিবল বিশ হাজার ফুট নেমে দেখে আসতে পারবে ওয়াটার লিলিকে।'

অকস্মাৎ স্থির ও অপলক হয়ে গেল জিনার চোখ। 'তাহলে তো এ সম্ভাবনাও স্বীকার করতে হয় যে অপরাধ গোপন করার স্বার্থে সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীদের মেরে ফেলা হয়েছে!'

ইয়টে ও প্রায় বারো হাজার মাইল দূর ওয়াশিংটনে নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'মিস্টার রেডক্লিফ?'

রেডক্লিফ চোখ থেকে নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছেন। 'ইয়েস?'

'জলদস্যুরা ইচ্ছে করলেই সী রবিনকে দখল করার পর ডুবিয়ে দিতে পারত, তাই না? কিন্তু আপনি বলছেন, ক্যাপটেন শেফার্ডের গলা নকল করে শেডিউল ধরে রিপোর্ট করেছে ওরা। সী রবিনকে ডুবিয়ে দিয়ে থাকলে এই ঝামেলার মধ্যে তারা যাবে কেন?'

'ডোবানো হয়নি, এ-ও আমরা জানি না।'

'তা জানি না, কিন্তু আমরা সারফেসে ওঠার পর কোন আবর্জনা বা তেল ভাসতে দেখিনি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ জাহাজটা কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে দেখলে তুরুপের তাস হিসেবে কাজে লাগাবার জন্যে।'

'কিন্তু যখন বুঝতে পারবে তাদের অপরাধ ধরা পড়েনি বা তাদেরকে আটক করার চেষ্টা হচ্ছে না,' বললেন রেডক্লিফ, 'তখন কি হবে? লোকজন সহ সী রবিনকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রমাণ মুছে ফেলবে?'

'সেটা আমরা ঘটতে দিতে পারি না,' প্রতিবাদের সুরে বলল জিনা। 'রানা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, ওদেরকে উদ্ধার করতে চাইলে খুব একটা সময় নেই আমাদের হাতে।'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'সমস্যা হলো, কোথায় খুঁজবে?'

'কোথাও তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'নেই।'

'হাইজ্যাকারদের ভেসেল সম্পর্কেও কোন তথ্য নেই?'

'না।'

'আমি জানি কিভাবে দুটো জাহাজকেই খুঁজে পাওয়া যাবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা।

ওয়াশিংটনে হ্যামিলটন ও রেডক্লিফ পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'তুমি কোন জলে মাছ ধরছ, হে?'

'আমরা সার্চ গ্রিড-এর পরিধি বাড়াব,' জবাব দিল রানা।

'বুঝলাম না,' বললেন রেডক্লিফ।

'ধরুন স্যাটেলাইট ক্যামেরা সরু একটা জায়গার ওপর ফোকাস করেছিল, সেই জায়গার বাইরে ছিল আমাদের সার্ভেশিপ আর পাইরেট শিপ।'

'একটা সম্ভাবনা,' স্বীকার করলেন হ্যামিলটন।

'আমি ধরে নিচ্ছি,' বলল রানা, 'পরবর্তী অরবিট-এ সার্চ এরিয়া আরও চওড়া করতে বলবেন।'

'বলাও হয়েছে,' জানালেন রেডক্লিফ। 'করাও হয়েছে। কিন্তু দুটো জাহাজের কোনটারই সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'এর মানে হলো সী রবিন কোথায় আমরা তা জানি না,' বলল রানা। 'তবে এখন আমরা জানি কোথায় সে নেই।'

নিখুঁতভাবে ছাঁটা নিজের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন অ্যাডমিরাল, 'আমি জানি কি বলতে চাইছ তুমি, তবে তোমার থিওরি এখানে খাটবে না।'

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমি একমত,' বললেন রেডক্লিফ। 'সী রবিনের টপ স্পীড পনেরো নটের বেশি নয়, স্যাটেলাইট ক্যামেরার নিয়মিত রেঞ্জের বাইরে চলে যাবার কোন উপায় নেই তার।'

'চীফ এঞ্জিনিয়ার গার্ডনার জ্বলন্ত ওয়াটার লিলির দিকে ছোটার সময় বিশ নট স্পীড তুলেছিলেন,' জানাল রানা। 'স্বীকার করছি একটু কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে, তবে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না–জলদস্যুদের জাহাজের স্পীড বেশি ছিল, সী রবিনকে তারা হয়তো টো করে নিয়ে গেছে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন উৎসাহ বোধ করার মত কিছু পাচ্ছেন না। 'হিসাবটা তাতেও তো মিলছে না। স্যাটেলাইট ক্যামেরার রেঞ্জ বাড়াবার পরও তো সী রবিনের দেখা পাওয়া যায়নি।'

হাতের শেষ তাসটা খেলল এবার রানা। 'ঠিক, কিন্তু আপনারা নজর রাখছিলেন পানির ওপর।'

'পানি ছাড়া আর কিসের ওপর নজর রাখা উচিত ছিল?' বিরক্ত, তবে সেটাকে

নিখুঁতভাবে চেপে রাখছেন অ্যাডমিরাল।

'মিস্টার রানার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন রেডক্লিফ, চিন্তিত। 'আমরা মাটিতে ক্যামেরা ফোকাস করার কথা ভাবিনি।'

'জিজ্ঞেস করার জন্যে মাফ চাই।' মুরল্যান্ডের গলা। 'মাটি মানে? ওয়াটার লিলি যেখানে ডুবেছে সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের মাটি তো সুমাত্রা, তাই না?'

'না এবং হ্যাঁ, নির্ভর করছে কোন দিকে তাকাচ্ছ তার ওপর।' বলল রানা। 'যদি দক্ষিণ-পুব দিকে তাকাও, সুমাত্রা। উত্তরে তাকালে কোকো আইল্যান্ড। সরাসরি দক্ষিণে তাকালে ল্যান্ডফল আইল্যান্ড। এদিকে তো দ্বীপের ছড়াছড়ি—আন্দামান আর নিকোবরের ভাই-বেরাদার সব।'

'এতসব দ্বীপের মধ্যে কোথায় আমরা খুঁজব সী রবিনকে?'

'কোকো চ্যানেল থেকে বেশিরভাগ দ্বীপই দক্ষিণ দিকে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে খুঁজতে হবে দুশো নটিকেল মাইলের বাইরের কোন দ্বীপ।' গগলের দিকে তাকাল ও, চোখ দুটো হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হলো।

'তোমার ধারণা ঠিক আছে, রানা,' বলল গগল। 'আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সবগুলোতেই আমি গেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, কোনটাতেই দেখার তেমন কিছু নেই। আদিবাসীরা বসবাস করে, এখনও তাদেরকে জংলী বর্বরই বলতে হয়, ভারত সরকার তাদের নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামায় না। কোন কোন দ্বীপ একদম খালি।'

'এরকম একটা দ্বীপের নাম বলো যেখানে দু'একটা জাহাজ লুকিয়ে রাখা যায়।'

'সেন্টিনেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রী,' বলল গগল। 'সবচেয়ে বড় সেন্টিনেল থ্রী, তেরো বর্গ মাইল জুড়ে পাথরের একটা স্তূপ বলতে পারো। পাথর মানে লাভা রক। হ্যাঁ, সেন্টিনেল থ্রীতে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। পাহাড়টার নাম ভোলাভালা। এর মানে তোমারই ভাল জানার কথা। তবে শুনেছি বিশ-পঁচিশ বছর পর পর খানিকটা করে ধোঁয়া বেরোয় জ্বালামুখ দিয়ে।'

'একদম খালি?'

'একটা ওয়েদার অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টেশন থাকলেও, সেটা অটমেইটেড বিজ্ঞানীরা ছ'মাসে একবার এসে চেক ও মেরামত করেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করে শুধু ছাগল আর ইঁদুর।'

'হারবার যথেষ্ট বড়, ছোট জাহাজ নোঙর ফেলার জন্যে?'

'হারবার না বলে লেগুন বলাই ভাল,' জানাল গগল। 'একটা কেন, ছোট আকারের দু'তিনটে জাহাজ লুকিয়ে রাখা যাবে যদি কেউ যত্নের সঙ্গে না খোঁজে।'

'গাছপালা? ক্যামাফ্লাজ?'

'সেন্টিনেল থ্রীতে যতই পাথর থাকুক, গাছও আছে প্রচুর,' বলল গগল 'কোথাও কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গল।'

এবার ফোনে কথা বলছে রানা, 'শুনলেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন নুমা চীফ। 'স্যাটেলাইট এরপর যখন বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে যাবে তখন দ্বীপগুলোর দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলে দিচ্ছি, বিশেষ

ক্রুরে সেন্টিনেল থ্রীর ওপর। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?'

গগলকে তার কমিউনিকেশন কোড জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রানা, দেখা গেল আগেই সেটা একটা কাগজে লিখে রেখেছে সে। কাগজটা নিয়ে অ্যাডমিরালকে কোডটা পড়ে শোনাল ও, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

'তুমি সত্যি আশীর্বাদ হয়ে এসেছ,' অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করল রানা, তারপরই খোঁজ নিল আরও কতটুকু কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। 'এমন কোন সম্ভাবনা কি আছে যে তুমি সেন্টিনেল থ্রীর ওদিক দিয়েই যাবে?'

'না, যাব না, কারণ ওদিকে আমার কোন কাজ নেই,' বলল গগল। 'তবে তবু যেতে বাধ্য আমি।'

'বাধ্য?' রানার চোখের তারায় কৌতুক।

'বাধ্য এই জন্যে যে এই উপকার যখন ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ পাবে তুমি, তখন তোমার মনে পড়বে যতটুকু সাধ্য ছিল ততটুকু আমি করিনি—অর্থাৎ সাধারণত যে দশ বা বিশগুণ প্রতিদান পাই, সেই ভাগে একটু হলেও কম পড়ে যাবে।' সোজা মানে হলো: গগল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাশে থাকবে রানার।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ইয়টে শিভাস রিগাল-এর কোন বোতল-টোতল নেই, নাকি আছে?'

গলা ভেজাতে বসল ওরা চারজন, তখনই ঠিক কি চায় ব্যাখ্যা করল রানা। হাজার হোক বন্ধু মানুষ গগল, তার এত সুন্দর ইয়টটা ধ্বংস করার ঝুঁকি তো আর নিতে বলতে পারে না।

এগারো

কালচে-সবুজ সাগরের পানি চ্যানেল দিয়ে বড়সড় লেগুনটায় ঢোকার পর হালকা সবুজ হয়ে গেছে। সেন্টিনেল থ্রী আইল্যান্ডের ভলক্যানিক পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে এই লেগুন সরু চ্যানেল-এর পর বেশ চওড়া, নোঙর ফেলার প্রয়োজনীয় পরিসর সহজেই পাওয়া যেতে পারে। আরও সামনে ভোলাভালা পাহাড় থেকে নেমে আসা চঞ্চল ঝর্না এবড়োখেবড়ো পাথুরে ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এসে পড়ছে লেগুনে। ঘোড়ার খুর আকৃতির সৈকত, বালি আছে, কোথাও বালির বদলে পাথরের স্তূপ। আর আছে সারি সারি সুপারি আর নারকেল গাছ।

সাগর থেকে জোড়া পাহাড়-প্রাচীরের সরু ফাঁক দিয়ে লেগুনের সামান্য একটু দেখা যায়, প্রাচীর দুটো চ্যানেলের দু'পাশে আকাশ ছুঁয়ে আছে। এ যেন চোখে টেলিস্কোপ তুলে দূরের কোন সরু ফাটল দেখা। প্রবেশপথের উঁচু পশ্চিম দিকটায়, তীরে আছড়ে পড়া ফেনা থেকে তিনশো ফুটেরও বেশি ওপরে, তালগাছের পাতা দিয়ে তৈরি একটা কুঁড়ে বানানো হয়েছে বিপজ্জনকভাবে পাথুরে কিনারার একেবারে কাছে। কুঁড়েটার দৈন্যদশা আসলে কৃত্রিম। তালপাতার ভেতর রয়েছে কংক্রিটের তৈরি কঠিন দেয়াল। ভেতরটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, জানালাগুলো

টিনটেড। আরামদায়ক ছোট্ট বাড়িটার ভেতর বসে একজন সিকিউরিটি গার্ড চোখে অত্যন্ত শক্তিশালী বিনকিউলার তুলে বিশাল সাগরের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে। বিনকিউলারটা বিরাট, তাই একটা স্ট্যান্ড-এর ওপর বসানো। নরম এগযিকিউটিভ চেয়ারে বসে আছে গার্ড, সামনে কমপিউটর, রেডিও, ভিসিআর ও মনিটর নিয়ে। চেইন স্মোকার, অ্যাশট্রে প্রায় ভরে উঠেছে। দূরে, একদিকের দেয়ালের র‍্যাকে সাজানো, চারটে মিসাইল লঞ্চার আর দুটো অটোমেটিক রাইফেল দেখা যাচ্ছে। লেগুনে ঢুকতে চেষ্টা করলে এই অস্ত্রের সাহায্যে ছোট একটা নৌ-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে।

বয়স ত্রিশ, ভাল স্বাস্থ্য, বলা যায় প্রায় শূন্যদৃষ্টিতে জ্বলজ্বলে সাগরের দিকে তাকিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাচ্ছে লোকটা। গত পাঁচ বছর পৃথিবীর যেখানেই ভাড়াটে সৈন্যের দরকার হয়েছে সেখানেই গেছে সে, অবশেষে যোগ দিয়েছে কোবরা ক্লাবে। নতুন বসদের অধীনেও যুদ্ধ করতে হয় তাকে, তবে এ যুদ্ধ একটু অন্য রকম। তোমার প্রতিপক্ষ সব সময় সৈনিক নয়। অনেক সময় নিরীহ বা বোকা লোকজনকেও খতম করতে হয়। তবে বেতন-ভাতা অসম্ভব ভাল। মাথার ওপর নিরাপত্তার ছাতাটাও সাংঘাতিক মজবুত। যত বড় অন্যায়ই করতে হোক, গায়ে কেউ আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।

একটা হাই তুলে সিডি প্লেয়ারে ডিস্ক বদলাল সে। প্লে বাটনে চাপ দিতে যাবে, এই সময় পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল-পাথরের ঠিক সামনে, তার কুঁড়ের নিচে, কিছু একটা নড়তে দেখল। বিনকিউলার ঘুরিয়ে ফোকাস করল নীল ও সাদা একটা বস্তুর দিকে, পানির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

ওটা একটা ইয়ট। এমন অদ্ভুত আকৃতির ইয়ট আগে কখনও দেখেনি সে। ওটার খোলা আপার ডেকে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, একটা মেয়ে আর একটা ছেলে বাথটাবে গলা ডুবিয়ে শুয়ে লম্বা গ্লাস থেকে কিছু পান করছে আর হাসাহাসি করছে। বোটের সবগুলো জানালা টিনটেড। আর কোন ক্রু বা প্যাসেঞ্জারকে সে দেখতে পাচ্ছে না। স্পীড আন্দাজ করল চল্লিশ নট।

রেডিওর দিকে ঘুরে ট্র্যান্সমিটার অন করল সে। 'আমি ভাইপার বলছি। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ইয়টকে আসতে দেখছি।'

'দক্ষিণ দিক থেকে?' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া বা নিউজিল্যান্ডের ওদিক থেকে বেড়াতে এসেছে।'

'কত বড় ইয়ট? কোন অস্ত্র দেখতে পাচ্ছো? বা সশস্ত্র লোকজন?'

'প্রায় সত্তর ফুট লম্বা। নাহ্, অস্ত্র-টস্ত্র নেই।'

'কোন রকম হুমকি বলে সন্দেহ হচ্ছে?' রূঢ় কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'কাপড় খুলে বাথটাবে শুয়ে থাকা দু'জন নারী-পুরুষকে কি হুমকি বলা যায়?'

'চ্যানেলের দিকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকবে?'

ছুটে আসা ইয়টের জোড়া বো-র মতিগতি বোঝার চেষ্টা করল সিকিউরিটি গার্ড ভাইপার। 'মনে হচ্ছে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'সারাক্ষণ লাইনে থাকো। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট

করবে। যদি দেখো চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে, কি করতে হবে তুমি জানো।'

ঘাড় ফিরিয়ে একটা মিসাইল লঞ্চারের দিকে তাকাল গার্ড। এত সুন্দর একটা বোটকে ডুবিয়ে দিতে খারাপই লাগবে। চেয়ারে ঘুরে বসে গ্লাস-এর ভেতর দিয়ে বোটটার দিকে আবার তাকাল সে, দেখে খুশি হলো চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ইয়ট। ক্রমশ দূরে একটা বিন্দু হয়ে গেল ওটা, অন করা রেডিওতে আবার কথা বলল সে, 'ভাইপার বলছি। ইয়টটা চলে গেছে। তবে দেখে মনে হলো সাউথ মুরালির পশ্চিম দিকের খোলা লেগুনে নোঙর ফেলতে পারে।'

'তাহলে ওটা কোন হুমকি নয়,' ঘর্ঘরে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আমারও তাই ধারণা।'

'সন্ধ্যার পর ওটার আলোর দিকে খেয়াল রেখো। নিশ্চিত জানা দরকার ওটা ওখানেই থাকে কিনা।'

'আমার মনে হয় রাত কাটাবার জন্যেই ওখানে থেমেছে। প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বালিতে আগুন জ্বেলে মুরগী বা হাঁস রোস্ট করে খাবে। বোঝাই যায় ধনী লোকজন, আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়েছে।'

'হেলিকপ্টার নিয়ে একবার দেখে আসব তোমার ধারণা সত্যি কিনা।'

জিনা আর মুরল্যান্ড হট বাথ-এ নগ্ন হয়ে নামেনি, সে প্রশ্নই ওঠে না। গগলের যোগান দেয়া সুইমসুট পরে আছে ওরা। তবে সেন্টিনেল দ্বীপের পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে বোট ছোটার সময় লম্বা গ্লাসে করে শ্যাম্পেন খাচ্ছিল ওরা।

অতটা ভাগ্যবান রানা আর গগলকে বলা চলে না। কোলের ওপর একটা চার্ট নিয়ে হেল্‌ম্ স্টেশনে বসে আছে গগল, একটা চোখ ডেপথ্ সাউন্ডারে, তবে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে জলমগ্ন প্রবাল-প্রাচীরের ওপর, যেগুলো অ্যাঞ্জেলিনার জোড়া খোল চিরে ফেলতে পারে–ধারাল ব্লেড চালালে কার্ডবোর্ড যেভাবে দু'ফাঁক হয়ে যায়।

রানার কাজটা সবচেয়ে বাজে। বালিশ আর তোয়ালের বড়সড় একটা স্তূপের নিচে শুয়ে দরদর করে ঘামছে লোয়ার লাউঞ্জ ডেকে. পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় তালপাতা দিয়ে ঢাকা গার্ডহাউসের ছবি নিচ্ছে ভিডিও ক্যামেরায়।

ইয়ট নোঙর ফেলার পর সবাই ওরা মেইন সেলুনে বসে ভিসিআর-এ রানার তোলা ছবি দেখল। ক্যামেরায় টেলিফটো লেন্স থাকায় গার্ডহাউসের জানালার ভেতর বসে থাকা গার্ডকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে–বিরাট একজোড়া বিনকিউলারে চোখ রেখে সরাসরি অ্যাঞ্জেলিনার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে। ভিডিওর সঙ্গে সাউন্ডট্র্যাক সিস্টেম থাকায় এবং গগলের হাইটেক কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাহায্যে সেন্টিনেল থ্রী দ্বীপের লেগুনের কোথাও উপস্থিত তার সঙ্গীর সঙ্গে বাক্যবিনিময়ও রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে।

'ওদের আমরা বোকা বানিয়েছি,' নির্দ্বিধায় বলল জিনা।

'বুদ্ধিটা কার দেখতে হবে তো!' রানার দিকে তাকাল গগল, সবার হাতে একটা করে ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যান ধরিয়ে দিচ্ছে।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে: অচেনা লোকদের ওরা সহ্য করে না,' বলল রানা।

যেন ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যেই রোটর আর এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন শোনা গেল, কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে সরাসরি অ্যাঞ্জেলিনার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল।

'লোকটা বলেওছিল যে হেলিকপ্টার নিয়ে দেখতে আসবে,' বলল রানা। 'বাইরে বেরিয়ে হাত নাড়লে কেমন হয়?'

লাল ও হলুদ রঙ করা হেলিকপ্টার, ফিউজিলাজে লেখা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর মালিকপক্ষের নাম ডাক্ট টেপ দিয়ে ঢাকা, স্থির হয়ে ভেসে আছে একশো ফুট ওপরের আকাশে, অ্যাঞ্জেলিনার স্টার্ন থেকে সামান্য দূরে। ম্যাগাজিন শার্ট গায়ে দু'জন লোক ঝুঁকে তাকিয়ে আছে ইয়টের দিকে। প্রথমবার অ্যাঞ্জেলিনার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার ফিরে এসে নড়ছে না।

লাউঞ্জ থেকে ফেলা কাউচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে রানা। ডেক ওভারহ্যাঙ-এর তলায় আংশিক আড়াল নিয়ে কপ্টারটার ছবি নিচ্ছে মুরল্যান্ড শার্ট আর বগলের নিচে লুকানো ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে। জেনি আর গগল জ্যাকুজি বাথটাবের পাশে দাঁড়িয়ে লোক দু'জনের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। রানা হাতে ধরা গ্লাসটা উঁচু করে ইঙ্গিতে পাইলটদের আমন্ত্রণ জানাল। মাথায় সাদা পরচুলা আর পাকা দাড়ি-গোঁফ দেখে গগলকে বুড়ো একজন মানুষ বলে মনে না করার কোন কারণ নেই, তার ওপর ইয়টে মেয়েও রয়েছে, লোকগুলোর সন্দেহ দূর হয়ে গেল। সাড়া দিয়ে পাল্টা হাত নাড়ল কপ্টারের পাইলট, অ্যাঞ্জেলিনাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে সেন্টিনেল থ্রীর দিকে–সন্তুষ্ট, ট্যুরিস্টরা তাদের জন্যে কোন হুমকি নয়।

কপ্টারটা আকাশে বিন্দু হয়ে যেতেই সবাই আবার সেলুনে ফিরে এল ওরা। ক্যামেরা থেকে ভিডিও টেপ বের করে ভিসিআর-এ ঢোকাল মুরল্যান্ড। জুম ফোকাস-এ পরিষ্কার দেখা গেল যে-লোকটা কপ্টার চালাচ্ছে তার মাথার চুল সোনালি, একটু দাড়ি আছে শুধু থুতনিতে, তার সঙ্গী ও কো-পাইলট একজন নিগ্রো।

'প্রতিপক্ষদের অন্তত একজোড়া মুখ চেনা গেল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

রিমোটের বোতাম টিপে ভিসিআর বন্ধ করে দিল গগল, ধীরেসুস্থে নকল চুল-দাড়ি খুলছে। 'এরপর কি?' জানতে চাইল সে।

'সন্ধ্যার পরপরই ছোট একটা ভেলা তৈরি করব আমরা, তাতে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করব, দূর থেকে দেখে যাতে মনে হয় ওটা একটা বোট,' পরবর্তী প্ল্যান ব্যাখ্যা করছে রানা। 'তারপর পাহাড় প্রাচীরের আড়াল নিয়ে অ্যাঞ্জেলিনাকে নিয়ে ফিরে যাব চ্যানেলের কাছে, তবে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় বসা গার্ডের দৃষ্টিপথের বাইরে থাকব। বোটটা ধরা পড়বে না, কারণ ভিডিওতে আমরা কোন রেডার ইকুইপমেন্ট দেখিনি।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল জিনা, উত্তেজিত।

'তারপর আমি আর ববি পানিতে নামব। সাঁতরে চ্যানেল পেরিয়ে লেগুনে ঢুকে দেখব কোথায় কি আছে। আমাদের ধারণা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, ওখানে যদি সী রবিনকে ক্যামাফ্লাজ নেটিং-এর ভেতর লুকানো দেখি, চুপিসারে চড়ব

ওটায়, কাবু করব হাইজ্যাকারদের, মুক্ত করব বিজ্ঞানী ও ক্রুদের, তারপর জাহাজ নিয়ে নও দো এগারা।'

'এই তোমার প্ল্যান?' মুরল্যান্ড এমনভাবে চোখ কুঁচকে আছে যেন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখছে।

'এই আমার প্ল্যান,' রানার গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল।

জিনাকে বজ্রাহত দেখাল। 'তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও! হাইজ্যাকাররা সবাই সশস্ত্র, সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের কম হবে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা মাত্র দু'জন লাগতে যাচ্ছ? এ তো স্রেফ মরার শখ!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'এরচেয়ে ভাল কোন প্ল্যান থাকলে দিক কেউ।'

'ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের নৌ-বাহিনীর স্পেশাল ফোর্সকে পাঠাতে বললে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল গগল। 'এদিকের বেশিরভাগ দ্বীপই তো ভারতের, কাজেই...'

'আন্দামান আর নিকোবর, এই মূল দ্বীপ দুটোর ওপর শুধু খেয়াল রাখে ভারতীয়রা,' বলল রানা। 'বাকিগুলোর কোথায় কি ঘটছে, তারা জানে না, জানতে চায়ও না। তাছাড়া, ভারত সরকার আমাদের কথা শুনবে কেন? শোনাতে হলে ওয়াশিংটন থেকে হোয়াইট হাউসকে তৎপর হতে হবে। সে অনেক সময়ের দরকার। আমার ধারণা, হাইজ্যাকাররা এখনও যদি ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সহ সী রবিনকে ডুবিয়ে না থাকে, আজ রাতের অন্ধকারে কাজটা করতে পারে। কাজেই সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষায় থাকাটা বোকামি হবে বলে মনে করি।'

'নিজেদের জীবন এভাবে বিলিয়ে দেয়া...এ আমি সমর্থন করতে পারি না।' জিনা এখনও বিমূঢ়।

'এর কোন বিকল্প নেই,' বলল রানা। 'সময় আমাদের অনুকূলে নয়।'

'অস্ত্র?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড; এত শান্ত ভাবে, যেন আইসক্রীমের দাম জিজ্ঞেস করছে।

'আত্মরক্ষার জন্যে অ্যাঞ্জেলিনায় একজোড়া অটোমেটিক রাইফেল রাখি আমি,' বলল গগল। 'কিন্তু পানির তলা দিয়ে এক মাইল টেনে নিয়ে যাবার পর ওগুলো বা ওগুলোর অ্যামো কতটুকু কাজ করবে তা আমি বলতে পারব না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'তবে সঙ্গে অত ভারী জিনিস নিয়ে সাঁতরাতে চাই না। তাছাড়া, অস্ত্র সম্পর্কে মাথা ঘামাব যখন প্রয়োজন হবে।'

'ডাইভ ইকুইপমেন্ট লাগবে তো? আমার কাছে ভরা এয়ার ট্যাংক আছে চারটে, দুটো আছে রেগুলেটার।'

'ইকুইপমেন্ট যত কম হয় ততই ভাল। তীরে পৌঁছানোর পর ডাইভ ইকুইপমেন্ট ঝামেলায় ফেলবে আমাদের। লেগুনে আমরা স্নরকেল নিয়ে ঢুকব। অন্ধকারের ভেতর বিশ ফুট দূর থেকেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'দূরত্ব কিন্তু কম নয়,' বলল গগল। 'আমি যেখানে বোট থামাব সেখান থেকে লেগুনের ভেতরটা এক মাইলেরও বেশি হবে।'

'যতই দূর হোক, মাঝরাতের মধ্যে পৌঁছাতে পারব না?' মুরল্যান্ড বিড়বিড় করল।

'আমি তোমাদের সময় দু'ঘণ্টা কমিয়ে দিতে পারি,' বলল গগল।
ঘাড় ফেরাল রানা। 'কিভাবে?'
'আমার কাছে একটা ডাইভ থ্রাস্টার আছে, পানির ওপর দিয়ে ওটা তোমাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে।'
'এটা খুব কাজ দেবে, ধন্যবাদ।' কতটুকু কি সাহায্য নিচ্ছে খুঁটিয়ে সব মনের খাতায় লিখে রাখছে রানা। অন্তত ওর এই অদ্ভুত বন্ধুর ব্যাপারে এই হিসাবটা রাখতেই হয়–যে যতটা সাহায্য পাবে, সে তারচেয়ে একটু হলেও বেশি করে প্রতিদান দেবে।
'তোমাদের ঠেকাবার সত্যি কোন উপায় নেই?' মনে হলো জিনা নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। রাগে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।
তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। হাসছে। 'তুমি সব কথা জানো না, তাই এত ভয় পাচ্ছ। আমরা, আমি আর ববি, বাধ্য হলে এরচেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে বহু কাজ করেছি। এই কাজটাও না করে উপায় নেই আমাদের। চ্যানেলের মুখে সিকিউরিটি ফ্যাসিলিটি থাকত কি, যদি না কেউ ভেতরে কিছু লুকাতে চায়? জিনিসটা সী রবিন কিনা দেখে আসতে হবে আমাদের।'
'আর যদি তোমার ধারণা ভুল হয়?'
হাসিটা রানার মুখ থেকে যেন দপ্ করে মুছে গেল। 'ভুল হয়ে থাকলে সী রবিনের ওরা সবাই মারা যাবে আমরা ওদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হওয়ায়।'

বারো

সূর্য ডোবার পরপরই কাজ শুরু করে দিল ওরা। নারকেল গাছের বেশ অনেকগুলো কাণ্ড এক করে তিনজন লোকের একটা ভেলা বানাতে সময় লাগল দু'ঘণ্টা, কুড়িয়ে আনা গাছের ডালপালা দিয়ে ভেলাটাকে অ্যাঞ্জেলিনার কাছাকাছি একটা আকৃতি দিতে আরও লাগল ঘণ্টা খানেক। কাঠামোয় ব্যাটারিচালিত এক সারি আলোও ফিট করা হলো। সবশেষে ভেলাটাকে রশি দিয়ে আটকানো হলো ইয়টের একপাশে, সৈকত-এর দিকটায়।
'অনুমতি দিলে বলতে পারি, এঞ্জিন লাগালে আমরা একটা দ্বিতীয় অ্যাঞ্জেলিনা পেয়ে যাব,' বলল গগল। 'গিনিস বুকে নাম ওঠাবার জন্যে এই ভেলা নিয়ে ভারত, আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে।'
গগলের এরকম প্রলাপে কান না দেয়ার ভান করে রানা, কারণ জানে উৎসাহ দিলে বা চ্যালেঞ্জ করলে কাজটা করে দেখাতে চাইবে সে, কারও বাধা মানবে না।
'আপাতত এটা যদি পাঁচ মাইল দূরে বসা সিকিউরিটি গার্ডকে ফাঁকি দিতে পারে, তাতেই আমি খুশি।' এক আঁজলা পানি তুলে মুখ আর ঘাড় ভেজাল রানা, গরমে সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে। 'আমরা যখন ভেলার আলো জ্বালব, ঠিক তখনই

ইয়টের আলো নেভাব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাঞ্জেলিনার এঞ্জিন স্টার্ট নিল। বোট ছেড়ে দিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে উইঞ্চ চালু করল গগল, পানি থেকে নোঙর তুলে নেবে ওটা। তারপর একই সময়ে ভেলার আলো জ্বলল আর ইয়টের আলো নিভল। জ্বলমগ্ন প্রবাল চূড়াকে পাশ কাটিয়ে এল গগল, একটা চোখ রেখেছে ডেপথ্ সাউন্ডারে।

সেন্টিনেল থ্রী-র দিকে এগোচ্ছে সে রেডার-এর সাহায্যে, সতর্ক চোখে দেখছে পিছনে ফেলে আসা আলোড়িত পানিতে কোন উজ্জ্বলতা বা চকচকে ভাব ফুটছে কিনা। স্পীড দশ নটের বেশি তুলল না, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল তারাজ্বলা আকাশে চাঁদটা না থাকায়।

জিনাকে সঙ্গে নিয়ে হেল্ম্ স্টেশনে ঢুকল রানা। জিনা অপারেশন থেকে নিজের নাম কাটিয়ে গ্যালিতে বসে ওদের জন্যে নাস্তা তৈরি করেছে। ট্রে থেকে নিয়ে সবার হাতে একটা করে প্লেট ধরিয়ে দিল সে, তারপর মুরল্যান্ডের পাশে বসল।

মুরল্যান্ড হেডফোন পরেছে, সিকিউরিটি গার্ড পরামর্শ করার সময় যে কর্কশ গলা রেকর্ড করা হয়েছে সেটা নকল করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখছে।

চার্টে দ্বীপটার চারদিকে পানির গভীরতা উল্লেখ করা আছে, সেদিকে একটা চোখ রেখে পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় জ্বলা আলোর বিন্দুটা লক্ষ্য করে বোট চালাচ্ছে গগল। 'চ্যানেলের ঠিক সামনে ঝুল-পাথর আছে, ওই পাথরটার নিচে থামব আমি,' বলল সে। 'পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে ফেনা তৈরি হচ্ছে, সেই জমা ফেনা আবার আছড়ে পড়ছে পাঁচিলে, কাজেই শান্ত সাগরে না পৌছানো পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকবে তোমরা।'

একটা জানালা খুলল সে, নিরেট পাথরে সফেন ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জনটা সবাই ওরা শুনতে পেল।

ঝুল-পাথুরে নিচে ও পিছনে পৌছে গেছে ওরা, সিকিউরিটি গার্ডের আলোটা এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ফেনা একটা রেখা তৈরি করেছে পানিতে, রেখাটার সামনে সাগর একদম শান্ত। স্পীড নেই বললেই চলে, স্রোতের টানে ধীরগতিতে ভেসে চলেছে অ্যাঞ্জেলিনা, এঞ্জিন কোন শব্দ করছে না। রানার দিকে তাকাল গগল, চোখের ভাষায় লেখা রয়েছে, 'আইডিয়াটা ভাল নয়, হে।' তবে মুখে কিছুই বলল না, জানে যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা থেকে রানাকে বিচ্যুত করা অসম্ভব—যেহেতু সিদ্ধান্তটা যুক্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

ডেপথ্ সাউন্ডার রীডিং থেকে জানা গেল অ্যাঞ্জেলিনার জোড়া খোলের তলা থেকে সাগরের মেঝে মাত্র পনেরো ফুট নিচে। তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে উইঞ্চ সচল করল গগল, পানিতে নেমে গেল নোঙর।

রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমার সীমা এই পর্যন্ত।'

'কতক্ষণ থাকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইচ্ছে তো আছে যতক্ষণ না ফেরো অপেক্ষা করব,' বলল গগল। 'কিন্তু তিনঘণ্টা বিশ মিনিট পর ভাটা শুরু হলে তীর থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে বোট নিয়ে, তা না হলে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে যেতে পারে ওটা।

আবার তীর থেকে দূরে সরে গেলে পাহাড়ের মাথা থেকে গার্ড দেখে ফেলবে। সেক্ষেত্রে দ্বীপটার পিছন দিকে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'অন্ধকারে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব কিভাবে?'

'বিভিন্ন ধরনের শব্দে মাছেদের কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় জানার জন্যে আমার কাছে কিছু যন্ত্রপাতি আছে, তারমধ্যে একটা হলো আন্ডারওয়াটার রেডিও ট্র্যান্সমিটার। দু'ঘণ্টা পর আমি মাইকেল জ্যাকসনের একটা গান বাজাব।'

মুরল্যান্ড অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'আপনি বলতে চাইছেন মাইকেলের গান হাঙররাও পছন্দ করে?'

'জানি না কেন, শুধু হাঙররাই ওর গান পছন্দ করে না।'

ধার পাওয়া ফিন আর মাস্ক পরে নিল মুরল্যান্ড ও রানা। স্টার্ন ল্যাডার নিচে নামিয়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল গগল। 'থ্রাস্টার-এর ব্যাটারি অকারণে খচর কোরো না,' বলল সে। 'চ্যানেলের মুখে অপেক্ষা করলেই ঢেউ এসে ভেতরে নিয়ে যাবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ভারী গলায় বলল, 'গুড লাক। যতক্ষণ পারি অপেক্ষা করব আমি।'

উষ্ণ, কালো কালির মত পানিতে সামান্য ছিটা তুলে নামল ওরা, সাঁতরে ইয়টের কাছ থেকে খানিকটা দূরে চলে গেল, রানাকে অনুসরণ করছে মুরল্যান্ড। একশো ফুট আসার পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অ্যাঞ্জেলিনা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। পানির ওপর কব্জি তুলে ফ্লুওরেসেন্ট কাঁটা আর ডিগ্রি মার্কিং দেখল রানা গগলের ধার দেয়া কম্পাসে। মুরল্যান্ডের মাথায় টোকা দিয়ে ইঙ্গিতে দূরের একটা দিক দেখাল। থ্রাস্টার-এর সুইচ যখন অন করা হলো, রানার পা দুটো দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে মুরল্যান্ড। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল মোটর, পানির ওপর দিয়ে ঘণ্টায় তিন নট গতিতে ওদেরকে টেনে নিয়ে চলল জেটগুলো।

দিক নির্ণয়ে সাহায্য করছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়া সফেন ঢেউ আর কম্পাসটা। প্রতিটি ঢেউ বজ্রপাতের শব্দ তুলে ভাঙছে। অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই পাথরের পাঁচিল একশো গজ দূরে নাকি দুশো।

তারপর রানার কানে দু'ধরনের গর্জন আলাদাভাবে ধরা পড়ল, জানিয়ে দিল চ্যানেলের উল্টোদিকেও আঘাত করছে ঢেউ। থ্রাস্টার ঘোরাল ও, এখন দ্বীপের দিকে ছুটছে ওরা, ঢেউ ভাঙার শব্দ ডান ও বাঁ দিক থেকে আসছে–সামনে থেকে নয়। এরপর, গগলের পরামর্শ মত, থ্রাস্টার অফ করে দিল ও, চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ওদেরকে বহন করে নিয়ে যাবার কাজটা ছেড়ে দিল একের পর এক ছুটে আসা ঢেউগুলোর ওপর। নিচের দিকে মুখ করে শুধু পড়ে থাকো, পা দুটো দু'পাশে মেলে দাও, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলুক স্নরকেলের মাধ্যমে। থ্রাস্টারকে ধন্যবাদ, এতটুকু ক্লান্ত হয়নি ওরা। পা ছেড়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এসেছে মুরল্যান্ড।

পাহাড়ের মাথায় ওরা কোন গার্ডকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকার এত গাঢ় যে পাহাড়ের মাথাই ঠিক মত দেখা যাচ্ছে না। কাজেই ওখানে যদি কেউ থাকেও, নিচের পানিতে সে-ও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

তবে লেগুনের চারধারে হাইজ্যাকাররা গার্ড রাখলে বিপদ হবে, ভাবল রানা।

প্রশ্ন হলো লোকগুলো সিকিউরিটি সম্পর্কে কতটুকু সচেতন আর সাবধান দ্বীপটাকে ঘিরে থাকা পাহাড়-প্রাচীরের ওপর রাতের অন্ধকারে নজর রাখা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এবড়োখেবড়ো, ধারাল পাথরে হাঁটাহাঁটি করে ঘন জঙ্গলের ওপর চোখ রাখাও তাই। রানা প্রায় নিশ্চিত, পাহারাদার বলতে একজনই, চ্যানেলের প্রবেশপথের মাথায় সে-ই গার্ডটা।

প্রায় পনেরো মিনিট পর মাথার ওপর উন্মোচিত হলো ঝাঁক ঝাঁক তারা, উঁচু পাহাড়-প্রাচীরের নিচ দিয়ে খোলা লেগুনে ঢুকছে ওরা। সৈকতের দিকে থ্রাস্টার ঘোরাল রানা. মোটর চালু রাখল পায়ের নিচে বালি না পাওয়া পর্যন্ত।

সৈকতে এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হতে পারে এই দ্বীপে মানুষ বাস করে, তবে লেগুন কিন্তু খালি নয়। শান্ত পানির ঠিক মাঝখানে দুটো ভেসেল নোঙর ফেলেছে পাশাপাশি। ওগুলোর আকৃতি ও আউট লাইন অন্ধকারে অস্পষ্ট। নিষ্প্রভ আলো আসছে শুধু পোর্টগুলো থেকে। রানা ঠিকই সন্দেহ করেছিল—ক্যামাফ্লাজ নেটিং দিয়ে দুটো জাহাজকেই ঢেকে রাখা হয়েছে। কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না জাহাজ দুটোর একটা সী রবিন কিনা।

'ফেইস মাস্ক খুলে ফেলো,' নিচু গলায় মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'আমাদের লেন্সে লাগলে আলো ঠিকরাবে।'

সৈকতে থ্রাস্টার রেখে বড় আকারের জাহাজটার দিকে সাঁতরাচ্ছে ওরা। ওটা চ্যানেলের দিকে মুখ করে নোঙর ফেলেছে। বো-টা ভারি সুন্দর, ভাবটা যেন পিছন দিকে একটু হেলান দিয়ে আছে—ঠিক সী রবিনের মত। তবে ওদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফিন খুলে মুরল্যান্ডের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, তারপর নোঙরের চেইন ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল। চেইনটা ভেজা ভেজা, তবে মরচে ধরেনি, গায়ে মাটিও জমে নেই। জাহাজের হোয পাইপ বরাবর উঠে থামল রানা, দম নিচ্ছে। পুরো এক মিনিট ঝুলে থাকল ওখানে।

খোলা একটা পোর্টহোল থেকে আলো বেরুচ্ছে। বো-তে ওয়েল্ড করা হরফগুলো কোন রকমে পড়তে পারল রানা।

সী রবিন।

বো গানল-এর ওপরের কিনারা থেকে দশ ফুট নিচে হোয পাইপটা। রশি ও হুক ছাড়া কোনভাবেই ফোরডেকে উঠতে পারবে না ওরা। চেইন ধরে ঝুলতে ঝুলতে খানিকটা নিচে নেমে এসে ফিসফিস করল রানা, 'সী রবিনই।'

আনন্দ চেপে রাখার জন্যে একটা ঢোক গিলল মুরল্যান্ড। 'মই বা গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ছাড়া ওপরে উঠব কিভাবে?'

'তুমি বলো।'

'তুমি থাকতে আমি কোন দুঃখে মাথা ঘামাতে যাই! আমি জানি বিকল্প একটা কিছু তুমি ভেবে রেখেছ।'

'তা রেখেছি।' অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসছে রানা।

'দুঃসংবাদটা শোনাও।'

এখন রানা হাসছে না। 'হাইজ্যাকারদের জাহাজটা ছোট,' বলল ও। 'ওটার

স্টার্নে ওঠা বোধহয় কঠিন হবে না। তারপর ওখান থেকে সী রবিনে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।'

জলদস্যুদের জাহাজে কামান বা কোন মেশিন গান দেখা গেল না। একশো পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা একটা ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট এটা, স্টার্ন শুধু যে নিচু তা নয়, ওপরে ওঠার পর ডাইভার'স বোর্ডিং ল্যাডার আর ছোট একটা প্ল্যাটফর্মও পেয়ে গেল ওরা।

'মাথায় মারার জন্যে একটা ডাণ্ডা বা রড পেলে খুশি হতাম,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড। 'খালি হাতে নিজেকে ঠিক স্মার্ট লাগছে না।'

'চুপ।'

'আচ্ছা, চুপ।'

স্টার্ন রেইলিং টপকাতে যাচ্ছে রানা, ওর কনুইয়ের ওপর মাংসে মুরল্যান্ডের নখ ডেবে গেল। 'কি হলো?' কনুইয়ের ওপরটা ডলছে ও।

'আফট্ ডেকহাউসের ছায়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় সিগারেট খাচ্ছে,' রানার কানে কানে বলল মুরল্যান্ড।

মাথাটা সাবধানে তুলে ওঅর্ক ডেকের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। মুরল্যান্ডের বিস্ময়কর দৃষ্টিশক্তিকে ফাঁকি দেয়া যায়নি। অন্ধকারে কোন রকমে ছায়ামূর্তিটাকে দেখা যাচ্ছে, রেইলিং-এর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু হাত ওঠা-নামার অস্পষ্ট ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় লোকটা সিগারেট খাচ্ছে। তাকে সতর্ক বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। বরং মনে হলো নিজের কোন চিন্তায় মগ্ন।

শিকারী বিড়ালের মত এগোল মুরল্যান্ড। জানে নারকেল গাছের পাতায় বাতাস লাগায় যে শব্দ হচ্ছে তাতে চাপা পড়ে যাবে তার শরীর থেকে ঝরে পড়া পানির আওয়াজ। পিছন থেকে লোকটার গলা চেপে ধরল তার লোহার মত শক্ত হাত। সামান্যই ধস্তাধস্তি হলো। হাইজ্যাকারের অজ্ঞান শরীরটা টেনে স্টার্নের কাছে নিয়ে এল মুরল্যান্ড, লুকিয়ে রাখল বড় একটা উইঞ্চের পিছনে।

লোকটাকে সার্চ করে বড় একটা ফোল্ডিং নাইফ আর একটা পিস্তল পেল রানা, নাকটা ভোঁতা। 'এবার তুমি স্মার্ট হতে পারো।'

'ব্যাটা এখনও নিঃশ্বাস ফেলছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'কি করা যায়?'

'বোর্ডিং প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিলে কেউ সহজে দেখতে পাবে না,' বুদ্ধি দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটাকে অনায়াসে তুলল মুরল্যান্ড, রেইলিং টপকে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল। লোকটা গড়াল, তবে পানিতে পড়ল না।

'অন্তত ঘণ্টাখানেক যেন জ্ঞান না ফেরে।'

'ফিরবে না।' অন্ধকারে খোলা ডেকের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মুরল্যান্ড। 'সংখ্যায় কত হতে পারে হাইজ্যাকাররা?'

'এ-ধরনের বোটে ক্রু থাকে পনেরোজন,' বলল রানা। 'প্যাসেঞ্জার ধরবে একশোরও বেশি।' মুরল্যান্ডের হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিল ও।

'আমি পিস্তলটা কেন পাব না?' অভিযোগের সুরে জানতে চাইল মুরল্যান্ড, ছুরিটা পরীক্ষা করছে।

'তুমি ফেন্সিং পছন্দ করো।'

'ওই খেলায় তো তলোয়ার ব্যবহার করা হয়।'

'ভান করো তোমার হাতে ওটা তলোয়ারই।'

আর কোন কথা হলো না, কার্গো আর ওঅর্ক ডেক পার হয়ে আফট্ বাল্কহেডের হ্যাচের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এয়ারকন্ডিশনিং-এর পুরো সুবিধে পাবার জন্যে হ্যাচ ডোর বন্ধ রাখা হয়েছে। ওখান থেকে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে এগোল ওরা, দুটো জাহাজের মাঝখানে ফেলা। একটা পোর্টের ভেতর আলো জ্বলতে দেখে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল রানা।

বড় একটা মেস রুমে অনেকগুলো লোক বসে তাস পিটছে বা টিভি দেখছে। গুণে দেখা গেল-হাইজ্যাকাররা এখানে বাইশজন। এক কোণে জড়ো করা যে-সব অস্ত্র রয়েছে, একটা বিপ্লব শুরু করার জন্যে যথেষ্ট। কাউকে এতটুকু উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত মনে হচ্ছে না, কেউ এমন কি সতর্কও নয়। বন্দিরা পালিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ও করছে বলে মনে হলো না। সবাই হাসিখুশি, নিরুদ্বিগ্ন। এদের হাতে পঞ্চাশজন লোক জিম্মি হয়ে আছে? বিশ্বাস করা কঠিন।

তাহলে কি সী রবিনের ক্রু আর বিজ্ঞানীরা কেউ বেঁচে নেই?

'এদেরকে আমি বোম্বেটে বলব না,' রানার পর মুরল্যান্ডও দেখল লোকগুলোকে, তারপর মন্তব্য করল। 'অন্তত পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে প্রফেশনাল মার্সেনারি বলে মনে হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। মার্সেনারিদের নিজেদের জাহাজে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। ছয় বুলেটের একটা পিস্তল আর একটা ছুরি দিয়ে বাইশজন সশস্ত্র ভাড়াটে সৈনিককে কাবু করা সম্ভব নয়। ওদের প্রথম কাজ নিশ্চিত হওয়া যে সী রবিনের কেউ বেঁচে আছে কিনা।

আবার ডেক ধরে এগোচ্ছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। পাশে মুরল্যান্ডও স্থির হয়ে গেল। ফিসফিস করল অন্ধকারে। 'কিছু দেখেছ?'

রঙ করা চওড়া একটা কার্ডবোর্ড দেখাল রানা, সুপারস্ট্রাকচারের গায়ে যেনতেন ভাবে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে। 'চলো দেখি কি লুকাতে চায় ওরা।'

নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে ডাক্ট টেপ খুলল রানা, এই টেপই কার্ডবোর্ডটাকে সুপারস্ট্রাকচারের ধাতব সাইড-এ আটকে রেখেছে। কার্ডবোর্ডের একটা প্রান্ত উঁচু করতেই পোর্টহোল থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দেখা গেল প্রতীক চিহ্নটা—একজোড়া শ্যেন পাখি, পরস্পরের মুখোমুখি ডালে বসে আছে। নিচে লেখা 'ফ্যালকন'। ফ্যালকন মানে বাজপাখি, কিন্তু এই নামে কোন জাহাজ কোম্পানি আছে কিনা রানার জানা নেই। কার্ডবোর্ডটা জায়গা মত বসিয়ে আবার টেপ লাগিয়ে দিল ও।

'কিছু দেখলে?'

'শিকারি বাজপাখি।'

সরু ধাতব গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পার হয়ে সী রবিনে চলে এল ওরা, আশঙ্কা করছে গাঢ় ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ওদের শরীর বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেবে প্রহরী হাইজ্যাকাররা।

সার্ভে শিপের ডেকে কোন বিপদ ছাড়াই পৌঁছাল, ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের জাহাজ এটা, প্রতি ইঞ্চি চেনা। ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'তুমি চাও দু'জন দু'দিকে যাই?'

'না,' ফিসফিস করল রানা। 'একসঙ্গে থাকি। চলো, পাইলটহাউস থেকে সার্চ শুরু করি।'

বাইরের দিকের সিঁড়ি বেয়ে পাইলটহাউসে ওঠা যেত, কিন্তু মেস রূম থেকে হাউজ্যাকারদের কেউ বেরুলে দেখে ফেলবে, এই ভয়ে হ্যাচ গলে একটা কম্প্যানিয়নওয়ে ধরল ওরা, চারটে ডেক হয়ে পাইলটহাউসে পৌঁছাল। ভেতরটা অন্ধকার ও খালি পেল ওরা। কমিউনিকেশন রূমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, বাইরে পাহারায় থাকল মুরল্যান্ড।

গ্লোবস্টার ফোন তুলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সেল ফোনের নাম্বার টিপল রানা। যোগাযোগ ঘটতে চলেছে, এই ফাঁকে ডোক্সাডাইভ রিস্টওয়াচের কমলা ডায়ালে চোখ বুলাল। দশটা বেজে দু'মিনিট। ওয়াশিংটনে এখন সকাল ন'টার কিছু বেশি, নুমা চীফ সম্ভবত অফিসের পথে রয়েছেন।

তাঁর সাড়া পেয়ে সী রবিনকে খুঁজে পাবার খবরটা সংক্ষেপে জানাল রানা।

'আমার ক্রু আর সায়ান্টিফিক টীম?' উদ্বিগ্ন অ্যাডমিরালের প্রথম প্রশ্ন, ওরা যেন তাঁর পারিবারিক আপনজন।

'এ-ব্যাপারে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'ভাল কোন খবর হলে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন।'

কমিউনিকেশন রূম থেকে বেরিয়ে এল ও। 'কিছু দেখলে বা শুনলে?'

'না। এটা যেন একটা কবরস্থান।'

'এরকম শব্দ ব্যবহার কোরো না তো!' তিরস্কার করল রানা।

পাইলটহাউস থেকে পরবর্তী ডেকে নেমে এল ওরা। এখানেও সেই একই দৃশ্য। সবগুলো স্টেট রূম আর হসপিটাল মর্গের বডি ট্রে-র মত নিস্তব্ধ। নিজের স্টেট রূমে ঢুকে একটা দেরাজ হাতড়াবার সময় ওয়ালথার পিস্তলটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পেয়ে খুশি হলো রানা, তবে অবাকও কম হলো না। ওটা নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল, হাইজ্যাকারের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ডের হাতে। এরপর একটা পেনলাইট খুঁজে নিয়ে কামরার চারদিকে আলো ফেলল ও। ওর কোন জিনিসই নাড়াচাড়া করা হয়নি। মাত্র একটা জিনিস যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা ক্লজিটের ভেতর রেখে গিয়েছিল, সেটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর।

মুরল্যান্ডের কামরাতেও কেউ তেমন কিছু নাড়াচাড়া করেনি।

'লোকগুলোর কোন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'মূল্যবান জিনিস-পত্র চুরি করে না, এমন বোম্বেটেদের কথা কেউ কোন কালে শুনেছে?' প্যাসেজওয়ে-তে আলো ফেলল রানা। 'চলো এগোই।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে আরেক ডেকে নেমে এল ওরা। এখানে আরও আটটা স্টেট রূম, মেস রূম, গ্যালি, কনফারেন্স রূম আর লাউঞ্জ রয়েছে। মেস টেবিলে

এঁটো খাবার সহ এখনও পড়ে রয়েছে প্লেটগুলো, খাবার পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। টেবিলে ও কাউচে ছড়িয়ে রয়েছে ম্যাগাজিন, যেন কিছুক্ষণ আগে ফেলে গেছে পাঠকরা। কনফারেন্স রূমের অ্যাশট্রেতে ফিল্টার পর্যন্ত পুড়ে ছাই হওয়া সিগারেট পাওয়া গেল। ঘুরেফিরে দেখার পর একটা সন্দেহই জাগে মনে, জাহাজের সমস্ত লোককে মন্ত্রবলে কেউ যেন বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছে।

এঞ্জিন আর জেনারেটিং রূমে নেমে আসার সময় কোথাও কোন সিকিউরিটি গার্ড না দেখে রানা বিশ্বাস করতে শুরু করল সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটাই বোধহয় ঘটে গেছে। বন্দিদের ওপর নজর রাখার জন্যে অবশ্যই পাহারা বসাবে হাইজ্যাকাররা, জাহাজে আদৌ যদি বন্দি করে রাখার মত কেউ থাকে। তারপর, কোথাও এতটুকু আলো নেই। গার্ডরা গাঢ় অন্ধকারে ডিউটি দেবে না।

মনে ক্ষীণ আশা জাগল এঞ্জিনিয়ারিং-ডেক স্টেট রূমগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময়। ওরা দেখল চীফ এঞ্জিনিয়ার-এর অফিসে আলো জ্বলছে।

'অবশেষে,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড, 'কারও তাহলে আলো দরকার হয়েছে।'

প্যাসেজওয়ে-এর শেষ মাথায় এঞ্জিন আর জেনারেটিং রূমের দরজা। বাল্কহেড বরাবর পরস্পরের উল্টোদিকে পজিশন নিল ওরা, তারপর অত্যন্ত সাবধানে দরজাটার দিকে এগোল। এমন কি দশ ফুট দূরে থেকেও অস্পষ্ট ফিসফিসানি শুনতে পেল ওরা। পলকের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইস্পাতের দরজায় কান ঠেকিয়ে শুনতে চেষ্টা করল রানা। উত্তেজিত গলা, হুমকির সুর। আবার মাঝে মধ্যে হাসাহাসির আওয়াজও।

লম্বা ধাতব দরজাটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করল রানা। কোন শব্দ ছাড়াই নড়ল কবাট। গলার আওয়াজ এখন আরও পরিষ্কার। ফাঁকে চোখ রেখে ভেতরে তাকাল ও। লোক সংখ্যা চার। অন্তত আর কাউকে দেখছে না। দু'জন অচেনা। বাকি দু'জন অতি পরিচিত। বুকের ভেতর রানার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। ওরা চারজন অলস গল্পে মশগুল নয়। অচেনা লোক দু'জন বাকি দু'জনকে ভয় দেখাচ্ছে।

'আর খুব বেশি দেরি নেই, হাড়ে হাড়ে টের পাবে ডুবে মরতে কেমন লাগে।'

'আর্কটিকে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, সেই ঘুম আর ভাঙে না,' তার সঙ্গী সহাস্যে বলছে। 'ডুবে মরাটা কিন্তু অত আরামের নয়। মনে হবে তোমাদের মাথার ভেতর গাদা-গাদা পটকা ফাটছে। মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে চোখ। কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। ফুসফুসগুলোকে মনে হবে নাইট্রিক অ্যাসিডে চোবানো হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই একটা অসুস্থ বাঁদর!' ক্যাপটেন শেফার্ডের উত্তেজিত গলা।

'ভদ্রমহিলাদের সামনে যেভাবে কথা বলছ,' বললেন চীফ এঞ্জিনিয়ার ফ্রাঙ্ক গার্ডনার, 'এ থেকেই বোঝা যায় তোমরা নেহাতই একদল জানোয়ার।'

'এই, কর্ক, কথাটা কি সত্যি–তুই একটা জানোয়ার?'

'গত হপ্তা পর্যন্ত ছিলাম না।'

এরপর দুজন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'আমাদের খুন করো,' বললেন শেফার্ড, 'দুনিয়ার সেরা সব ইনভেস্টিগেটিভ ফোর্স ঠিকই তোমাদের খুঁজে বের করবে, অন্তত দুশো বছর করে জেল হবে...'

'চোপ, ব্যাটা হাঁদারাম!' হাইজ্যাকারদের একজন খেঁকিয়ে উঠল। 'একজন লোকের আয়ু কত যে দুশো বছরের জেল দেবে?'

'আমরা কি তোমাদের ডুবিয়ে মারার প্রমাণ রাখব?' জিজ্ঞেস করল যার নাম কর্ক।

'হাজার হাজার জাহাজ লোকজন সহ সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে গেছে, তোমাদের এটাও সেগুলোর তালিকায় স্থান পাবে।'

'প্লীজ!' দরজার ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে চিনতে পারল গলাটা একজন মহিলা বিজ্ঞানীর। 'আমাদের প্রত্যেকের আপনজন আছে বাড়িতে। এরকম ভয়ংকর একটা ঘটনা কেন আপনারা ঘটাবেন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি।'

'দুঃখিত, লেডি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কর্ক। 'যারা আমাদের বেতন দেয় তাদের কাছে তোমাদের এক কানাকড়িও দাম নেই। আমরা হুকুমের চাকর, জানি শুধু নির্দেশ পালন করতে। খারাপ কি ভাল, সে বিচার করার আমরা কেউ নই।'

'তোমরা প্রফেশনাল খুনী!' গর্জে উঠলেন ক্যাপটেন শেপার্ড।

'কথাটা চিৎকার করে বলবার কি দরকার?' কর্ক হাসছে। 'আমরা নিজেরাই তো স্বীকার করছি। সত্যি আমরা ভাড়াটে খুনী।'

কর্কের সঙ্গী বলল, 'আমাদের ক্রুরা আর আধঘণ্টা পর আসবে।' একটু থেমে রানার দৃষ্টিপথের বাইরে তাকাল সে। 'ওরা আসার দু'ঘণ্টা পর তোমরা নুমারা সাগরের গভীর তলায় পৌঁছে যাবে, নিজ গুণে বেঁচে থাকতে পারলে মূল্যবান গবেষণা চালাতে পারবে ওখানে...'

হ্যাচের সরু ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পাচ্ছে হাইজ্যাকারদের হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক উইপন রয়েছে। মুরল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে বাড়ল ও। দরজা খুলে দু'জন একসঙ্গে ভেতরে ঢুকল।

হাইজ্যাকাররা তাদের পিছনে নড়াচড়ার শব্দ পেয়েও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না, ধরে নিয়েছে নিজেদের সঙ্গীরা পৌঁছে গেছে। বন্দিদের ওপর কড়া নজর রেখে কর্ক বলল, 'তোমরা আগেই চলে এসেছ। এত তাড়াহুড়োর কি কারণ?'

'হুকুম পেয়েছি ডানকান প্যাসেজ ছেড়ে দশ ডিগ্রী চ্যানেলের দিকে যেতে হবে,' বলল মুরল্যান্ড, সুর নকল করছে যে হাইজ্যাকারের গলা কর্কশ ঘর্ঘরে।

'খেল খতম!' হেসে উঠল কর্ক। 'সকল নুমা ভাই ও বোনেরা, এবার তোমরা ফাইনাল প্রার্থনা শুরু করতে পারো। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন...'

'বড় বেশি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে!' দু'হাত দিয়ে তার মাথা ধরে শূন্যে তুলল মুরল্যান্ড, ছুঁড়ে দিল একটা বাল্কহেডে। ওই একই সময়ে দ্বিতীয় লোকটার খুলির মাঝখানে পিস্তলের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল রানা।

পরমুহূর্তে উৎসব। ওরা যেন একটা পার্টি দিচ্ছে। অভাব শুধু বেলুন আর শ্যাম্পেনের।

সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানী সবাই ওরা উপস্থিত এখানে। জাহাজের জেনারেটারগুলোকে ঘিরে মেঝেতে বসে রয়েছে সবাই, সেই আগেকার দিনের

ক্রীতদাসদের মত শিকল দিয়ে বাঁধা। একটাই শিকল, প্রত্যেকের পায়ে পরানো আংটার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে মেইন জেনারেটারের মাউন্টিং-এ জড়িয়ে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। এক এক করে মাথা গুণছে রানা, যে-দু'জন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিল তাদেরকে দেখে বাকি সবাই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। শেফার্ড, গার্ডনার সহ বিজ্ঞানীদের দেখে মনে হলো তাঁরা যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন। তারপর তাঁরা সিধে হয়ে দাঁড়াতে শুরু করলেন, আনন্দে-উল্লাসে ফেটে পড়তে যাচ্ছেন।

'কোন শব্দ নয়!' নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। 'অস্ত্র নিয়ে সবাই ওরা ছুটে আসবে এখুনি।'

'আপনারা কোত্থেকে?' নিচু গলায় জানতে চাইলেন ক্যাপটেন শেফার্ড।

'রানার এক বন্ধুর ইয়ট পৌঁছে দিয়েছে,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'সে আবার অন্য এক গল্প।' চীফ এঞ্জিনিয়ার গার্ডনারের দিকে তাকাল। 'চেইন কাটার মত কিছু আছে?'

ইঙ্গিতে একটা সাইড কম্পার্টমেন্ট দেখালেন গার্ডনার। 'টুল রূমে ঢুকে দেখবেন বাল্কহেডে একজোড়া কেইবল্ কাটার ঝুলছে।'

'প্রথমে ক্রুদের মুক্ত করো,' মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'হাইজ্যাকাররা চলে আসার আগেই জাহাজ ছেড়ে দিতে চাই আমি।'

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এসে ঝড়ের বেগে শিকল কাটতে শুরু করল মুরল্যান্ড। আউটার ডেকে বেরিয়ে এসে রানা নিশ্চিত হলো, ওদের উপস্থিতি এবং ক্রুদের মুক্তি বাকি হাইজ্যাকারদের কাছে এখনও অজানা ঘটনা। বোম্বেটেদের জাহাজের ডেক এখনও খালি। স্যাটেলাইট টিভি আর তাস নিয়ে মেতে আছে সবাই, আন্দাজ করল রানা; ক্ষুধার্ত হায়েনার মত এই প্রত্যাশায় খুশিতে বাগ্ বাগ্ যে লোকজন সহ সী রবিনকে সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে।

ফিরে এসে রানা দেখল চীফ গার্ডনার আর তাঁর ক্রুরা এরইমধ্যে মেইন কন্ট্রোল স্টেশনে পৌঁছে গেছে. জাহাজ ছাড়ার প্রস্তুতিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'এখানেই আপনাদের ছেড়ে যাচ্ছি আমি,' ক্যাপটেন শেফার্ডকে বলল ও।

শেফার্ডকে বোকা বোকা লাগল। এমন কি মুরল্যান্ডও ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

'চ্যানেলে ঢোকার মুখে, পাহাড়ের মাথায়, একটা গার্ডহাউস আছে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ওখানে যে গার্ডটা আছে তার কাজ শুধু নজর রাখা নয়। তার কাছে এত বেশি ফায়ারপাওয়ার আছে, লেগুন থেকে কোন জাহাজ বেরুবার চেষ্টা করলে অনায়াসে ঠেকিয়ে দিতে পারবে সে।'

'এই ধারণা তোমার হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'যে জানে না সে ভাববে হাইজ্যাকাররা একটা ফুলবাগান পাহারা দিচ্ছে,' বলল রানা। 'দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে পঞ্চাশজন বন্দিকে, বাকি সবাই তাস পিটছে, টিভি দেখছে আর বিয়ার খাচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ হলো তারা জানে ক্রুরা সী রবিনের কন্ট্রোল আবার ফিরে পেলেও লেগুন থেকে সাগরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। চ্যানেলটা মাঝখানে চারশো ফুট গভীর। সী রবিনকে ওখানে

অনায়াসে নামিয়ে দেয়া যায়, কেউ কোন দিন খুঁজে পাবে না।'

'আজকের রাতটা কালো,' বললেন ক্যাপটেন শেফার্ড, 'গার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমরা হয়তো সাগরে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'না, পারবেন না,' বলল রানা। 'আপনারা রওনা হলেই নিজেদের জাহাজ থেকে হাইজ্যাকাররা জানতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে তারা—সার্চলাইট জ্বেলে, বলাই বাহুল্য। শুধু কি ধাওয়া করবে? রেডিওতে পাহাড়ের মাথায় বসা গার্ডকেও সাবধান করে দেবে। সেজন্যেই ওখানে পৌঁছে হুমকিটা দূর করতে যাচ্ছি আমি।'

'বেশ। তবে তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে জাহাজে লোক ওঠা ঠেকানোর কাজটা কে করবে? ক্রুদের একজন সেনাপতিও দরকার,' শেষ কথাটা সকৌতুকে বলল রানা।

'কিন্তু ওখানে আপনি সময় মত পৌঁছাতে পারবেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ গার্ডনার। 'গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় আধমাইল ঢাল বেয়ে উঠতে হবে, তাও অন্ধকারে।'

হাতের ছোট্ট পেনলাইটটা দেখাল রানা। 'এটা আমাকে পথ দেখাবে। তাছাড়া, হাইজ্যাকাররা আসা-যাওয়া করায় পথ একটা তৈরি হয়েই আছে।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেইক করল মুরল্যান্ড। 'গুডলাক, দোস্ত।'

'এদের সবার দায়িত্ব তোমার ওপর,' বলল রানা। 'সাবধানে থেকো।' পরমুহূর্তে চলে গেল ও।

তেরো

হাইজ্যাকারদের অটোমেটিক রাইফেল দুটো সঙ্গেই আছে, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক থেকে কয়েক ফুট দূরে গানল্-এর পিছনে পজিশন নিয়েছে মুরল্যান্ড। এই গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক সী রবিন আর জলদস্যুদের জাহাজের মাঝখানে সেতু হিসেবে ঝুলে আছে। মুরল্যান্ড ডেকে শুয়ে, হাতের ভাঁজে একটা রাইফেল। পিস্তলের পাশে ডেকে পড়ে রয়েছে দ্বিতীয় রাইফেলটা, তার নাগালের মধ্যে। অতগুলো লোকের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জিতবে, বোকার মত এরকম কিছু ভাবছে না সে। রওনা হবার পর বোম্বেটেদের কেউ সার্ভে ভেসেলে উঠতে চাইলে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখাটাই তার উদ্দেশ্য। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কটা ঠেলে পানিতে ফেলে দিতে পারে সে, তবে কোন শব্দ করতে চায় না বলে ফেলছে না। জাহাজ রওনা হলে আপনা থেকেই খসে পড়বে ওটা।

জাহাজের কাঁপুনি অনুভব করল মুরল্যান্ড। বড় জেনারেটরগুলোর সুইচ অন করেছেন চীফ গার্ডনার। ডিজেল ইলেকট্রিক এঞ্জিনগুলোকে ফুল স্পীডে সেট করেছেন। দু'জন ক্রু নোঙর তোলার কাজে ব্যস্ত। উইঞ্চের সাহায্যে দ্রুত উঠে আসছে নোঙরের মোটা চেইন।

এই শুরু হলো মজা! ভাবল মুরল্যান্ড হাইজ্যাকারদের কানে এই নোঙর

তোলার আওয়াজ বজ্রপাতের মত বাজবে। তার ধারণাই সত্যি! মেস রুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তিনজন হাইজ্যাকার কিসের শব্দ হচ্ছে দেখার জন্যে।

নোঙরের চেইন উঠতে দেখল তারা। জানে না নিজেদের সঙ্গী দু'জনকে কাবু করা হয়েছে, তাই চিৎকার করে বলল, 'থামো! থামো! সময়ের আগে চলে যাচ্ছ কেন? তাও ক্রু না নিয়ে?'

মুরল্যান্ড মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয়, তারপরও বলল, 'কোন ক্রুর দরকার নেই।' সেই কর্কশ ঘর্ঘরে গলা নকল করছে এবারও। 'এ কাজ আমি একাই পারব।'

বোম্বেটেদের জাহাজে ছুটোছুটি, হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। মেস রুম থেকে আরও লোকজন বেরিয়ে আসছে। তারপর অন্য একটা ভারী গলা থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে তুমি?'

'কর্ক!'

'তুমি কর্ক নও, অসম্ভব! কোথায় সে?'

এঞ্জিনের বিট বাড়ছে, অনুভব করল মুরল্যান্ড। এবার রওনা হবে জাহাজ। আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পানিতে খসে পড়বে। 'কর্ক বলছে, তোমরা নরকের কীট, ডাস্টবিন থেকে নিয়ে পচা আবর্জনা খাও।'

খিস্তি আর হুংকার যেন বিস্ফোরিত হলো, সেই সঙ্গে হাইজ্যাকারদের একটা দল ছুটে এল গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে। মাত্র দু'জন উঠতে পারল গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কে, সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে দুজনেরই একটা করে হাঁটু গুঁড়িয়ে দিল মুরল্যান্ড। একজন হাইজ্যাকার পিছু হটে ওঅর্ক বোটে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা ঢলে পড়ল ওখানেই, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের রেইল ধরে অসহ্য ব্যথায় আর্তনাদ করছে। ঠিক এই সময় সী রবিন রওনা হয়ে যাওয়ায় গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের একটা দিক ঢালু হয়ে গেল, তারপর খসে পড়ল পানিতে। সার্ভে শিপ ছুটল চ্যানেল লক্ষ্য করে।

প্রায় চোখের পলকে তৈরি হলো হাইজ্যাকাররাও। সী রবিন একশো গজও এগোয়নি, নোঙর তুলে ধাওয়া শুরু করল ওঅর্ক বোট। এক ঝাঁক বুলেটও ছুটল, গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল লাভা রক-এ বাড়ি খেয়ে; ওঅর্ক বোটের ব্রিজ উইন্ডশীল্ড লক্ষ করে পাল্টা জবাব দিতে মুরল্যান্ডও দেরি করছে না।

বাঁক ঘুরে চ্যানেলে পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্যে হাইজ্যাকারদের দৃষ্টিপথের আড়ালে পড়ল সার্ভে শিপ। এই সুযোগে এক ছুটে পাইলটহাউসে উঠে এল মুরল্যান্ড।

হেলমে রয়েছেন ক্যাপটেন শেফার্ড। হিসহিস করে বললেন, 'এবার অত সহজে জাহাজ দখল করতে দিচ্ছি না!'

এঞ্জিনগুলোর কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব শক্তি আদায় করা হচ্ছে। চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে জাহাজ। কালো একটা গহ্বরের মত চ্যানেলটা। পাহাড়-প্রাচীরের অস্পষ্ট রেখা ওদের ওপর দু'দিক থেকে ঝুঁকে আছে, কিছু জ্বলজ্বলে তারা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

কিন্তু ওঅর্ক বোটও চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে। ওটার স্পীড সী রবিনের দ্বিগুণ। তীরে সারি সারি দাঁড়ানো নারকেল আর সুপারি গাছের গায়ে ওটার আউটলাইন

অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। স্পীডের যে পার্থক্য, সংঘর্ষ ঘটবেই। ওঅর্ক বোট পিছন থেকে ধাক্কা দিলে সী রবিন ডুবে যেতে বাধ্য।

এরকম ঘোর সংকটময় মুহূর্তে সবারই রানার কথা মনে পড়ল। তারপর সবার চোখ উঠে গেল ওপরে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় গার্ডহাউসের আলোটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। পাইলটহাউসে উপস্থিত সবাই ভাবছে, তারা যখন চ্যানেল থেকে বেরুতে শুরু করবে, রানা কি তার আগে ওই গার্ডহাউসে উঠতে পারবে? একমাত্র মুরল্যান্ডকে আশাবাদী মনে হলো: দ্রুত ধাবমান ওঅর্ক বোট লক্ষ্য করে শেষ গুলিটা ছুঁড়ল সে।

এটাকে পথ বলা যায় না। এক ফুট চওড়া আঁকাবাঁকা একটা রেখা, লেগুন থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে গেছে। শরীরে যতটুকু কুলায় তত জোরে ছুটছে রানা। লাভা রক-এ ঘন ঘন ফেলতে হওয়ায় প্রথমে পায়ে ব্যথা শুরু হলো, তারপর রক্তক্ষরণ। গগলের কাছ থেকে নেয়া ডাইভ ফিন-এর নিচে শুধু সোয়েট সকস পরেছিল রানা, সেই মোজা একটু পরই ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

গুলির শব্দ শুনে ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে লেগুনের দিকে তাকাল রানা। ও নিশ্চিত, প্রাণ থাকতে হাইজ্যাকারদের সার্ভে শিপে উঠতে দেবে না মুরল্যান্ড। পোর্টের আলো পড়েছে পানিতে, দেখেই বুঝতে পারল সী রবিন রওনা হয়ে গেল। চিৎকার আর প্রতিধ্বনি বলে দিল বোম্বেটেদের ওঅর্ক বোটও সী রবিনের পিছু নিয়েছে।

রানা এখনও গার্ডহাউস থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। হাঁপিয়ে গেছে, তাই হাঁটছে এখন। আরও কিছু দূর এগোবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কারণ জানালা থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছে। গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে পাহাড়-চূড়ার কিনারায় এসে দাঁড়াল গার্ড, নিচের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছে সী রবিন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে ফুল স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রানা দ্রুত এগোল, গা ঢাকা দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না। ছুটে লোকটার পিছনে চলে এল, নিচের ঘটনা এখনও তার চোখ দুটোকে চুম্বকের মত টেনে রেখেছে। গার্ডহাউস থেকে যথেষ্ট আলো বেরুচ্ছে, সেই আলোয় দেখা গেল লোকটার হাতে বড়সড় কোন আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। হয় গুলির শব্দ বাইরে বের করে এনেছে তাকে, কিংবা রেডিওতে মেসেজ পেয়েছে বন্দিরা নিজেদের মুক্ত করে নুমার জাহাজ নিয়ে পালাচ্ছে।

আরও কাছে আসার পর অস্ত্রটা চিনতে পেরে রানার হার্টবিট বেড়ে গেল আরও। ওটা একটা মিসাইল লঞ্চার। গার্ডের পাশে কাঠের একটা লম্বা বাক্সও রয়েছে, সন্দেহ নেই মিসাইল আছে ওটায়। রানা তাকিয়ে আছে, লোকটা মিসাইল লঞ্চার কাঁধে তুলল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল রানা। লোকটা যদি মিসাইল ছুঁড়তে পারে, আর সেটা যদি সী রবিনে লাগে, প্রিয় বন্ধু মুরল্যান্ড সহ নুমার পঞ্চাশজন ক্রু ও বিজ্ঞানী মারা যাবেন। শেষ দশ গজ মরিয়া হয়ে ছুটল রানা।

পায়ের ক্ষতগুলো থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, এক সেকেন্ড আগেও তীব্র জ্বালা

অনুভব করছিল, অথচ শেষ দূরত্বটুকু পেরোবার সময় রানা হাঁপাল না, কাতর কোন শব্দ করল না, কোথাও এতটুকু ব্যথাও পাচ্ছে না–শূন্যে লাফ দিল, জানে বোধহয় দেরি হয়ে গেছে, লোকটাকে আঘাত করল ঠিক যখন লঞ্চার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মিসাইল।

রানার মাথায় বিস্ফোরিত হলো লঞ্চারের ফ্ল্যাশ, লোকটার বুকে কাঁধ আর মাথা ঠোকার সময় ওর চুল পুড়ে গেল। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওদিকে রাতের অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে মিসাইল। শেষ মুহূর্তে রানার ধাক্কা খেয়ে সামান্য একটু নড়ে গিয়েছিল লঞ্চার, সী রবিনের পিছনে ও পঞ্চাশ ফুট ওপরে পাহাড়-প্রাচীরের পাথরে আঘাত করল মিসাইল।

পাথরের বিস্ফোরণ ঘটল। সী রবিনের ডেকেও কিছু পাথর ছিটকে এসে পড়ল, তবে কেউ আহত বা অন্য কোন ক্ষতি হলো না।

হতচকিত, পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে গেছে, মাটিতে গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হলো গার্ড। প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বিদ্যুৎগতিতে জুডোর কোপ মারল সে, কাঁধে না পারলেও খুলিতে লাগাতে পারল। খুলি না ভাঙলেও চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটোছুটি করতে দেখল রানা, জ্ঞান হারাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে শাসাল–কাজ ফেলে এখুনি পালাতে চাও?

পড়ে গিয়েছিল, তারপর যেন বহু যুগ চেষ্টা করার পর হাঁটুর ওপর সিধে হতে পারল। দাঁড়াবার চেষ্টা করাটা ভান। লোকটা এগিয়ে আসছে দেখে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার পেটে। কুঁজো হয়ে গেল গার্ড, ফুসফুসের সমস্ত বাতাস সশব্দে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

এবার মিসাইল লঞ্চারটা রানা তুলল। রডের মত করে দু'হাতে ধরে সবেগে ঘোরাল। গার্ডের নিতম্বের হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবার শব্দ পেল ও। মাটিতে পড়ে ফুটবলের মত ড্রপ খেলো লোকটা, তারপর পাহাড়ের কিনারা থেকে নেমে গেল নিচে। আকস্মিক পরাজয় এত দ্রুত ঘটল, গলা থেকে কোন চিৎকার পর্যন্ত বেরোয়নি। অনেক নিচে থেকে ভেসে আসা পানির ছলকে ওঠাটাই একমাত্র শব্দ হয়ে বাজল রানার কানে।

মাথা ঠাণ্ডা, দক্ষ হাত, কাঠের বাক্স থেকে একটা মিসাইল নিয়ে লঞ্চারে ঢোকাল রানা, লক্ষ্যস্থির করল সী রবিনের সত্তর গজ পিছনে জলদস্যুদের ওঅর্ক বোটে। ফায়ারিং সিকোয়েন্স জটিল নয় এটার, টার্গেটকে ব্যারেল বরাবর পেয়ে ট্রিগার টেনে দিল ও।

খোলের মাঝখানে আঘাত করল মিসাইল, ওয়াটার লাইনের ঠিক ওপরে। বিস্ফোরণটা তেমন জোরালো বলে মনে হলো না প্রথমে। কয়েক সেকেন্ড পর প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো অগ্নিশিখা, একই সঙ্গে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল জাহাজটা। হঠাৎ করে গোটা চ্যানেল আলোকিত হয়ে উঠেছে। দু'পাশের খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের গা কমলা আর লাল হয়ে উঠল। বিস্ফোরণের ফলে ফুয়েল ট্যাংক ফেটে গেছে, জাহাজের টুকরো দুটো পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল ধোঁয়া আর আগুনে। তারপর সেই আগুন নিভতেও খুব বেশি সময় লাগল না। ভাঙা ও জ্বলন্ত জাহাজের অংশগুলো ডুবছে।

মিসাইল লঞ্চারটা কিনারা থেকে নিচের পানিতে ফেলে দিল রানা। গার্ডহাউসে ঢুকে কেবিনেট খুলে খুঁজতেই ফার্স্ট-এইড-কিটটা পেয়ে গেল। অ্যান্টিসেপটিক মলমের প্রলেপ লাগাল ক্ষতবিক্ষত পা দুটোয়, তারপর ব্যান্ডেজ বাধল পুরু করে। এবার আর হাঁটতে তেমন অসুবিধে হবে না।

গ্যাসোলিন ভর্তি একটা ক্যান পেয়ে গার্ডহাউসের ভেতর চারদিকে ঢালল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে দেশলাই জ্বেলে কাঠিটা জানালা দিয়ে ভেতরে ফেলল। গার্ডহাউস দপ করে জ্বলে উঠল। পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও।

সৈকতে নেমে এসে রানা দেখল ওর জন্যে জিনা আর মুরল্যান্ড অপেক্ষা করছে। ওদের পিছনে বালির ওপর বো তুলে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে সার্ভে শিপের একটা লঞ্চ, দু'জন ক্রুসহ।

এগিয়ে এসে বন্ধুকে আলিঙ্গন করল মুরল্যান্ড। 'দুর্বল এক মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, তোমাকে বোধহয় কোন আদিবাসী তরুণী দেরি করিয়ে দিচ্ছে।'

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল রানা। 'নারী সব সময় আমার মত পুরুষের প্রেরণার উৎস, ওদের নিন্দা আমি সহ্য করব না।'

'গার্ড?'

'মিসাইল লঞ্চার সহ চ্যানেলের তলায়।'

'নাইস ওঅর্ক।'

'জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল রানা।

'একটু তুবড়েছে, একটু দাগ পড়েছে, সিরিয়াস কিছু নয়।'

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা। 'এ আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে তুমি সত্যি বেঁচে আছ।'

তার কপালে ভদ্রলোকসুলভ আলতো একটা চুমো দিয়ে লেগুনের চারদিকে তাকাল রানা। 'তুমি জাহাজের লঞ্চে চড়ে এসেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'তোমার রহস্যময় বন্ধু সী রবিনের পাশে ইয়ট ভিড়িয়ে আমাকে তুলে দিয়েছে।'

'কোথায় সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জিনা। 'ক্যাপটেন শেফার্ডের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে চলে গেল। বলে গেল, তোমার নাকি আর কোন সাহায্য দরকার হবে না, কাজেই তার বরং বিশ্বভ্রমণটা আবার শুরু করা দরকার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রানা বলল, 'সত্যি এক অদ্ভুত চরিত্র। ওকে কখনোই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পাইনি।'

'তোমার সম্পর্কেও এই একই কথা বলে সে,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'তবে মন খারাপ করার কিছু নেই। তার সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে।'

'তা হবে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হয় আমার কোন বিপদের সময়, নয়তো তার। সত্যি কথা বলতে কি, বিপদই আমাদের বন্ধুত্বটা টিকিয়ে রেখেছে।'

সী রবিন বঙ্গোপসাগরে, বাংলাদেশের জলসীমায় ফিরে এসে তেলের উৎসমুখ

অনুসন্ধানের কাজ আবার শুরু করল। নুমার একটা হেলিকপ্টার এসে রানা আর মুরল্যান্ডকে পৌঁছে দিল চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে, ওখান থেকে নুমারই একটা জেট বিমানে চড়ে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। হেলিকপ্টারে থাকতে বিসিআই চীফ রাহাত খানের সঙ্গে রেডিওতে কথা হয়েছে রানার। বস্ ওকে বলেছেন, 'আগে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করো, তারপর সনাক্ত করো কে অপরাধী। কেন কি ঘটছে সব আগে জানো। এ-ব্যাপারে নুমা চীফ জর্জ আমাকে কথা দিয়েছে, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করতে রাজি আছে সে। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমি তোমার ওয়াশিংটন সফর অনুমোদন করেছি।'

প্লেনে চড়ার ত্রিশ মিনিটের মাথায় নাক ডাকতে শুরু করল মুরল্যান্ড। জানালার ধারে বসেছে, সামনের সিটের নিচে থেকে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্যাগটা টেনে বের করল রানা। ক্ল্যাপস্ খুলে ঢাকনিটা সাবধানে তুলল, লোভ হচ্ছে আবার বোধহয় দেখতে পাবে তেলে ভরে আছে। বিদঘুটে একটা আইডিয়া, সকৌতুকে ভাবল।

কেসটায় কোন তেল নেই, ভেতরে শুধু একটা তোয়ালে আর ব্লু নেভিগেটরের ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ক্রুজ শিপ ওয়াটার লিলির ভিডিও ক্যাসেটটা রয়েছে। সাবধানে তোয়ালেটার ভাঁজ খুলল রানা, তারপর ওর হাতে চলে এল অদ্ভুতদর্শন হালকা সবুজ রঙের সেই ছোট্ট জিনিসটা—ব্লু নেভিগেটরের রোবোটিক বাহুর সাহায্যে ওয়াটার লিলির পুড়ে ছাই হওয়া চ্যাপেলের ডেক থেকে তুলেছিল। ডান হাতের দু'আঙুলে ধরে বাঁ হাতের তালুতে ওটাকে ওল্টাল ও। এই প্রথম জিনিসটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ও।

জিনিসটার গায়ে মসৃণ, চকচকে একটা ভাব আছে। যে-কোন জিনিস পুড়লে এবড়োখেবড়ো আকৃতি পায়, কর্কশ হয়ে ওঠে, কিন্তু এটার বেলায় একেবারেই তা ঘটেনি। এটা সুডৌল, প্রায় পিচ্ছিল, মোচড় খেয়ে একটু বাঁকা হয়ে আছে। জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি রানার কোন ধারণা নেই। তোয়ালের ভেতর জড়িয়ে আবার সেটা লেদার কেসে ভরে রাখল। ভাবল, নুমার কেমিস্টদের হাতে তুলে দিলেই পরীক্ষা করে বলে দেবে জিনিসটা আসলে কি।

তিনবার যাত্রাবিরতি নিয়ে বিশ ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনে পৌঁছে ববি মুরল্যান্ড তার বান্ধবীদের জানাতে চলে গেল এখন তাকে আবার চাহিবা মাত্র পাওয়া যাবে। নুমার একটা জীপ এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এল রানাকে। দশতলায় ওঠার পর প্রথমে দেখা হলো কমপিউটর জাদুকর কালোমানিক ল্যারি কিং-এর সঙ্গে, ঠিক যাকে ও খুঁজছিল।

'তোমাদের রেসকিউ অপারেশনের রিপোর্ট পড়লাম,' বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলল সে। 'সত্যি অবিশ্বাস্য! কিন্তু আমার যেটা অবাক লাগে, এরকম বড় মাপের সর্বনাশের সঙ্গে তুমি কিভাবে জড়িয়ে পড়ো?' কিং 'তুমি' শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিল।

'আমি জড়াই না, আমাকে জড়ানো হয়,' জবাব দিল রানা। 'শোনো, রেসকিউ অপারেশনের কৃতিত্ব আমার নয়, সী রবিনের ক্রুদের। আর ওদেরকে

বোম্বেটেদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে আসলে ববি।'

'হুম।' কিং জানে নিজের কৃতিত্ব জাহির করা রানার স্বভাব নয়। 'সে যাক। প্রথমেই তুমি আমার সেকশনে ঢুকলে–নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে?'

ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা কিং-এর ডেস্কে রেখে খুলল রানা। ক্রুজ লাইনার থেকে উদ্ধার করা ছোট্ট জিনিসটা তোয়ালের ভাঁজ থেকে বের করে কিং-এর হাতে তুলে দিল। 'আমি চাই এটা তুমি অ্যানালাইজ ও আইডেনটিফাই করো।'

অদ্ভুত আকৃতির জিনিসটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল কিং, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'প্রথমে এটাকে কেমিস্ট্রি ল্যাবে পাঠাতে হবে,' বলল সে। 'মলিকিউলার স্ট্রাকচার জটিল কিছু না হলে দিন দুয়েকের মধ্যে উত্তরটা পেয়ে যাবে। আর কিছু?'

ব্লু নেভিগেটরের ভিডিও ক্যাসেটটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'কমপিউটরের সাহায্যে আকারে বড় আর ডিজিটাইজ করতে হবে–থ্রী-ডাইমেনশনাল ইমেজে।'

'কোন সমস্যা নয়।'

'এটাই শেষ।' কিং-এর ডেস্কে একটা ড্রইং রাখল রানা। 'এরকম কোম্পানি লোগো কোথাও দেখেছ?'

দাঁড়-এ বসা একজোড়া বাজপাখির দিকে একবার তাকিয়েই মুখ তুলল কিং। 'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

'বোম্বেটেদের ওঅর্ক বোটে ছিল।'

'একটা অয়েল রিগ ওঅর্ক বোট।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে চেনো তুমি?'

'চিনি।' চেহারা থমথমে, গলা প্রায় ভাঙা। কিং উদ্বিগ্ন। 'তুমি যদি সী রবিনকে হাইজ্যাক করার জন্যে ফ্যালকন করপরেশনকে দায়ী করো, চিন্তার অতীত জটিল একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে যাচ্ছ।'

'ফ্যালকন করপরেশন,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল রানা। 'আরে, তাই তো! এই কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে বেশির ভাগ ডোমেস্টিক অয়েল ফিল্ড, কপার ও আয়রন মাইনের মালিক। ওদের কেমিকেল ডিভিশন এক হাজার ধরনের আলাদা আইটেম তৈরি করে। কিং, এই কোম্পানি সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু জানতে চাই আমি।' ও জানে, নিজের ডিজাইনে বানানো টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড ভীনাস নামে এমন একটা কমপিউটর তৈরি করেছে কিং, সেটাকে প্রায় মানুষ বললেই চলে।

'হুম।' নিজের কমপিউটরের সামনে বসে কী বোর্ডে আঙুল চালিয়ে একটা কোড টাইপ করল কিং। তার কনসোলের ঠিক উল্টোদিকের চেম্বারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক তরুণীর মুখ ও শারীরিক কাঠামো আবির্ভূত হলো 'থ্রী ডাইমেনশান-এ। মেয়েটা ওয়ান-পীস বেদিং সুট পরে আছে।

'তুমি ডেকেছ,' বলল সে।

'হ্যালো, ভীনাস। রানাকে তো তুমি চেনোই।'

জ্বলজ্বলে নীল চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপল, তারপর রানার পা থেকে মাথা

পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল ভীনাস। 'হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি। কেমন আছ, মিস্টার রানা?'

'ভাল,' বলল রানা। 'তুমি ভাল তো?'

ভীনাসের চেহারা বদলে গেল, সেখানে রাগ ও অভিমান মিশে আছে। 'এই স্টুপিড বেদিং সুট আমার পছন্দ হয়নি, তাই আমার মন ভাল নেই।'

'কথাটা আগে আমাকে বলোনি কেন?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'অপেক্ষা করছিলাম কার সামনে বললে তুমি নিজের কেরামর্তি দেখাতে উৎসাহ পাবে।'

'ওই সুটের বদলে কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'সুন্দর ডিজাইনের একটা আর্মানি সুট। অ্যান্ড্রা গ্যাব্রিয়েল লনজ্যারি। আর টড-এর তৈরি হাই-হীল, অ্যাঙ্কল-স্ট্র্যাপ স্যান্ডেল। ব্যস।'

ঠোঁট টিপে হাসল কিং। 'রঙ?'

'লাল।'

কমপিউটর কী-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াল কিং-এর আঙুল। তারপর চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখতে লাগল সে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ভীনাস, তারপর উদয় হলো চোখ-জুড়ানো ডিজাইনের তৈরি লাল সুট পরে—ব্লাউজ, জ্যাকেট ও স্কার্ট সহ। 'এখন ভাল লাগছে,' বলল সে। 'আমি খুশি।'

'এখন যখন তোমার মূড ভাল, কিছু কাজ দেখাও,' বলল কিং। 'আমি ফ্যালকন করপরেশন সম্পর্কে ডাটা চাই।'

'কোন্‌টার কথা বলছ? এই নামের বারোটা কোম্পানির ডাটা আছে আমার কাছে।'

'সিনেটর লীফ এরকুল-এর ফ্যালকন। অয়েল, মাইনিং আর কেমিস্ট্রি নিয়ে ব্যবসা করে।'

'ও, ওটা,' বলল ভীনাস, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হাতে ঘণ্টাদশেক সময় আছে তো?'

'ফ্যালকন সম্পর্কে তোমার কাছে এত ডাটা?'

'এই মুহূর্তে খুব বেশি নেই, তবে আর যে-সব কোম্পানির সঙ্গে ওরা ব্যবসা করে তাদের নেট ওঅর্কে ঢোকার পর পেয়ে যাব। ওদের ব্যবসা আর স্বার্থ যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিভিন্ন সরকারের কাছেও এই কোম্পানি সম্পর্কে প্রচুর ফাইল আছে।'

চোখে সংশয় নিয়ে কিং-এর দিকে তাকাল রানা। 'করপরেট নেটওঅর্ক হ্যাকিং কবে থেকে আইনসিদ্ধ হলো?'

চতুর শেয়ালের মত মুখ করল ল্যারি কিং। 'আমি ভীনাসকে শুধু কমান্ড দিই, সে কি পদ্ধতিতে কাজ করে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আমি আশা করব ডাটাগুলো তাড়াতাড়িই পাব।'

এবার ওয়াশিংটনে এসে রোনাল্ড রিগ্যান ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ছোট অথচ অভিজাত একটা ফ্রেঞ্চ হোটেলে উঠল রানা, নাম সিজাঁ পঁয়ার।

নিচতলায় রেস্তোরাঁ, একটা টেবিল বুক করল। পুরানো বান্ধবী, কংগ্রেস সদস্যা ন্যারেলিকে ফোন করতে পারত, তবে সিদ্ধান্ত নিল একা ডিনার খাবে। বন্ধুত্ব ঝালাই পরে হলেও চলবে, তার আগে শরীরের জন্যে প্রচুর পুষ্টি আর বিশ্রাম দরকার। খাওয়াদাওয়ার পর দীর্ঘ একটা ঘুম দেবে।

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হবার পর রেস্তোরাঁয় নামার জন্যে হাতে সময় থাকল বিশ মিনিট। তৃষার ফোন নম্বর লেখা কাগজটা বের করে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল ও। পাঁচবার রিঙ হবার পর কেউ যখন ধরছে না, যোগাযোগ কেটে দিতে যাচ্ছে, এই সময় সাড়া পাওয়া গেল। 'হ্যালো?'

'তৃষা ইসলাম?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে তৃষার দম আটকানোর আওয়াজ পেল রানা।

'মাসুদ রানা? মিস্টার রানা? আপনি এখানে–আমেরিকায়?' তৃষার উচ্ছ্বাস চাপা থাকছে না।

'এসেছি খুব বেশিক্ষণ হয়নি। ভাবলাম একটা ফোন করি।'

'সত্যি, অত্যন্ত খুশি হয়েছি।'

'কাজের মধ্যেই আছি, তবে তারপরও সময় বের করতে পারব বলে মনে হয়,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হলো, আপনি কতটা ব্যস্ত?'

'আমার দম ফেলবারও ফুরসত নেই। প্রচণ্ড ব্যস্ত চ্যারিটি ওঅর্ক নিয়ে। আমি অ্যাফ্রো-এশীয় হ্যান্ডিক্যাপড় চিলড্রেন'স অর্গানাইজেশন-এর চেয়ারপারসন। আমাদের এখানে এখন বাৎসরিক ফ্লাইং রাউন্ডআপ অনুষ্ঠিত হবে, এই ইভেন্টেরও পরিচালক আমি।'

'জানি বোকামি হয়ে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না–ফ্লাইং রাউন্ডআপ জিনিসটা আসলে কি?'

হেসে উঠল তৃষা। 'এটাকে আপনি এয়ার শো বলতে পারেন। লোকজন অনেক পুরানো প্লেন নিয়ে দেখাতে আসে। একটা প্লেনে বাচ্চাদেরকে তুলে ঘুরিয়ে আনা হয়। কাজটায় আমি নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়েছি এই জন্যে যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর বাঙালী ছেলেমেয়েও আসে।'

'তবে আপনাদের কাজ অন্য লোকেরা করে দেবে।'

'তা কি সবাই দিচ্ছে!' তৃষার গলায় অভিযোগ। 'এক ভদ্রলোকের কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো ডগলাস ডিসি-থ্রী আছে, তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বাচ্চাদের নিয়ে ম্যানহাটনের ওপর উড়বেন। কিন্তু ল্যান্ডিং গিয়ার-এ সমস্যা দেখা দেয়ায় ভদ্রলোক অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'এই রাউন্ডআপ কোত্থেকে শুরু হচ্ছে?'

'নিউ জার্সিতে, হাডসন নদীর ঠিক ওপারে। ওখানে একটা প্রাইভেট ফিল্ড আছে ইঙ্গেলউড ক্লিফ নামে ছোট এক শহরের কাছে। আব্বুর ফার্ম আর ল্যাবরেটরি থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়।' শেষ দিকে তৃষার গলা বিষণ্ন হয়ে উঠল।

রানার চোখের সামনে পুরানো কার ও এয়ারক্রাফটের একটা কালেকশন ভেসে উঠল। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, একটা হ্যাঙ্গারে সব রাখা আছে। এই

মুহূর্তে বিশেষ করে একটা প্লেনের কথা ভাবছে ও। উনিশশো উনত্রিশ সালে তৈরি। বড় আকারের তিন এঞ্জিনে চলে। 'আমি বোধহয় শূন্যস্থানটা পূরণ করতে পারব,' তৃষাকে বলল ও।

'আপনি পারবেন?' তৃষা বিস্মিত, বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে উঠল। 'পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন সত্যি যোগাড় করতে পারবেন বলছেন?'

'রাউন্ডআপটা কবে?'

'আজ থেকে দু'দিন পর'। কিন্তু এত অল্প সময়ের ভেতর প্লেন কোত্থেকে যোগাড় করবেন আপনি?'

একা একা হাসছে রানা। 'আমি এমন একজনকে চিনি যে সুন্দরী মেয়ে আর প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের প্রতি সত্যি ভারি সদয়।'

পরদিন সকাল এগারোটায় নুমা হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রূমে মীটিং শুরু হলো। সভাপতিত্ব করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। অংশ নিচ্ছে নুমার কর্মকর্তারা ছাড়াও সিআইএ-এর ডেপুটি ডিরেক্টর চার্লস বোল্ডার ও এফবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নাথান করবেট। ল্যারি কিং আর মুরল্যান্ডকে নিয়ে সবার শেষে হাজির হলো রানা। ওদেরকে দেখেই অ্যাডমিরাল বললেন, 'সবাই যখন উপস্থিত, মীটিং এবার শুরু করা যাক।'

ডোবা ওয়াটার লিলির ছবি সহ সবাইকে একটা করে ফোল্ডার বিলি করল কিং। 'এগুলো আপনারা দেখতে থাকুন, আমি ভিসিআর চালু করছি।'

সিলিঙের গোপন ফাঁক থেকে তিন পাশ বিশিষ্ট বিশাল মনিটর নেমে এল নিচে। কিং রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিতেই সী হর্সের ভিডিও ক্যামেরা থেকে তোলা ত্রিমাত্রিক ইমেজ মিছিলের মত যাত্রা শুরু করল মঞ্চে নেমে আসা স্ক্রীনে। ওয়াটার লিলির পোড়া ধ্বংসাবশেষ করুণ একটা ভাব জাগিয়ে তুলল সবার মনে। এত সুন্দর একটা জাহাজের এই দুঃখজনক পরিণতি কেউই মেনে নিতে পারছে না।

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে, ওয়াটার লিলির তলা খসে পড়ার পিছনে কি কারণ দায়ী হতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল রানা।

সবশেষে প্রশ্ন উঠল, পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটা জাহাজকে কেন কেউ ডোবাতে যাবে? তাছাড়া, ডোবাবেই বা কে? টো করার সময় জাহাজটায় তো কেউ ছিল না।

জর্জ রেডক্লিফ জানালেন, জাহাজে কেউ ছিল না, এ-কথা ঠিক নয়। টাগ বোটের ক্যাপটেন টিম বাটার রিপোর্ট করেছেন, ক্রুজ শিপের একজন অফিসারকে সাগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, জাহাজটা ডুবে যাবার পরপরই।

সিআইএ কর্মকর্তা চার্লস বোল্ডার প্রশ্ন করলেন, 'অফিসার ভদ্রলোক আগুন থেকে বাঁচলেন কিভাবে?'

নোট বুকে পেন্সিল ঠুকলেন রেডক্লিফ। 'এই প্রশ্ন সবার মনেই জেগেছে। ক্যাপটেন বাটার ব্যাপারটাকে মিরাকল বলেছেন। পানি থেকে তোলার পর অফিসারের আচরণ দেখে মনে হয়েছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। কিন্তু

টাগ সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবার পরপরই কাউকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে গায়েব হয়ে যান তিনি।'

'তার চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেছে?' এফবিআই কর্মকর্তা নাথান করবেট গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন।

'এইটুকু যে সে কালো।'

চার্লস রোল্ডার বললেন, 'বলা হচ্ছে আগুনটা ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছে, আর আগুন লাগানোর প্রমাণ ধ্বংস করার জন্যে পোড়া জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে দেখেছি, এই ঘটনার সঙ্গে নুমার জাহাজ সী রবিনকে হাইজ্যাক করার ব্যাপারটাও জড়িত। সব মিলিয়ে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'কি দাঁড়াচ্ছে সেটা পরে জানা যাবে,' মাঝখান থেকে ল্যারি কিং কথা বলে উঠল। 'তার আগে আমি প্রমাণ করতে চাই ওয়াটার লিলিতে সত্যি আগুন লাগানো হয়েছিল–এটা এখন আর কোন অমূলক সন্দেহ নয়।'

'কিভাবে প্রমাণ করতে চাও?' অ্যাডমিরাল জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রমাণটা আসলে রানা আমাকে দিয়েছে,' বলল কিং। 'ববি আর ও ব্লু নেভিগেটর নিয়ে সাগরে নেমেছিল, জিনিসটা ওয়াটার লিলির ডেক থেকে পেয়েছে।'

'নুমার ল্যাব এত তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে আইডেনটিফাই করতে পেরেছে?' রানা একটু অবাকই।

'রেজাল্ট পাবার জন্যে সারারাত খাটতে হয়েছে ওদেরকে,' কিং-এর গলায় বিজয়ীর উল্লাস।

সিআইএ-র ডেপুটি বোল্ডার বললেন, 'এ আপনারা কি বিষয়ে কথা বলছেন?'

'জাহাজটার যেখানে প্রথমে আগুন লাগে সেখান থেকে ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে পেয়ে তুলে আনি আমরা,' ব্যাখ্যা করল মুরল্যান্ড।

'ওই এলিমেন্ট কিভাবে ভাঙা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে লম্বা লেকচার দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না,' বলল ল্যারি কিং। 'শুধু এটুকু জানাই, আমাদের নুমা বিজ্ঞানীরা বলছেন জিনিসটা হাইলি ইনসেনডিয়ারি, এবং এর পরিচয় হলো "পাইরোটর্চ ৬১০"। একবার এটা জ্বললে, নেভানো প্রায় অসম্ভব। জিনিসটা এতই ভয়ংকর, এমন কি সামরিক বাহিনী পর্যন্ত ছোঁবে না।'

চোখ ঘুরিয়ে সবার হতচকিত ভাবটা লক্ষ করছে কিং। মুরল্যান্ডের বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা, দু'জনেই নিঃশব্দে হাসছে।

'তাহলে প্রমাণ হলো যেটাকে করুণ দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল আসলে সেটা ছিল ঘৃণ্য একটা অপরাধ।'

'ক্রাইম যখন একটা ঘটেছে, তার তদন্তও হতে হবে,' সিআইএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বোল্ডার বললেন। 'সিঙ্গাপুরে তৈরি হলেও ওয়াটার লিলির শেয়ার হোল্ডাররা প্রায় সবাই ব্রিটিশ ও আমেরিকান। তাছাড়া, নুমার সার্ভে শিপ হাইজ্যাক করার সঙ্গেও ওই ক্রাইমের একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনারা সী রবিনের হাইজ্যাকিং দিয়ে তদন্ত শুরু করতে পারেন,' বলল রানা। 'একটা কথা–হাইজ্যাকারদের কিন্তু জলদস্যু বলে মনে হয়নি, বরং

মার্সেনারি বলে মনে হয়েছে।'

এফবিআই কর্মকর্তা নাথান করবেট ব্যাখ্যাটা এখনও মেনে নিতে ইতস্তত করছেন। 'নুমার একটা জাহাজ হাইজ্যাক করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?'

'ব্যাপারটাকে চুরি-ডাকাতি বলে মনে করলে ভুল হবে,' বলল রানা। 'ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ জাহাজটা সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছিল ওরা। আপনি মোটিভ খুঁজছেন? মোটিভ হলো—ওরা চাইছিল সাগরের তলা থেকে আমরা যাতে আগুন লাগানোর কোন প্রমাণ তুলে আনতে না পারি।'

রেডক্লিফের কপালে চিন্তার রেখা। 'ফর গডস্ সেক! এ-ধরনের নিষ্ঠুরতা কার পক্ষে সম্ভব?'

'আপনারা তদন্তের জন্যে প্রথমেই ফ্যালকন করপরেশনকে বেছে নিতে পারেন,' বলল কিং, চোখ ঘুরিয়ে রানাকে একবার দেখে নিল।

'ননসেন্স!' নাক ঝাড়ার মত একটা শব্দ করলেন নাথান করবেট। 'দেশের সবচেয়ে বড় আর বিখ্যাত কোম্পানিগুলোর একটা ওই ফ্যালকন, দু'হাজার লোককে খুন করতে যাচ্ছিল দুনিয়ার আরেক প্রান্তে? আপনারা কল্পনা করতে পারেন জেনারেল মোটর, সিঙ্গার, বাটা বা মাইক্রোসফট পাইকারি হত্যাযজ্ঞ চালাবার মত অপরাধের সঙ্গে জড়িত হবে? আমি অন্তত পারি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'তবে একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে ফ্যালকন ধোয়া তুলসী পাতা নয়। বেআইনী পন্থায় ব্যবসা করার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আগেও তোলা হয়েছে।'

'কিন্তু সমস্ত অভিযোগ ধামাচাপা দেয়া হয়েছে, কারণ ফ্যালকনের মালিক লীফ এরকুল শুধু সিনেটর নন, প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে প্রায় সব মন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'তাসত্ত্বেও কংগ্রেসন্যাল কমিটি অভিযোগগুলোর তদন্ত করেছে,' বললেন করবেট। 'বেশ কয়েকবারই।'

'ও-সব স্রেফ লোক দেখানো ব্যাপার ছিল,' বললেন সিআইএ কর্মকর্তা চার্লস বোল্ডার। 'সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেয়ার কৌশল। তার প্রমাণ একটা তদন্ত কমিটির রিপোর্টও আলোর মুখ দেখেনি।'

'এমন একটা কোম্পানিকে তিরস্কার করা কংগ্রেসের পক্ষে খুবই কঠিন যে কোম্পানি নির্বাচনের সময় দুটো দলকেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চাঁদা দেয়।' নুমা চীফ নিঃশব্দে তিক্ত হাসি হাসছেন।

নাথান করবেট মাথা নাড়ছেন। 'এই মাত্রার একটা ক্রাইমের ব্যাপারে ফ্যালকনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে বললে আমাকে নিরেট প্রমাণ দেখাতে হবে।'

ল্যারি কিং-এর চোখ দুটোয় হঠাৎ কি যেন জ্বলে উঠতে দেখল রানা, সে কথা বলছে সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে। 'এটা কি আপনার কোন সাহায্যে আসবে, যদি বলি ফ্যালকনের কেমিকেল ডিভিশন পাইরোটর্চ ৬১০ তৈরি করেছে?'

'এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না,' বললেন করবেট, গলায় সন্দেহ।

'দুনিয়ার আর কোন কোম্পানি পাইরোটর্চ ৬১০-এর গুণ ও ধর্ম, অর্থাৎ

উপাদান-সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য ডুপ্লিকেট করতে পারেনি,' বলল কিং। 'দু'বছর আগে এটা তাদেরই দাবি ছিল।'

করবেট তাড়াতাড়ি বললেন, 'জিনিসটা ওদের কাছ থেকে চুরি হয়ে থাকতে পারে। যে-কারও পক্ষে কাজটা করা সম্ভব।'

অ্যাডমিরাল আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্যে বললেন, 'এফবিআই অন্তত তদন্ত করার একটা জায়গা পেল।' চার্লস বোল্ডারের দিকে তাকালেন তিনি। 'সিআইএ কি করবে?'

'আমাদের প্রথম কাজ হাইজ্যাকারদের জাহাজটা লেগুন থেকে উদ্ধার করা,' বললেন বোল্ডার।

'এ-ব্যাপারে আপনি নুমার সাহায্য চাইলে পাবেন,' বলল রানা।

'না, ধন্যবাদ,' বললেন বোল্ডার। 'এ-ধরনের আন্ডারওয়াটার কাজ আমরা একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে করাই।'

'বেশ, তাই হোক।' মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

করবেট বললেন, 'সী রবিনের ক্রু ও বিজ্ঞানীদের ইন্টারোগেট করার জন্যে আপনার অনুমতি দরকার হবে আমার, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'অনুমতি দেয়া হলো,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বললেন অ্যাডমিরাল।

সিআইএ ও এফবিআই কর্মকর্তারা কনফারেন্স রূম ছেড়ে চলে যাবার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোত্থেকে শুরু করব?'

'দু'একদিন ছুটি নাও তোমরা,' বললেন নুমা চীফ। 'বিসিআই চীফ, তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোমরা বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে দেখবে একটা প্ল্যান তৈরি করে রেখেছি। ইতিমধ্যে মিস্টার রেডক্লিফ আর কিং যতটা পারে ডাটা সংগ্রহ করুক।'

'ছুটি কাটাতে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' রানা ও মুরল্যান্ড, দু'জনকেই জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'আমি আমার দু'জন বান্ধবীকে ইয়টে তুলে নিয়ে হাডসন নদীতে বেড়াতে যাচ্ছি,' বলল মুরল্যান্ড।

রানার দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। 'আপনি, মিস্টার রানা?'

'আমি?' রানার অকারণে হাসি পেয়ে গেল। 'আমি যাচ্ছি একটা এয়ার শোতে।'

চোদ্দ

দিনটা যে শুধু এয়ার শো-র জন্যে ভাল, তাই নয়, চমৎকার আবহাওয়াটা প্রতিবন্ধী শিশুরাও দারুণ উপভোগ করবে। অনুষ্ঠানটা অ্যাফ্রো-এশীয় প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে হলেও, দর্শক হিসেবে সাদা-কালো কম করেও দশ হাজার লোক জড়ো হয়েছে মাঠে। আটলান্টিক শান্ত আজ। ফুরফুরে বাতাস বইছে।

মিনি মেরিলিন ফিল্ড বড়সড় হাউজিং কামিউনিটির মাঝখানে একটা প্রাইভেট এয়ারপোর্ট, এখানে বসবাসকারীরা প্রায় প্রত্যেকেই এয়ারপ্লেনের মালিক। প্রতিটি রাস্তা এমনভাবে বানানো হয়েছে, পরিবারগুলো যাতে তাদের বিমান নিজেদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সির মত চালিয়ে রানওয়েতে নিয়ে যেতে পারে, আবার রানওয়ে থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারে। রানওয়ের চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, সেখানে ফুলের বাগান, খেলার মাঠ আর পিকনিক স্পট তৈরি করা হয়েছে।

ছয়টা রাজ্য থেকে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের নিয়ে এল তাদের মা-বাবা, স্কুল ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সাজানো প্রাচীন প্লেন-এর প্রদর্শনী চলছে, সেগুলো বাচ্চাদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। অনুষ্ঠানটার মধ্যে একটা ভাবাবেগ আছে, অংশগ্রহণ করতে পেরে সবাই গর্বিত।

তৃষার উদ্বেগ আর উত্তেজনা তুঙ্গে সে জানে তার ব্লাড প্রেশার মারাত্মক পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোন সমস্যা হয়নি। স্বেচ্ছাসেবকরা আশাতীত সাহায্য করছে। নব্বুইটা প্লেনের মালিক ও পাইলট খুশিমনে নিজেদের সময় দিচ্ছেন, অংশগ্রহণও করছেন যে-যার নিজের খরচে। প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের ককপিটে তুলে নিয়ে উড়োজাহাজের ইতিহাস সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু যে প্লেনটার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃষা, যেটার কাজ হবে বাচ্চাদের নিয়ে আকাশে ওড়া, ম্যানহাটনের আকাশ ছোঁয়া দালানগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই প্লেনটাই আসেনি। দুঃসংবাদটা বাচ্চাদের দিতে যাবে তৃষা, এই সময় তাদের পারিবারিক শুভানুধ্যায়ী ও কো-ওয়ার্কার খুরশিদা হককে আসতে দেখল সে।

'দুঃখিত,' কাছে এসে খুরশিদা বললেন। 'আমি জানি তুমি ভাবতেই পারোনি যে ভদ্রলোক এভাবে তোমাকে হতাশ করবেন।'

'প্লেন যোগাড় করতে না পারলে ভদ্রলোক অন্তত একটা টেলিফোন তো করবেন!' মাথা নাড়ল তৃষা। 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

খুরশিদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাত তুলে রোদ ঠেকালেন, অপর হাত দিয়ে দূরের আকাশ দেখালেন তৃষাকে। 'দক্ষিণ দিক থেকে ওটা কি আসছে বলো তো?'

সেদিকে ভাল করে না তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় তৃষা বলল, 'কই, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন!' খুরশিদা উত্তেজিত। 'তৃষা, আমার ধারণা ভদ্রলোক আসছেন।'

তৃষার শিরায় শিরায় স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল, সেই সঙ্গে আরও দ্রুত হলো হার্টবিট। 'নিশ্চয়ই তিনি!' আওয়াজটা তার গলা থেকে প্রায় চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এল। 'রানা আমাকে ডোবাননি!'

শুধু ওরা নয়, বাচ্চারা সহ সমস্ত দর্শক অদ্ভুতদর্শন প্লেনটাকে দেখছে. ফিল্ডটাকে ঘিরে থাকা গাছপালার মাথা ছুঁয়ে ছুটে আসছে ওটা। গতি বেশি নয়,

ঘণ্টায় মাত্র পঁচাত্তর মাইল। ওটার নাম টিন গূস, নিজের যুগে সবচেয়ে সফল বাণিজ্যিক এয়ারলাইনার ছিল। টিন গূস এর ফাইভ-এটি ট্রাইমোটর তৈরি করে ফোর্ড মোটর কোম্পানি উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ সালে। গোটা আমেরিকা জুড়ে খুব কম লোকের কালেকশনেই এই প্লেন খুঁজে পাওয়া যাবে। এই টিন গূসটা রানা কেনেনি, বান্ধবী লরেলি ওর জন্মদিনে ওকে উপহার দিয়েছিল।

প্রাচীন এক জীপ নিয়ে ছুটল একজন স্বেচ্ছাসেবক, ল্যান্ড করার পর টিন গূসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে পার্কিং এরিয়ায়। লাল রঙ করা ওয়ার্ল্ড ওঅর ওয়ান ফকার ডিআর. ওয়ান ট্রাইপ্লেন আর উনিশশো বত্রিশ সালে তৈরি করা একটা নীল রঙের সিকোরস্কি এস-থারটিএইট অ্যামফিবিয়ান-এর মাঝখানে থামল রানা।

একটা ক্যাডিলাকে চড়ে সেখানে পৌঁছাল তৃষা, তার সঙ্গে খুরশিদা হকও রয়েছেন। ওরাও পৌঁছাল, রানাও টিন গূসের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে বাইরে উঁকি দিল। একটা বোর্ডিং স্টুল ফেলল ও, সেটায় পা দিয়ে নেমে এল নিচে।

'আপনি!' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না তৃষা, অকারণে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। 'আপনি প্লেন চালাতেও জানেন? এটা যোগাড় করলেন কোত্থেকে–নাকি এটা আপনারই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এবং হ্যাঁ।' খুরশিদা হকের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল ও। 'হ্যালো।' ভদ্রমহিলা সুশ্রী, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি।

'ওহ্, দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল তৃষা। 'ইনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু, খুরশিদা হক। এই ইভেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও উনি। আর খুরশিদা, উনি হলেন–'

'হ্যাঁ, জানি। মাসুদ রানা, যার প্রশংসা সারাক্ষণ তোমার মুখে লেগেই আছে।' রানাকে খুঁটিয়ে পরখ করলেন খুরশিদা, তাঁর সবুজ চোখে মুগ্ধ একটা ভাব ফুটল। 'আ প্লেজার টু মিট ইউ।'

'দা প্লেজার ইজ মাইন।'

'আপনার প্লেনে চড়ার জন্যে বাচ্চারা অস্থির হয়ে আছে,' বলল তৃষা। 'আপনাকে আসতে দেখার পর থেকে শুধু এই একটা বিষয়েই কথা বলছে ওরা। ফ্লাইটের জন্যে এরইমধ্যে ওদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়েছি আমরা।'

প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের দিকে তাকাল রানা। লাইনে অনেক হুইলচেয়ারও রয়েছে। 'ওরা কতজন উড়তে চায়? আমার প্লেনে প্রতিবার মাত্র পনেরোজনকে তোলা যাবে।'

'ওরা ষাটজন,' বললেন খুরশিদা। 'তারমানে চারটে ট্রিপ লাগবে।'

রানা একটু আড়ষ্ট হেসে বলল, 'আমি সামলাতে পারব, কিন্তু প্লেনে প্যাসেঞ্জার থাকলে আমার একজন কো-পাইলট দরকার হবে। আমার বন্ধু ববি আসতে পারেনি।'

'এটা কোন সমস্যাই নয়,' হেসে উঠে বলল তৃষা। 'খুরশিদা সুপারস্টার এয়ারলাইন্সের একজন পাইলট।'

'কতদিন ধরে?'

'বারো বছর সেভেন থারটি-সেভেন আর সেভেন সিক্সটি-সেভেন চালাচ্ছেন।'

'প্রপ প্লেনে কত ঘণ্টা?'

'এক হাজারেরও বেশি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে। উঠে পড়ুন, দ্রুত ফ্লাইট চেক সেরে নিই।'

আহ্লাদে আটখানা, খুরশিদা বললেন, 'আমি জানি, আমাকে ফোর্ড ট্রাইমোটর চালাতে দেখলে পুরুষ পাইলটরা ঈর্ষায় সবুজ হয়ে যাবে।'

ককপিটে উঠে যে-যার বাকিট সিটে বসার পর কন্ট্রোল ও ইন্সট্রুমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে খুরশিদাকে লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দিল রানা। এঞ্জিনগুলো ও-ই চালু করল, তারপর টেক-অফ ও ল্যান্ডিং পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে খুরশিদার হাতে ছেড়ে দিল কন্ট্রোল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহাত্তর বছরের পুরানো প্লেনটা সাবলীলভাবে চালাতে শিখে গেলেন খুরশিদা। রানা দেখাল স্পীড কিভাবে ঘণ্টায় মাত্র চৌষট্টি মাইলে নামিয়ে আনা যায়, কিভাবে দুটো এঞ্জিনের সাহায্যে চালানো যায়, এবং মাত্র একটা এঞ্জিনের সাহায্যেও ল্যান্ড করা সম্ভব।

'আমার গা শিউরানো অনুভূতি হচ্ছে,' ল্যান্ড করার পর চিৎকার করে জানালেন খুরশিদা। 'কোন রকম ঢাকনি বা আবরণ ছাড়া এঞ্জিনগুলো প্লেনের গায়ে ঝুলে আছে।'

'তখনকার দিনের ডিজাইনাররা এটাকে অত্যাধুনিক বলেছিল।'

বাচ্চাদের নিয়ে তিনটে ট্রিপ দিল রানা। রিফুয়েলিং-এর সময় ট্রাইমোটরের পাশে পার্ক করা ওয়ার্ল্ড ওঅর ওয়ান ফকার-এর দিকে হেঁটে এল ও। এঞ্জিন কাউলিং-এ বসানো গান মাউন্টিং দেখছে, হঠাৎ কোত্থেকে পাশে চলে এল এক লোক, পরনে ফ্লাইং টগ। 'কেমন প্লেনটা?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। গাঢ় ত্বক. চোখ-মুখে তীক্ষ্ণ মিশরীয় বৈশিষ্ট্য। বৈরী, কিংবা জেদি একটা ভাব চোখে। রানাকে যেন লোকটা ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে দেখছে, ভাবটা গোপন রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। যথেষ্ট লম্বা সে, দাঁড়িয়ে আছে টান-টান হয়ে–সামরিক একটা ভঙ্গি। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত, যেন সরাসরি শুধু সামনেই তাকাতে পারে, মণি এদিক ওদিক নড়ে না।

দু'জন দু'জনকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দেখল। নিস্তব্ধতা ভেঙে রানা বলল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিকে খুব ভুগিয়েছিল আপনার এই ফকার। প্রপেলারের পিছনে জোড়া গান মাউন্টিং-এর দিকে আঙুল তাক করল। 'দেখে মনে হচ্ছে জেনুইন।'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'অ্যারিজিনল স্প্যানডাউ ৭.৯২ মিলিমিটার।'

'আর অ্যামিউনিশন বেল্ট? ওগুলোয় তো দেখছি রাউন্ড লোড করা।'

'শুধুমাত্র দর্শকদের ইমপ্রেস করার জন্যে,' কালো লোকটা বলল। 'নিজের যুগে এই ডাইনী ভয়ংকর এক কিলিং মেশিন ছিল। তার সেই রূপটা আমি ধরে রাখতে চাই, দেখাতেও চাই সবাইকে।' দস্তানা খুলে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি মিশরীয় কাফ্রী, নাম খাদেমুল গহর। আপনি তো ট্রাইমোটরের পাইলট তাই না?'

'হ্যাঁ।' রানার কেন যেন অদ্ভুত একটা ধারণা হলো, এই লোক ওকে চেনে।

'আমি মাসুদ রানা।'

'জানি,' বলল গহর। 'আপনি একজন বাংলাদেশী, তবে নুমার সঙ্গে আছেন।'

'আমাদের কি কখনও পরিচয় হয়েছিল?'

'না, তবে এমন একজন আছে যাকে আমরা দু'জনেই চিনি...'

রানা কিছু বলতে যাবে, এই সময় তৃষার চিৎকার ভেসে এল, 'শেষ ফ্লাইটের জন্যে আমরা তৈরি!'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা বলতে যাচ্ছিল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে,' কিন্তু দেখল ফকারের পাইলট দ্রুত ঘুরে নিজের প্লেনের পিছনে সরে যাচ্ছে।

বাচ্চাদের নিয়ে শেষবারের মত আকাশে উঠল রানা। এবারও ওদের সঙ্গে তৃষা থাকছে। খুরশিদার হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে পিছনে চলে এল রানা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে—হাত বাড়িয়ে স্ট্যাচু অভ লিবার্টি আর এলিস আইল্যান্ড দেখাল, এক হাজার ফুট ওপর দিয়ে ওগুলোকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময়। তারপর ককপিটে ফিরে এসে নিজের হাতে তুলে নিল কন্ট্রোল, রওনা হলো ইস্ট রিভার আর ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে।

সাইড উইন্ডো খুলে দিতে ককপিটের ভেতর ঝড়ের মত বাতাস বইছে। বাচ্চা আরোহীরা না থাকলে পুরানো ব্রিজটার তলা দিয়ে প্লেন চালাবার ঝোঁকটা রানা বোধহয় দমন করতে পারত না। অবশ্য সেক্ষেত্রে ফ্লাইং লাইসেন্সটা হারাতে হত ওকে।

রানার মনোযোগ ছুটে গেল ট্রাইমোটরের পাশে, খানিকটা ওপরে, একটা ছায়া চলে আসায়।

প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে বাচ্চাদের আনন্দমুখর চিৎকার ভেসে এল, ফলে কথা বলার জন্যে গলা চড়াতে হলো খুরশিদাকে। 'আমাদের পাশে একটা প্লেন, মিস্টার রানা।'

উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে এক ঝলক লাল রঙের মত দেখাল ফকার ট্রাইপ্লেনটাকে। পনেরো ফুটের বেশি দূরে নয়, ককপিট থেকে খাদেমুল গহর হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে। লোকটার মাথায় একটা লেজার ফ্লাইট হেলমেট, চোখে গগলস্, মাথার মাঝখান থেকে নেমে এসেছে একটা সিল্ক রিবন। পুরানো ফকারটা এত কাছে, পাইলট গহরের চওড়া হাসির ভেতর ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে রানা। যেন একজন অনিষ্টকারীর হাসি। এই হাসি শুধু সে-ই হাসতে পারে, বা শুধু তাকেই মানায়, যার মনে পাপ আছে। তবে রানা ভাবল, ওর ভুলও হতে পারে। ভদ্রতার খাতিরে পাল্টা হাত নেড়ে সাড়া দিতে যাবে, কিন্তু সেই মুহূর্তে অ্যান্টিক প্লেন দিক বদলে চলে গেল।

রানা তাকিয়ে আছে: ট্রাইপ্লেন একটা লূপ তৈরি করল, তারপর অকস্মাৎ সিধে হয়েই ছুটে এল ফোর্ড ট্রাইমোটরের দিকে, তির্যক একটা পথ ধরে আসায় ফরওয়ার্ড পোর্ট সাইডটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'বদ্ধ উন্মাদটা করতে চায় কি?' বিস্ময়ে বিমূঢ় খুরশিদা জিজ্ঞেস করলেন। 'শহরের মাথায় অ্যাক্রব্যাটিক...'

খুরশিদার কথা শেষ হলো না, জোড়া স্প্যানডাউ মেশিন গানের মাজল থেকে

চোখ ঝলসানো আগুন বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে খুরশিদার মনে হলো, ব্যাপারটা আসলে বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে একটা এরিয়াল প্রদর্শনী, সেই সঙ্গে সারপ্রাইজও বটে। তবে পরমুহূর্তেই উইন্ডশীল্ড বিস্ফোরিত হতে ভুলটা ভেঙে গেল। একই সঙ্গে তেলের স্প্রে আর উথলে ওঠা ধোঁয়া দেখতে পেলেন খুরশিদা, ককপিটের সামনের এঞ্জিন সম্ভবত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

পনেরো

বুলেটের ঝাঁক তখনও আঘাত করেনি, তার আগেই বিপদটা টের পেয়ে গেছে রানা। ট্রাইমোটরকে ৩৬০ ডিগ্রি বাঁক ঘোরাতে শুরু করল, অপ্রত্যাশিত এক কৌশলে পৌঁছে গেল ফকারের নিচে ও বাঁ দিকে–তখনও গহর দ্বিতীয় হামলার জন্যে বাঁক ঘোরা শেষ করতে পারেনি। বিরতিগুলোয় না থামতে দিয়ে থ্রটল সবটুকু ঠেলে দিয়ে অনুসরণ করছে রানা, বৃথাই আশা করছে ওটার লেজের পিছনে থাকতে পারবে। আসলে অঙ্কে মেলে না। অক্ষত তিনটে এঞ্জিন নিয়ে ফকার আর তার উন্মাদ পাইলটকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারত রানা। ওর ট্রাইমোটরের টপ স্পীড প্রাচীন ফাইটার প্লেনের চেয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেশি। কিন্তু এখন, একটা এঞ্জিন হারাবার পর, স্পীড তুলে পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

মাঝখানের এঞ্জিনটা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আগুন ধরতে আর হয়তো দু'চার সেকেন্ড বাকি। দু'পায়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে ফুয়েল সিলেক্টরের সুইচ অফ করে দিল ও, তারপর বন্ধ করল থ্রটলের নিচের প্যানেলে বসানো ইগনিশন, দেখল সেন্টার এঞ্জিনের প্রপেলার ধীরে ধীরে হরিজনটাল পজিশনে স্থির হলো।

খুরশিদার চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। 'লোকটা আমাদের গুলি করছে!' হাঁপাচ্ছে সে। 'কেন?'

'জানি না।' দাঁতে দাঁত পিষল রানা।

ককপিটের দরজায় দেখা গেল তৃষাকে। 'প্লেন আকাশের চারদিকে ছুটোছুটি করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে, গলায় অসন্তোষ। 'আপনারা বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন!' হঠাৎ তার চোখে পড়ল এঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, উইন্ডশীল্ডের কাঁচ বলতে কিছু নেই। তীব্র বাতাসটাও যেন এইমাত্র তার গায়ে লাগল। 'কি ঘটছে?' গলার স্বর আতঙ্কে বিকৃত।

'এক পাগল হামলা চালাচ্ছে।'

'লোকটা সত্যিকার বুলেট ছুঁড়ছে আমাদেরকে টার্গেট করে!' চিৎকার করে বললেন খুরশিদা, তীব্র বাতাস ঠেকাবার জন্যে মুখের সামনে একটা হাত তুলে রেখেছেন।

'আমাদের সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে…এরমানে কি?' জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'লোকটা জানে আমাদের প্লেনে কারা আছে,' বলল রানা। 'এ-সব সে গ্রাহ্য করছে না। আপনি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে ভান করুন এটা একটা মজার খেলা। সবাইকে গান ধরতে বলুন। মোটকথা, ওদেরকে ভয় পেতে দেবেন না।' ঘাড় সামান্য ফিরিয়ে খুরশিদার উদ্দেশে বলল, 'রেডিও অন করে মেডে মেসেজ পাঠান। যেই সাড়া দিক, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করুন।'

'সত্যি কারও সাহায্য পাব?'

'সময়মত নয়।'

'তাহলে উপায়?' খুরশিদা ও তৃষা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

রানার বাইরেটা এইমুহূর্তে সম্পূর্ণ শান্ত। ইতোমধ্যে স্পীড বাড়িয়ে দূরে সরে গেছে লাল ফকার, বাঁক ঘুরছে আবার হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে। 'কপালে কি আছে জানি না,' ওদের প্রশ্নের উত্তরে বলল ও। 'তবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব সবাইকে বাঁচানোর।'

তৃষা ও খুরশিদা দু'জনেই রানার মুখে শান্ত-সমাহিত ভাব আর দৃষ্টিতে গম্ভীর আত্মপ্রত্যয় দেখে বিস্মিত হলো। সাহসে বুক বাঁধার প্রেরণা বোধ করল ওরা। দু'জনেই উপলব্ধি করল, কঠিন সব বিপদে ওর মত পুরুষরাই ত্রাতা হিসেবে ভূমিকা রাখে।

খুরশিদা রেডিও অন করে চিৎকার করছেন–মেডে! মেডে! মেডে! তৃষা ঘুরেই ছুটল মেইন কেবিনের দিকে।

আকাশে তল্লাশী চালিয়ে মেঘ খুঁজছে রানার চোখ, ভেতরে ঢুকে ফকারকে ফাঁকি দেবে। কিছু মেঘ আছে, তবে সে-সব কয়েক মাইল দূরে, আর জমিন থেকে অন্তত বিশ হাজার ফুট ওপরে–ট্রাইমোটরের নির্দিষ্ট সিলিঙ-এর চেয়ে তিন হাজার ফুট বেশি উঁচুতে।

মেঘ নেই লুকাবে, এমন কোন জায়গা নেই পালাবে। প্রাচীন ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন যেন খোলা মাঠে অসহায় একটা মেষ শাবক, হিংস্র একটা নেকড়ের হামলার মুখে পড়েছে। সদ্য পরিচিত একজন পাইলট কি কারণে এটা ঘটাতে চাইছে? মাথার ভেতর প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসছে, কিন্তু সহজ কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

প্লেনটাকে ইস্ট রিভারে নামাতে পারে রানা। পানিতে যদি নিরাপদে ল্যান্ড করা সম্ভব হয়, ল্যান্ড করার সময় বাচ্চাদের ও প্লেনের যদি কোন ক্ষতি না হয়, এবং বেশ কিছুক্ষণ ভেসে থাকা যায়, তাহলে, হয়তো...শুরুতেই আইডিয়াটা বাতিল করে দিল রানা। ট্রাইমোটরের আড়ষ্ট ল্যান্ডিং গিয়ার ওয়াটার ল্যান্ডিঙের উপযোগী নয়। তাছাড়া, বাচ্চারা আহত হয়নি দেখে ফকারের পাইলট পানিতে গুলি করলে তারা লুকাবার কোন জায়গাই পাবে না। যে লোক শূন্যে মারতে চাইছে, পানিতেও সে মারতে চাইবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁক ঘুরছে রানা, ট্রাইমোটর নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে।

ডানার ডগা মাটির দিকে তাক করে নদীর ওপর দিয়ে ট্রাইমোটরের পিছু নিল রক্তবর্ণ যমদূত ফকার। ধীরে ধীরে অবশিষ্ট দুটো এঞ্জিনের থ্রটল নিজের দিকে টেনে নিল রানা, শত্রুকে কাছে চলে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে। মিসাইল সহ

আধুনিক একটা জেট ফাইটার এক মাইল দূর থেকে শত্রু-বিমান ফেলে দিতে পারে, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্লেনগুলোকে টার্গেটের একশো গজেরও কম দূরত্ব থেকে ফায়ার করতে হত। রানা আশা করছে ট্রাইমোটরকে গুলি করার জন্যে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ফকারের পাইলট খাদেমুল গহর।

রানার প্লেন পানি লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, পিছু নিয়ে আসা ফকারও অনুকরণ করল, তবে সাইট বরাবর টার্গেটকে না পাওয়ায় গুলি করতে পারছে না। নিচে নামতে নামতে এক সময় রানা দেখতে পেল নদীর দুই তীরেই লোকজন হাঁটা-চলা করছে, একটা ইক্সকারশন বোটের আপার ডেকে বহুলোক জড়ো হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, সেটাকে পাশ কাটাচ্ছে একটা ফায়ারবোট, ফায়ারম্যানরাও দেখছে ওদেরকে, সবাই যেন নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে প্লেনটা পানিতে পড়তে যাচ্ছে।

তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে কন্ট্রোল কলাম টেনে নিল রানা, তারপর এমন একটা কোর্স সেট করল, ট্রাইমোটর সরাসরি ব্রুকলিন ব্রিজের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

বিখ্যাত ব্রিজটা ঝুলে আছে, যেন মাকড়সার প্রকাণ্ড একটা জাল, সাপোর্ট কেইবলগুলো বটগাছের অসংখ্য ঝুরির মত। এই ব্রিজ দিয়ে গড়ে প্রতিদিন দেড় লাখ প্রাইভেট কার, দু'হাজার মোটরসাইকেল আর তিনশো পথিক পার হয়। সমস্ত ট্র্যাফিক দাঁড়িয়ে পড়েছে, ড্রাইভাররা জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে দেখছে দুটো মান্ধাতা আমলের প্লেন সরাসরি ব্রিজ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। পথিক ও মোটর-সাইকেল আরোহীরা ছুটে এসে ভিড় করল রেইলিং-এ, চোখে দেখেও তাদের যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না প্রথম মহাযুদ্ধের একটা ফাইটার প্লেন সত্যি সত্যি পুরানো একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে।

'আল্লাহ! ও আল্লাহ!' খুরশিদা হক চেঁচিয়ে উঠলেন। 'নিশ্চয় আপনি ব্রিজের নিচে দিয়ে যাচ্ছেন না!'

'দেখুন যাই কিনা!' হিসহিস করে বলল রানা।

রানা ভাল করে লক্ষই করল না যে ব্রিজ টাওয়ার মাথার ওপর দুশো একাত্তর ফুট উঠে যাচ্ছে। দ্রুত আন্দাজ করল, পানি আর রাস্তার মাঝখানে ফাঁকা জায়গা একশো পঞ্চাশ ফুট হবে–আসলে ব্যবধানটা একশো পঁয়ত্রিশ ফুট। সেন্টার এঞ্জিন থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আলোর একটা ঝলকের মত ব্রিজের তলা দিয়ে খোলা ও ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাইমোটর, একটা টাগবোটকে ডজ দিয়ে।

মাথার ওপর দিয়ে ব্রিজটাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে বাচ্চারা ভাবল ওদেরকে মজার কসরত দেখানো হচ্ছে, তৃষা উৎসাহ দেয়ায় সবাই তারা একটা ইংরেজি গান ধরল।

কেনেডি, লা গার্ডিয়া ছাড়াও আশপাশের অন্যান্য ছোটখাট এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার খুরশিদা হকের পাঠানো মেডে কল সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল, সেই সঙ্গে টহলরত পুলিস কারগুলোয় খবর পৌঁছে গেল আকাশে একটা বিমানযুদ্ধ শুরু

হয়েছে। খানিক পর কেনেডি এয়ারপোর্টের কন্ট্রোলার তার চীফকে রিপোর্ট পাঠাল, বাচ্চা আরোহীদের নিয়ে ফোর্ড ট্রাইমোটর ইস্ট রিভারের ওদিকে ছিল, হঠাৎ রেডার স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চীফ জানতে চাইলেন, প্লেনটা কি ক্র্যাশ করেছে? কন্ট্রোলার জবাব দিল, সেরকমই মনে হচ্ছে।

ট্রাইমোটর ব্রিজের তলায় ঢুকে পড়তে ধাওয়ারত ফকার পড়ে গেল বিপদে। তিন প্রস্থ ডানা নিয়ে উচ্চতায় প্রায় দোতলা একটা বাড়ি ওটা, ব্রিজের তলা দিয়ে গলবে ঠিকই, তবে একটু এদিক-ওদিক হলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ব্রিজ আর মাত্র কয়েকশো ফুট সামনে, ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়াও সম্ভব কিনা বলা মুশকিল। তবে সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ডের বেশি দেরি করল না আততায়ী লোকটা, ফকারের নাক ওপর দিকে তুলে দিল। ঝাঁক-ঝাঁক কেইবল্ ধনুকের আকৃতি নিয়ে ঝুলে আছে, এক ফুট বাকি থাকতে সেগুলোর ওপর দিয়ে প্লেনটাকে তুলে আনল সে, তারপর একশো আশি ডিগ্রি বাঁক ঘুরে আবার পিছু নিল ফোর্ড ট্রাইমোটরের।

পাথরের মাথায় বসিয়ে রাখা টিনের কৌটার মত সহজ টার্গেট হতে রাজি নয় রানা, ট্রাইমোটরকে পোর্ট উইংটিপ-এর ওপর খাড়া করে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরল, সরাসরি এগারো ও তেরো নম্বর জেটির দিকে এগোচ্ছে, নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে পার হলো সাউথ স্ট্রীট। ওয়াল স্ট্রীটের দুশো ফুট ওপরে পৌঁছে প্লেন সিধে করে নিল, পাশ কাটাল জর্জ ওয়াশিংটনের স্ট্যাচুকে।

কাঁচের টুকরো লাগায় রক্ত বেরুচ্ছে কপাল থেকে, ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত খুরশিদা বললেন, 'দিস ইজ ম্যাডনেস!'

'দুঃখিত,' রানার গলা প্রায় কর্কশ। 'আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।' চওড়া একটা রাস্তা দেখতে পেয়ে কন্ট্রোল কলাম টেনে আনল ও, একটু পর বুঝতে পারল রাস্তাটা ব্রডওয়ে-র নিচের প্রান্ত। আবার একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে নিউ ইয়র্ক স্টক একচেঞ্জ বিল্ডিং, সেইন্ট পল চ্যাপেল ও সিটি হল পার্ককে পাশ কাটাল। ওর প্লেনের পথ অনুসরণ করছে কয়েকটা পুলিস কার, তবে এরকম একটা অসম প্রতিযোগিতায় তারা পারবে কেন। রানার প্লেনের সামনে কোন বাধা নেই। কিন্তু রাস্তায় তো ট্র্যাফিক জ্যাম লেগেই আছে।

কংক্রিটের জঙ্গলে কিছুক্ষণের জন্যে ফকারের পাইলট রানাকে হারিয়ে ফেলল। ইস্ট রিভারের ওপর বৃত্তাকারে একটা চক্কর দিল সে, তারপর এক হাজার ফুট ওপরে উঠে রওনা হলো লোয়ার ম্যানহাটনের দিকে। সাউথ স্ট্রীট সীপোর্ট-এ নোঙর ফেলা উঁচু জাহাজগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসার পর হঠাৎ ককপিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকল, ট্রাইমোটরটাকে খুঁজছে। ঠিক তখনই রোদ লাগায় রূপালি একটা ঝিলিক চোখে পড়ল। গগলস্ ওপরে তুলে অবিশ্বাস ভরা চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে, দেখল আপার ব্রডওয়ে-এর চারপাশে আকাশ ছোঁয়া দালানগুলোর নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ট্রাইমোটর।

রানা আসলে কাঁচ আর কংক্রিটের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে, আশা করছে ফকারের উন্মাদ পাইলটকে পুলিসের হেলিকপ্টার ধাওয়া করে কোথাও ল্যান্ড করতে বাধ্য করবে।

কিন্তু হঠাৎ ট্রাইমোটরের নিচের পেভমেন্ট বিস্ফোরিত হলো, ঘাড় ফেরাতেই লাল ফকারকে পিছনে দেখতে পেল রানা, ৭.৬২ শেল ছুঁড়েছে এক পশলা।

শেলগুলো হলুদ একটা ট্যাক্সিক্যাবের ছাদ চিরে দিয়ে রাস্তার কোণে বসানো ডাকবাক্সে আঘাত করল, নেহাতই ভাগ্যের জোরে কেউ আহত হয়নি।

প্রথমে রানা ভাবল, ট্রাইমোটর বড় বাঁচা বেঁচে গেছে, কিন্তু তারপরই খেয়াল করল কন্ট্রোল ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না। দ্রুত চেক করায় ধরা পড়ল রাডার বা স্টিয়ারিং স্টিক নড়বড় করছে, আর এলিভেটরগুলো কোন সাড়াই দিচ্ছে না।

'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলেন খুরশিদা।

'আমাদের এলিভেটরে গুলি লেগেছে। প্লেন আর ওপরে তুলতে পারব না।'

ধূর্ত পাইলট ফকারকে ট্রাইমোটরের সরাসরি পিছনে রাখছে, রানা যাতে ওটার অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না পায়। রানার অনুরোধ শুনে খুরশিদা জানালেন সিট বেল্ট খুলে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে তাঁর আপত্তি নেই।

'প্লীজ!'

কেবিনের দরজায় আবার দেখা গেল তৃষাকে। 'ওদের আনন্দ না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ব্যাপারটাকে ওরা এখনও অনুষ্ঠানের অংশ মনে করছে।'

'যদি বলতে পারতেন যে যার আল্লাহকে ডাকো তাহলে ভাল হত।' নিচে তাকিয়ে রানা আন্দাজ করল ওরা গ্রীনউইচ ভিলেজের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু পরই নিচে দেখা গেল ইউনিয়ন স্কয়্যার পার্ক। সামনে থেকে টাইমস্ স্কয়্যারকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। শহর কাছে চলে আসছে দেখে প্লেনটাকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু এলিভেটর কন্ট্রোল সাড়া দিতে ব্যর্থ হলো। অগত্যা সোজা এবং সরল একটা রেখার ওপর, একই লেভেলে থাকতে হচ্ছে রানাকে। ব্রডওয়ে যতক্ষণ পশ্চিমদিকে সামান্য মোচড় খেয়ে এগোবে ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই, কিন্তু প্যারামাউন্ট প্লাজার কাছে ফরটি-এইটথ্ স্ট্রীটে যখন বাঁক নেবে তখন সত্যিকার বিপদে পড়তে হবে ওকে। এলিভেটর তো কোন কাজে আসছেই না, রাডার-এর কাছ থেকেও সাড়া পাবার জন্যে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে—শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চাপ দিতে হচ্ছে পেডালে। এরকম জটিল পরিস্থিতিতে হিসেবের সামান্য একটু ভুল, কন্ট্রোল হুইলের এতটুকু ইতস্তত ভাব প্লেনটাকে সোজা নিয়ে যাবে আকাশ ছোঁয়া যে-কোন একটা বিল্ডিঙের গায়ে।

দরদর করে ঘামছে রানা। ঠোঁট শুকিয়ে কাগজের মত খসখসে। নিউ ইয়র্ক শহরের অসংখ্য বিল্ডিঙের দেয়াল মনে হলো ওর নাগালের এত কাছে যে জানালা দিয়ে হাত বের করে দিলেই যেন ছুঁতে পারবে।

সামনের রাস্তাটা এত লম্বা যে বোঝাই যায় না কোথায় শেষ হয়েছে। যত কাছে সরে আসছে ততই যেন সরু হয়ে যাচ্ছে ওটা, তারপর এক সময় বহুদূরে মিলিয়ে গেছে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকজন মুখ তুলে বোকার মত তাকিয়ে আছে—দেখছে ব্রডওয়ে-র মাঝখানে, রাস্তা থেকে দশতলা ওপর দিয়ে, ছুটে চলেছে একটা ট্রাইমোটর। জোড়া এঞ্জিনের গর্জন বিল্ডিংগুলোকে যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে, প্লেন মাথার ওপর চলে আসার অনেক আগে থেকে শুনতে পাচ্ছে তারা।

প্লেনের নাক উঁচু করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। থ্রটল টেনে এনে স্পীড ঘণ্টায় সত্তর মাইলে নামিয়ে আনল, ঘণ্টায় আর ছয় মাইল কমালে প্লেন এগোবে না।

লাল ফকারের পাইলট দক্ষ ফ্লায়ার, তার আচরণ একটা মুরগীর পিছু নেয়া চতুর শেয়ালের মত। রানার এই যুদ্ধে পুঁজি হচ্ছে নিখাদ সাহস বা অন্যায়ের কাছে হার না মানার নির্ভীক জেদ। যুদ্ধটা এমন দু'জন লোকের মধ্যে যাদের নৈপুণ্য ও টেকনিক, ধৈর্য ও নিষ্ঠা সমান সমান। রানা অবশ্য একা নিজের নয়, নিজের সঙ্গে আরও পনেরোটা প্রতিবন্ধী শিশু ও দু'জন ভদ্রমহিলার প্রাণ রক্ষার জন্যে লড়ছে। আরও একটা চিন্তা সারাক্ষণ আতংকিত করে রেখেছে ওকে, জনবহুল কোন রাস্তায় বা লোক ভর্তি কোন অফিস বিল্ডিঙে ট্রাইমোটর বিধ্বস্ত হলে নিরীহ আরও না জানি কত লোক প্রাণ হারাবে। প্লেন শুধু তো আর বিধ্বস্ত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিস্ফোরিতও হবে। বিস্ফোরণের আগুন কতদূর ছড়াবে কে জানে।

রানার পিছনে জানালার এত কাছে সারি সারি বিল্ডিং দেখতে পেয়ে শিশুদের মনে এই প্রথম ভয়ের একটু ছোঁয়া লাগল। তারপরও নাচের তালে তালে তুষার করতালি আর সকৌতুক হাসিতে উৎসাহ পেয়ে এখনও তারা গান গাইছে। তুষার নাচ, গান, করতালি ও হাসি, সবই কৃত্রিম; বেচারি ভয়ে এমন কি জানালার দিকে তাকাচ্ছেই না।

জানালার বাইরে অফিস বিল্ডিংগুলো ঝাপসা একটা প্রবাহের মত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে, গ্লাস-উইন্ডোর পিছনে কর্মচারীদের হতবিহ্বল মুখ।

এক হাজার ফুট ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে ফকারের আততায়ী পাইলট অবাক হয়ে দেখল ব্রডওয়ের দোকানপাট আর দালানের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ট্রাইমোটর। দুর্ঘটনা যে অবধারিত, এটা সে বুঝতে পারছে। প্রশ্ন স্রেফ সময়ের। না, তার কোন তাড়া নেই। ঠিক এখুনি ডাইভ দিয়ে গুলি করার কোন তাগিদ বা প্রয়োজন বোধ করছে না।

একটা পুলিস হেলিকপ্টারকে ধাওয়ায় যোগ দিতে দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, রীতিমত কৌতুক বোধ করল সে। ফকার ও ফোর্ডের মাঝখানে রয়েছে ওটা, ছাদগুলোর ঠিক ওপর দিয়ে উড়ছে।

ঠাণ্ডা ও হিসেবী, সাবধানে কন্ট্রোল স্টিক সামনে ঠেলে দিল সে, ফকারের নাক নিচের দিকে নামিয়ে তাক করল সরাসরি হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজে। একজন পুলিস ফকারের ওপর চোখ রাখছে, তাকে উন্মত্তের মত চিৎকার করতে দেখা গেল, হাত ওপর দিকে তুলে পাইলটকে দেখাচ্ছে। আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে হেলিকপ্টার ঘুরে গেল, কিন্তু পুলিস সদস্যদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র মেশিন গানের সঙ্গে পারবে কেন! জোড়া মাজল থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে রোটরের নিচে এঞ্জিনটাকে চুরমার করে দিল। গান ফায়ার চলল মাত্র তিন সেকেন্ড। এই তিন সেকেন্ডেই প্রজাপতির মত সুন্দর একটা ফ্লাইং মেশিন ভাঙাচোরা ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে আকাশ থেকে খসে পড়ল একটা ভবনের ছাদে।

আবর্জনার ছোটখাট কিছু টুকরো রাস্তার ওপরও পড়ল, তবে ভাগ্যগুণে কেউ আহত হয়নি। ছাদটার ওপর লোকজন ছিল, তারা সময় মত সাহস করে ছুটে

আসায় কপ্টারের তোবড়ানো ককপিট থেকে পুলিস দু'জনকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল। দু'জনেরই কয়েকটা করে হাড় ভেঙেছে, হাত ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, তবে কারও আঘাতই এতটা গুরুতর নয় যে মারা যাবে।

গোটা ব্যাপারটা অমানবিক। ফকার পাইলটের এই আচরণের পিছনে যৌক্তিক কোন কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সে খুব ভাল করে জানে ট্রাইমোটর আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আকাশে টিকবে, কাজেই পুলিস হেলিকপ্টার দেখার পর ধাওয়া বাদ দিতে পারত। কপ্টারটাকে ফেলে দেয়ার পিছনে আত্মরক্ষার তাগিদ কাজ করেনি। ঠাণ্ডা মাথায় মজা লুটতে চেয়েছে লোকটা। ট্রাইমোটরকে আবার ধাওয়া শুরু করার আগে বিধ্বস্ত কপ্টারের দিকে ভাল করে একবার তাকালও না সে।

পিছনে কি ঘটছে রানা জানে না। ককপিটের সাইড উইন্ডো দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে ছিলেন খুরশিদা হক, তাই তিনি রোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। দেখে এমন ভয় পেলেন যে মুখ খোলার শক্তি পর্যন্ত নেই।

রানার সামনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, সত্তর ফুট উঁচু স্ট্যাচু। বাম ডানার নয় কি দশ ফুট তফাত দিয়ে পাশ কাটাল ওটাকে। বাঁক ঘুরে চলে এল সেন্ট্রাল পার্কের ওপর।

পার্কে হাজার হাজার মানুষ। গ্রীষ্মকালের উষ্ণ বিকেল উপভোগ করতে এসেছে সবাই। সব কিছু ভুলে মাথার ওপর অনুষ্ঠিত নাটকটা দেখছে তারা। গোটা শহর থেকে অসংখ্য পুলিস কার বিভিন্ন রাস্তা ধরে এই পার্কের দিকে ছুটে আসছে, পুরোদমে সাইরেন বাজিয়ে। ফিফথ্ অ্যাভিনিউ-এর দিক থেকে আরও কয়েকটা পুলিশ হেলিকপ্টারকে আসতে দেখা গেল, ওগুলোর পিছু নিয়েছে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের একঝাঁক কপ্টার।

'আবার হামলা করছে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন খুরশিদা হক। 'আটশো ফুট ওপর থেকে আমাদের লেজ লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে!'

রানা দিক বদলাতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করলে কোন রকমে বাঁকও ঘুরতে পারে, কিন্তু এলিভেটর কাজ না করায় এক ফুট ওপরেও উঠতে পারবে না। ওর মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হলো। এই প্ল্যান কাজে লাগবে শুধু লাল ফকার যদি গুলি করতে করতে ট্রাইমোটরের সরাসরি ওপর দিয়ে সামনের দিকে উড়ে যায়।

মিডল্ এঞ্জিনের ইগনিশন ও ফুয়েল সুইচ 'অন' পজিশনে রাখল রানা। তোবড়ানো এঞ্জিন খকখক করে কাশল বার কয়েক, তারপর আবার ঠিকমত ঘুরতে শুরু করল। এবার ডানদিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে, জানে পিশাচ পাইলট বজ্রের মত নেমে আসছে ওপর থেকে। এড়িয়ে যাবার অ্যাকশন মুহূর্তের জন্যে পাইলটকে হতচকিত করে তুলল, মেশিন গান থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের দুটো ধারা ফোর্ডের অনেকটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফকারের পাইলট দ্রুত নিজের ভুল শুধরে আবার মেশিন গান চালাল। রানা অনুভব করল ওর ট্রাইমোটরের আপার উইং-এ আঘাত করছে বুলেট, ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে স্টারবোর্ড এঞ্জিনটাকে। এঞ্জিনের পিছনে উথলে উঠল কমলা শিখা, তবে ওটার সিলিন্ডারগুলো এখনও খুব জোরেই ঘুরছে। প্লেনটাকে মোচড় খাইয়ে ইউটার্ন নিল। আরও এক পশলা বুলেট ককপিটে ঢুকে কন্ট্রোল প্যানেল চুরমার

করে দিল। তবে এবার রানার পালা। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল ও। ভাঙা উইন্ডশীল্ডের ওপর দিয়ে সগর্জনে সামনে ছুটে যাচ্ছে লাল ফকার।

তিনটে থ্রটলই সামনে ঠেলে দিল রানা। ওর দুটো এঞ্জিনের যা শক্তি, ফকারের স্পীডের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারবে। ওর মাঝখানের এঞ্জিনটা শুধু সিলিন্ডারের ওপর সচল থেকে ধোঁয়ার ঘন মেঘ আর তেল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সবগুলো থ্রটল সামনে ঠেলতে যা দেরি, ট্রাইমোটর প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে কামানের গোলার মত ছুটল।

লাল ককপিটে বসা লোকটা অনেক দেরিতে লেদার হেলমেট পরা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেল রূপালি ট্রাইমোটর শিকারি বাজপাখির মত তার বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। দ্রুত ওপরে উঠতে গিয়ে তিন ডানার ডগায় খাড়া হয়ে গেল ফকার। তিন প্রস্থ ডানা নিয়ে নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে এই ওপরে উঠতে যাওয়াটাই তার কাল হলো। ট্রাইমোটরের বড় একটা ল্যান্ডিং হুইল কাঠ ভেঙে, কাপড় ছিঁড়ে ওপরের উইংটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

রানা শুধু দেখার সুযোগ পেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ফকার,. এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ওটার পাইলট হাত তুলে ওকে দেখে নেয়ার ভঙ্গিতে শাসাচ্ছে। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা গাছের মাথায় পড়তে যাচ্ছে প্লেনটা।

সেন্টার আর স্টারবোর্ড এঞ্জিন ট্রাইমোটরকে একটা জ্বলন্ত মশালে পরিণত করার আগে ওগুলো বন্ধ করে দিল রানা। প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কিন্তু আহত ঘোড়ার মত, যে কখনও সামনে ছুটতে দ্বিধা করেনি, পুরানো যান্ত্রিক পাখিটাও বাতাস কামড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়ছে প্লেন. একটা মাত্র অক্ষত এঞ্জিন ফুল আরপিএম-এ ছুটছে। একই লেভেলে থেকে একটা বৃত্ত তৈরি করছে রানা, বড়সড় ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ল্যান্ড করা যায়।

ফাঁকা জায়গা এদিকে একটাই, নাম শীপ মেডো। অগুনতি মানুষ পিকনিক করতে বা গায়ে রোদ মাখতে এসেছে, সবাই তারা বুলেটে ঝাঁঝরা ট্রাইমোটরকে নেমে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত পিঁপড়ের মত চারদিকে ছুটতে শুরু করল। কারও মনে সন্দেহ নেই যে নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে ওটা।

রানাও জানে, যে-প্লেনের ওপর প্রায় কোন নিয়ন্ত্রণই নেই সেটাকে নিরাপদে ল্যান্ড করানো সম্ভব নয়। থ্রটল ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে ট্রাইমোটরকে ঘাসের দিকে খসে পড়তে দিচ্ছে ও। এছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

হাজার দুয়েক লোক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। গোটা মাঠে কোন শব্দ নেই। প্লেনটাকে কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও সেটা ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

জমিনের কাছাকাছি এসে ট্রাইমোটর এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। তারপর বড় হুইলগুলো নেমে এল ঘাসে। ফুটবলের মত দু'বার ড্রপ খেলো ট্রাইমোটর, শেষবার টেইল হুইলও জমিন স্পর্শ করল। সবাইকে স্বস্তি আর আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কিছু দূর গড়িয়ে স্থির হলো রূপালি ফোর্ড। দর্শকদের মধ্যে ভুলেও কেউ বিশ্বাস করেনি এটা সম্ভব।

এটাই বা কে বিশ্বাস করবে যে জ্বলন্ত প্লেনের কেবিনে বসে তৃষার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখনও গান গাইছে পনেরোজন প্রতিবন্ধী শিশু?

লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে অবশিষ্ট এঞ্জিনটাও বন্ধ করে দিল রানা, তাকিয়ে থেকে দেখল প্রপেলারের থেমে যাওয়া। চরম সংকটে সাহায্য করায় ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে খুরশিদা হকের দিকে ফিরল ও, কিন্তু তাঁকে দেখে কথা বলতে সাহস পেল না, কারণ তার মুখের সব রঙ মুছে গেছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর ঘাড়ে আঙুল ঠেকাল রানা, পালস খুঁজছে। তারপরই খসে পড়ল ওর হাত, শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

তৃষাকে ককপিটের দরজায় দেখা গেল। 'ইউ ডিড ইট!' উল্লাসে তার ফেটে পড়ার অবস্থা।

'বাচ্চাগুলো?' রানার গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

'কেউ আহত হয়নি।' তারপর কো-পাইলটের সিটের পিছনটা দেখতে পেল তৃষা, প্রায় মাপা একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে ছোট ছোট ফুটো—ফকারের মেশিন গান থেকে করা গুলির কাজ।

অটল পাথুরে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে তৃষা। গম্ভীর ও নিরানন্দ চেহারা, তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল রানা। প্রথমে তৃষা মানতে চাইল না যে খুশি আন্টি বেঁচে নেই। কিন্তু নিচে তাকিয়ে ককপিটের মেঝেতে রক্ত দেখার পর কঠিন, মর্মান্তিক সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল সে।

শোক, তার সঙ্গে দিশেহারা একটা ভাব চোখে-মুখে, জানতে চাইল, 'কেন?' গলার সুরে হাহাকার। 'এরকম কেন ঘটবে? খুশি আন্টির মারা যাবার কোন কারণ ছিল না।'

প্লেনটাকে ঘিরে কয়েকশো মানুষের ভিড় জমে গেছে। আশপাশের রাস্তা থেকে পিল পিল করে আরও বহু মানুষ ছুটে আসছে কি ঘটনা জানার জন্যে। কিন্তু রানার কাছে কেউ যেন তারা দৃশ্যমান নয়, তাদের সম্মিলিত উল্লাস ও আনন্দধ্বনি যেন ওর কানে পৌঁছাচ্ছে না। তৃষাকে ও বলল, 'ওই লোকটা একা শুধু আপনার খুশি আন্টিকে খুন করেনি। আরও বহু মানুষ তার হাতে অকারণে মারা গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল তৃষা। 'এভাবে একে একে সবাইকে আমার হারাতে হবে? কেন? কেন?'

'এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে, তৃষা,' নিচু গলায়, অভয় ও সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল রানা। 'আমার ধারণা, এ-সবের পিছনে ফ্যালকন করপরেশন-এর ভূমিকা আছে।'

ষোলো

হেলিকপ্টার নিয়ে ডাক্তাররাও পৌঁছেছেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের সামান্য কাটা-ছেঁড়া পরীক্ষা করে ওষুধ-পত্র দিলেন তাঁরা। আরেক হেলিকপ্টার থেকে নামল তাদের মা-বাবা ও অভিভাবকরা, বাচ্চাদের বহাল তবিয়তে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সবাই।

শোকে কাতর ও ম্রিয়মাণ তৃষার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, খুরশিদা হকের লাশ ট্রাইমোটর থেকে বের করে একটা অ্যামবুলেন্সে তোলা হচ্ছে। প্লেনটাকে পুলিস বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলার পর রানা ও তৃষাকে একটা পুলিস কারের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ওদেরকে কাছাকাছি একটা থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

তার আগে ট্রাইমোটরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল রানা। বুলেটে ঝাঁঝরা, ক্ষতবিক্ষত ওর এই প্রিয় অ্যান্টিকটি এতগুলো মানুষকে নিয়ে কিভাবে আকাশে ভেসে ছিল, এটা খুবই বিস্ময়কর লাগছে এখন। ল্যান্ডিং হুইলের ওপর ফেন্ডারে একটা হাত রেখে বিড় বিড় করল ও, 'ধন্যবাদ।'

এরপর রানা পুলিস কারের অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, থানায় যাবার পথে বিধ্বস্ত ফকারটাকে ও একবার দেখতে পারে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের কারে ওদেরকে উঠতে বলল অফিসার।

লাল ফকারকে দেবদারু গাছের মাথায়, মাটি থেকে বিশ ফুট ওপরে, ছেঁড়া ও দোমড়ানো-মোচড়ানো একটা ঘুড়ির মত লাগল দেখতে। ইতোমধ্যে দমকল বাহিনীর গাড়ি পৌঁছে গেছে। মই-এর ভাঁজ খুলে গাছে উঠছে একজন ফায়ারম্যান। পুলিস কার থেকে নেমে প্লেনের নিচে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। গাছের ওপর আটকে আছে ফকারের শুধু খোলসটা, মাউন্টিং থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা এঞ্জিন খসে পড়েছে নিচে, বেশ খানিকটা ডেবে গেছে নরম মাটিতে। এঞ্জিনটা দেখে চোখ কপালে উঠে যাবার অবস্থা হলো ওর। কিসের পুরানো, নয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট একশো দশ হর্সপাওয়ারের সম্পূর্ণ নতুন একটা এঞ্জিন! তারপর রানা খোলা ককপিটে তাকাল।

ককপিট খালি।

গাছটার ডালপালার ওপর চোখ বুলিয়ে মাটিতে চোখ নামাল রানা। অদূরেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা লেদার ফ্লাইং জ্যাকেট, হেলমেট ও গগলস্ সহ। গগলসের লেন্সে সামান্য একটু রক্তের দাগ। পাইলটের চিহ্ন বলতে এইটুকুই।

বলা যায় প্রায় ভোজবাজির মতই গায়েব হয়ে গেছে লোকটা।

পুলিস স্টেশনে তৃষাকে অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছে, এই ফাঁকে স্থানীয় এক এয়ারক্রাফট-মেইনটেন্যান্স কোম্পানিকে ফোন করে ওর ট্রাইমোটরটাকে মেরামত করে ওয়াশিংটনের একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে বলল রানা, পুরানো গাড়ি ও এরোপ্লেনের কালেকশন যেখানে রাখে ও। তারপর নুমার চীফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে সংক্ষেপে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল।

পুলিস স্টেশনের শেরিফের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন হ্যামিলটন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, যা ঘটেছে তার একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দেবে রানা ও তৃষা, তারপরও কোন প্রশ্ন করার থাকলে নুমা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে, ব্যক্তিগতভাবে রানা বা তৃষাকে আর থানায় যেতে হবে না।

তৃষাকে নিয়ে পুলিস স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এল রানা। দু'জন প্রায়

একযোগে হঠাৎ খেয়াল করল পরস্পরের হাত ধরে আছে ওরা। তৃষার মনে পড়ল রানাই প্রথমে তার হাত ধরেছিল। তখন সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়নি। তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তার ইচ্ছে করছে না হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। 'জানেন,' নিচু, ম্লান গলায় বলল সে, 'খুশি আন্টির এই মৃত্যু কোনদিনই আমি মেনে নিতে পারব না। মাকে হারিয়েছি দশ বছর বয়সে, খুশি আন্টির মধ্যে আমি আমার সেই মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। বাবাও তাঁকে খুব ভাল জানতেন।'

'ডক্টর ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের। বিশেষ করে আমি চাইছিলাম, তাই বিয়ে করতেও রাজি হয়েছিলেন ওঁরা।'

'বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তাই এতসব পারিবারিক প্রশ্ন করতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'উনি কি আপনার বাবার আবিষ্কার ও প্রজেক্ট সম্পর্কে সব কথা জানতেন?'

'সব জানতেন কিনা বলতে পারব না। বাবা তো আসলে প্রায় কাউকেই কিছু বলতে চাইতেন না। তবে খুশি আন্টি অনেক কিছুই জানতেন, কারণ বাবার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি।'

'আপনার বাবা আপনাকেও তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা দেননি কখনও?'

মাথা নাড়ল তৃষা। 'কিছু জিজ্ঞেস করলে একটাই জবাব দিতেন, কোন বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর কাজ ব্যাখ্যা করে বোঝানো অসম্ভব। নিজের কাজ সম্পর্কে মাত্র একবারই লেকচার দেন আমাকে–সেটা ওই ওয়াটার লিলিতে। তাঁর যে এঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট অনুসরণ করে জাহাজটার এঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে, সেটা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। এক রাতে ডিনারে বসে ওগুলোর ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক প্রিন্সিপল ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।'

'শুধু এই একবার? আর মাত্র এই একটা বিষয়ে?'

'লাউঞ্জে বসে কয়েক ঢোক মার্টিনি খাবার পর বাবা অবশ্য এও আমাকে বলেছিলেন যে হাজার বছরের সেরা একটা আবিষ্কার তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম একটু নেশা হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সত্যি বলে মনে করছেন।'

'তাহলে যা কিছু জানতেন আপনার খুশি আন্টি একাই?'

'না। ফাহিম চাচাও বাবার অনেক কথা জানেন। ওঁরা দু'জন একসঙ্গে পি.এইচ.ডি করেছিলেন। বাবা এঞ্জিনিয়ারিঙে, ফাহিম চাচা কেমিস্ট্রিতে।'

'আপনি জানেন, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে?'

'জানি।'

'আর আপনার বাবার ল্যাবরেটরি? সেটা কোথায়?'

'জিনি টেইলর ফিল্ডের কাছাকাছি, বাড়ির সঙ্গেই ল্যাবরেটরি। ফাহিম চাচাও ওখানে থাকেন।'

'আপনার ফাহিম চাচাকে একটা ফোন করতে পারেন?'

'কোন বিশেষ কারণ?'

'ফোনে আপনি তাঁকে বলতে পারেন হাজার বছরের সেরা আবিষ্কারটা

সম্পর্কে জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। না, সারা দুনিয়া।

নুমা হেডকোয়ার্টারের রিশেপসন হলে টানা এক ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হলো অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানী ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল হকের মৃত্যুরহস্য, ওয়াটার লিলির এঞ্জিনের ডিজাইন, ক্রুজ শিপের করুণ পরিণতি, নুমা সার্ভে শিপ হাইজ্যাক, ক্রু ও বিজ্ঞানীদের সহ সেটা উদ্ধার, সিআইএ-র পরবর্তী তৎপরতা, এফবিআই-এর ভূমিকা, প্রবাসী অ্যাফ্রো-এশীয় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নির্দিষ্ট এয়ার শোতে টেরোরিস্টের হামলা ইত্যাদি বিষয়ে ঝাঁক-ঝাঁক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো তাঁকে।

সংবাদ সম্মেলন শেষ করে তিনি যখন নিজের আউটার অফিসে ঢুকলেন, দেখলেন ল্যারি কিং তাঁর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে।

প্রায় দশ মিনিট হলো চীফের আউটার অফিসে ঢুকেছে কিং। যে চেয়ারটায় বসেছে, তার পাশেই মেঝেতে পড়েছিল ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা। পুরানো লেদার কেসের প্রতি বিশেষ একটা দুর্বলতা আছে তার। সে ধরে নিল জিনিসটা বাতিল ভেবে কেউ ফেলে গেছে। আপন মনে হাসল কিং। ভাবল, ভালই হলো, সঙ্গের এই একগাদা কাগজ-পত্র এই কেসটায় ভরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে সে, কারণ সাধারণ ব্রিফকেসের চেয়ে এটা আকারে কিছুটা বড়, আকৃতিটাও একটু বেশি চৌকো। চীফকে ফিরতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, তাঁর পিছু নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরুল।

'নতুন কিছু, ল্যারি?' ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন হ্যামিলটন।

'ভাবলাম হাইজ্যাকারদের জাহাজ পানি থেকে তোলার সিআইএ প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে চাইবেন আপনি,' বলল কিং, লেদার কেস খুলে একটা ফাইল ফোল্ডার বের করল।

চশমার ওপর দিয়ে কিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ইনফরমেশন তুমি পেলে কোত্থেকে? সিআই এখনও তাদের এই ডাইভ প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই আমাদেরকে জানায়নি। আমি জানি কাজটা তারা শুরু করেছে–' হাতঘড়িতে চোখ বুলাবার জন্যে থামলেন–'মাত্র দশ ঘণ্টা আগে।'

'প্রজেক্ট ম্যানেজার কড়া হুকুম দিয়েছেন প্রতি ঘণ্টায় ডাটা প্রোগ্রাম মনিটর করে জানাতে হবে তাঁকে। বলতে পারেন, ওরা যখন যেটা আবিষ্কার করবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা আমরা জানতে পারব।'

'ওরা যদি জানতে পারে ভীনাস সিআই-এর সিক্রেট ফাইল হ্যাকিং করছে, আমাদের বিশ-বাইশ রকমের নরক দেখিয়ে ছাড়া হবে।'

ল্যারি কিং-এর মুখে শয়তানি হাসি। 'বিশ্বাস করুন, অ্যাডমিরাল, ওরা কখনোই কিছু জানতে পারবে না। ভীনাস ডাটা সংগ্রহ করছে স্যালভিজ জাহাজের কমপিউটর থেকে, ওগুলো ক্রিপটোগ্রামড্ অবস্থায় অ্যানালিসিসের জন্যে হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে পাঠানোর আগেই।'

এবার অ্যাডমিরালের পালা, তবে তিনি শয়তানি হাসির বদলে প্রশ্রয়দানের হাসি হাসলেন।

'আর, সার, বিশ-বাইশটা নরকের কথা যেটা বললেন, আমি জানি ওটা আপনার কৌতুক।' হাসছে কিং। 'কেউ জানে না, শুধু প্রেসিডেন্ট আর আপনি জানেন. সিআইএ বা এফবিআই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে গোপন খবরের সবচেয়ে বড় গুদাম আসলে নুমা। প্রয়োজনে আমরাই বরং ওদেরকে নরক দেখিয়ে ছাড়তে পারি।'

'বলছ কেউ জানে না, তাহলে তুমি জানলে কিভাবে?' অ্যাডমিরাল গম্ভীর।

'আমি জানি ভীনাসের কল্যাণে,' বলল কিং। 'সার, আমি এ-ও জানি যে ক্ষেত্রবিশেষে নুমার ক্ষমতা এত বেশি, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আদেশ পর্যন্ত আমরা অমান্য করতে পারি–তাঁকে এড়িয়ে কংগ্রেসের বিশেষ একটা কমিটিকে ব্যাখ্যা করতে পারি কেন তাঁর আদেশ আমরা মানতে পারছি না।'

'এ-সব তথ্য শুধু গোপনীয় নয়, বিপজ্জনকও,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে চাকরি খোয়াতে হত, জেলও খাটতে হত।'

'আমি জানি, সার,' বলল কিং। 'তবে আপনিও জানেন এ-সব তথ্য আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে, আর কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে, বলো, কি জানতে পারল ভীনাস।'

ফাইল ফোল্ডার খুলে পড়তে শুরু করল কিং। 'হাইজ্যাকারদের ওটা একশো ত্রিশ ফুটী ক্রু/ইউটিলিটি ওঅর্ক বোট, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোর টাসকান বোট ইয়ার্ডে তৈরি। ইন্দোনেশিয়ার অফশোর অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভিস দেয়ার জন্যে ওটার ডিজাইন তৈরি করা হয়। স্পীড ও ফ্লেক্সিবিলিটি অত্যন্ত বেশি...'

'জানা গেছে কে ওটার মালিক?'

'সর্বশেষ চুক্তি ছিল বোরম্যান অয়েল কোম্পানির সঙ্গে, সলেক্সোকো-র একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এই বোরম্যান অয়েল।'

'সলেক্সোকো,' অ্যাডমিরালের গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরুল। 'আমি তো জানি বিক্রি হয়ে যাবার পর সলেক্সোকো-র আর কোন অস্তিত্বই নেই।'

'কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেল থেকে ইন্দোনেশিয়ার মূল আয়টাই বন্ধ হয়ে যায়।'

'সলেক্সোকোটা কে যেন কিনে নেয়?'

চোখ তুলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে হাসল কিং। 'সলেক্সোকো-র দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার পর ফ্যালকন করপরেশন ওটার বিলুপ্তি ঘোষণা করে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন আডমিরাল। 'খবরটা শোনার সময় নাথান করবেটের চেহারা কেমন দেখাবে?'

'সরাসরি কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না,' বলল কিং। 'বোটের মালিকানা কখনোই ট্র্যান্সফার করা হয়নি। আমাদের লাইব্রেরী চেক করে দেখা হয়েছে, উনিশশো নিরানব্বুই সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ওই বোটের কোন হদিশ নেই। আর এ-ও বিশ্বাস করা যায় না যে হাইজ্যাকাররা এমন কোন প্রমাণ রাখবে যা দেখে বোটটার সঙ্গে ফ্যালকনের সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।'

'সিআইএ এজেন্টরা হাইজ্যাকারদের কারও পরিচয় জানতে পেরেছে?'

'লাশগুলোর যে অবশিষ্ট পাওয়া গেছে, পরিচয় জানার জন্যে যথেষ্ট নয়,' বলল কিং। 'লেগুনের মুখে যে গার্ডটা পড়েছিল, তার লাশ ভাটার সঙ্গে সাগরে ভেসে গেছে। রানা যা সন্দেহ করেছে সেটাই বোধহয় ঠিক, হাইজ্যাকাররা একটা মার্সেনারি সংগঠন কোবরা ক্লাবের সদস্য। বেশিরভাগই এরা ইউএস আর্মি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছে।'

অ্যাডমিরালকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তোমার ভীনাস এ-সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে, ফ্যালকনের মত এত বড় একটা করপরেশন পাইকারি হারে মানুষ খুন করতে গেল কেন?'

মাথা নাড়ল কিং।

'কোন থিওরিই দিতে পারছে না?'

'না, অর্থবোধক বা বোধগম্য কোন সিনারিয়ো ভীনাস তৈরি করতে পারছে না।'

'চাবি হয়তো ডক্টর সিরাজুল ইসলাম,' অনেকটা জনান্তিকে বিড় বিড় করলেন হ্যামিলটন।

'ভীনাসকে আমি ভদ্রলোকের লাইফ নিয়ে রিসার্চ করতে বলব।'

নিজের বিশাল কমপিউটর ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে কীবোর্ডের সামনে বসল কিং। ভীনাসকে ডাকল, তারপর শূন্যে তাকিয়ে বসে থাকল। ইতোমধ্যে হলোগ্র্যাফিক আদল নিয়ে উদয় হয়েছে ভীনাস, নীরবে অপেক্ষা করছে। অবশেষে এক সময় মুখ তুলে তাকাতে কনসোলের ওপর তাকে দেখতে পেল কিং।

'আমি যখন অ্যাডমিরালের কাছে ছিলাম, এরমধ্যে কিছু ঘটেছে?' জানতে চাইল সে।

'বোম্বেটে ক্রুদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে স্যালভিজ ডাইভাররা। কাপড় আর অস্ত্র ছাড়া কারও কাছে কিছু পাওয়া যায়নি—না মানিব্যাগ, না আইডি কার্ড, না নোটবুক। হাইজ্যাকিং-এর চার্জে যে-ই থাকুক, গোপনীয়তা রক্ষায় উঁচুদরের এক্সপার্ট লোকটা।'

'এই প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে আমি তোমাকে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের জীবনীর ওপর গবেষণা করাতে চাই।'

'উদ্ভাবক আর আবিষ্কারক ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'দেখছি সাধারণ জীবনীর বাইরে কি-কি পাওয়া যায়। তবে আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ, ভীনাস।'

কিং একঘেয়েমির শিকার। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। স্ত্রী আর মেয়ে দুটোকে নিয়ে অনেক দিন পর বেরুবে সে, কোন রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার খেয়ে সিনেমা দেখবে। কনসোলের ফাঁকা একটা জায়গায় লেদার কেসটা রেখে খুলল সে, ভেতরে আরও কিছু ফাইল ঢোকাবে।

ল্যারি কিং সহজে চমকে ওঠার লোক নয়। ঠাণ্ডা ও শান্ত প্রকৃতির ব্লাডহাউন্ড হিসেবেই তার পরিচিতি। কিন্তু যা দেখল তাতে তার গোটা অস্তিত্ব প্রবল এক ঝাঁকি খেলো। সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে, লেদার কেসটার ভেতর একটা হাত ভরল সে। যে পদার্থের স্পর্শ পেল সেটা দু'আঙুলে ডলে পরীক্ষা করল।

'তেল,' আপনমনে বিড়বিড় করল কিং, হাঁ করে তাকিয়ে আছে খোলা লেদার কেসটার ভেতর। কেসটা তরল পদার্থে অর্ধেকের বেশি হবে তো কম নয় ভরে আছে। এ সম্ভব নয়, হতভম্ব হয়ে ভাবল সে। অ্যাডমিরালের অফিস থেকে বেরুবার পর কেসটা মুহূর্তের জন্যেও সে হাতছাড়া করেনি। তাহলে এই তেল এল কোত্থেকে?

সতেরো

হাডসন নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষা হাইওয়ে নাইন ধরে গাড়ি চালাচ্ছে তৃষা। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে একটা দিন; আকাশে যেমন মেঘের ছুটোছুটি আছে, মাটির কাছাকাছি তেমনি দমকা বাতাসের দাপাদাপি চলছে। ভেজা পেভমেন্টে জাগুয়ার এক্সকে-আর হার্ডটপ স্পোর্টস কারটা সাবলীল ভঙ্গিতে চালাচ্ছে তৃষা। হুডের নিচে তিনশো সত্তর হর্সপাওয়ারের সুপারচার্জড্ একটা এঞ্জিন আর চেসিসের নিচে কমপিউটর-অ্যাকটিভেটেড সাসপেনসন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং কন্ট্রোল থাকায় কোন রকম ইতস্তত না করে মনের সাধ মিটিয়ে স্পীড তুলছে সে।

নরম লেদারের প্যাসেঞ্জার সিটে গা এলিয়ে দিয়ে ড্রাইভটা উপভোগ করছে রানা, চোখের দৃষ্টি মাঝে-মধ্যে বাঁ দিকে সরে গিয়ে দেখে নিচ্ছে স্পীডোমিটারের কাঁটা। গাড়ি চালানোয় তৃষার দক্ষতার ওপর আস্থা রাখতে চায় ও, তবে পরিচয়টা মাত্র কয়েক দিনের হওয়ায় জানা নেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কেমন চালাবে সে। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, রোববার সকাল বলে রাস্তায় গাড়ি খুব কম দেখা যাচ্ছে। পেশি ঢিল করে দিয়ে রাস্তার দু'পাশের খেত-খামার, মাঠ, বাগান আর বনভূমি দেখছে ও। বনভূমির গাছগুলো এত উঁচু, পিছনের পাথুরে পাহাড় পর্যন্ত বেশিরভাগ আড়াল করে রেখেছে।

এক সময় বাঁ দিকে বাঁক নিল তৃষা। এখান থেকে আবাসিক এলাকা শুরু। বাড়িগুলো যেন সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পীর তুলির আঁচড়ে সাজানো। প্রতিটি বাড়ির সামনে সযত্নলালিত ফুলবাগান আর সবুজ মখমলের মত লন। রাস্তাটা সাপের মত এঁকেবেঁকে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে। অবশেষে একটা গেটের সামনে থামল তৃষা। গেটটা মাঝখানে কাটা। মূল শহর থেকে এতটা দূরে, প্রায় গ্রামীণ একটা পরিবেশে ঠিক এ-ধরনের সিকিউরিটি কেউ আশা করবে না। গেট থেকে ভেতর দিকে প্রসারিত চওড়া পাঁচিল দুটো দশ ফুট উঁচু। গেটটা অস্বাভাবিক পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, ফুলস্পীডে ছুটে আসা সীসা ভর্তি যে-কোন পাঁচটনী ট্রাককেও একদম ঠেকিয়ে দিতে পারবে। রাস্তার ওপারে, গেট থেকে বিশ গজ

দূরে, উঁচু একজোড়া পোলের মাথায় ফিট করা হয়েছে দুটো টেলিভিশন ক্যামেরা। ওগুলোকে অকেজো করতে হলে দরকার লক্ষ্যভেদী রাইফেলের বুলেট।

তৃষা গাড়ি থামিয়েছে একটা পাথুরে পিলারের পাশে। বাক্সটাকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, দেখে মনে হলো পাথরের ভেতর গাঁথা। বাক্সের গায়ে বোতাম রয়েছে। গাড়ির জানালা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল তৃষা। রিমোট কন্ট্রোলটা এতক্ষণে গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করল সে, চাপ দিল আরেকটা কোড-এ। এবার ধীরে ধীরে মাঝখান থেকে ফাঁক হতে শুরু করল গেট। জাগুয়ার ভেতরে ঢুকতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সেটা, পিছু নিয়ে অন্য কোন গাড়ি যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

'সিকিউরিটি সম্পর্কে আপনার বাবা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন,' মন্তব্য করল রানা।

'সবটুকু এখনও আপনি দেখেননি। চোখে পড়ছে না, তবে চারজন গার্ডও আছে।'

রাস্তাটা গম, আখ, সূর্যমুখী ইত্যাদি খেতের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে। এটা আসলে একটা খামারবাড়িই। আঙুর বাগানের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে জাগুয়ার, হঠাৎ বড়সড় একটা ব্যারিকেড মাথাচাড়া দিল গাড়ির সামনে। বাধাটা সম্পর্কে জানত তৃষা, তাই আগে থেকেই স্পীড কমিয়ে আনছিল।

গাড়ি থামামাত্র মোটাসোটা একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে মাঝারী আকৃতির এক লোক বেরিয়ে এল, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। ঝুঁকে গাড়ির ভেতরটা দেখল সে। চেহারাই বলে দিচ্ছে লোকটা নেপালী। সম্ভবত অবসর নেয়া গুর্খা সৈনিক, ধারণা করল রানা।

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তৃষাকে করজোড়ে নমস্কার করল লোকটা। 'নমস্তে, মাইজী,' ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথা বলছে সে। 'আপনাকে দেখলেই আনন্দে আমার বুকটা ভরে ওঠে।'

'কেমন আছ, প্রভাস কাকা? তোমার ছোট্ট খুকি মনীষা কেমন আছে?'

'আমরা তাকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছি।'

'ভালই করেছ।' হাত তুলে গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠামো দেখাল তৃষা, খানিক চেষ্টা করার পর আন্দাজ করা গেল যে ওটা একটা বাড়ি। 'ফাহিম চাচা কি এখানে?'

'জী, মাঈজী,' জবাব দিল গুর্খা গার্ড প্রভাস। 'আপনার পিতাজী মারা যাবার পর খামারবাড়ি ছেড়ে কোথাও তিনি যাননি।' নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল সে। 'বড় চোট পেয়েছি, মাঈজী। মনিবজী আমার দেওতা ছিলেন।'

'ধন্যবাদ, প্রভাস কাকা।' রানার দিকে ফিরল তৃষা, ফিসফিস করে বলল। 'ওর নাম শেরপা প্রভাস থাপা, বাবা ওকে ব্রিটেন থেকে নিয়ে এসে গার্ডের চাকরি দিয়েছিলেন। গুর্খা রেজিমেন্টে ছিল ও। এখানকার সব গার্ডই নেপালী।'

'ভাল থাকুন, মাঈজী,' বলার পর প্রায় ভোজবাজির মত জঙ্গলে মিলিয়ে গেল প্রভাস থাপা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তৃষার দিকে তাকাল রানা। 'হাত-পা বেঁধে মেয়েকে নদীতে

ফেলে দেয়ার ব্যাপারটা কি?'

'ওটা একটা কোড,' হাসিমুখে ব্যাখ্যা করল তৃষা। 'আমি যদি মেয়ের বদলে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতাম, ও ধরে নিত আমাকে জিম্মি করা হয়েছে। প্রথমে আপনাকে গুলি করত, তারপর বাকি তিন গার্ডকে খবর দিত।'

'আপনি এই পরিবেশে মানুষ হয়েছেন?'

হেসে উঠল তৃষা। 'ওহ্ মাই হেভেন্স, নো! আমার ছোটবেলায় সিকিউরিটির কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মা মারা যান আমার দশ বছর বয়সে। বাবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাই মায়ের বান্ধবী খুশি আন্টির কাছে নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমাকে। ওখানেই আমি বড় হয়েছি। পরে খুশি আন্টির ডিভোর্স হয়ে যায়, সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।'

বড়সড় একটা দোতলা বাড়ির সামনে বৃত্তাকার গাড়ি-বারান্দায় জাগুয়ার থামাল তৃষা, ফ্রন্ট পোর্চ-এ কয়েক সারি লম্বা প্রাচীন পাথুরে পিলার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে তৃষার পিছু নিয়ে সিঁড়ির ধাপ টপকাল রানা, থামল প্রকাণ্ড একটা কাঠের দরজার সামনে।

হাতের মুঠো খুলে একটা চাবি দেখাল তৃষা, তারপর ডোরবেলের বোতামে চাপ দিল। 'তালা খুলে নিজেই ঢুকতে পারি, তবে ফাহিম চাচাকে চমকে দিতে চাই না।'

আধ মিনিট পর এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। বয়স হবে ষাট, প্রায় পুরো মাথা জুড়েই চকচকে টাক। ডোরাকাটা শার্ট আর বো টাই-এর সঙ্গে একটা ভেস্ট পরে আছেন। মাথার দু'পাশে সামান্য কিছু চুল যা আছে, সব পাকা। কালো চোখ দুটো ধ্যানমগ্ন কোন সাধু বা দরবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোখের নিচে পুঁটলি তৈরি হয়েছে, মুখও একটু লালচে–রানার সন্দেহ হলো, ভদ্রলোক নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করেন।

তৃষাকে দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখ। 'আয়, মা, আয়! তৃষার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিলেন। হঠাৎই যেন দপ করে নিভে গেল তাঁর হাসি, চোখে শোক ও বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল। 'সিরাজ নেই, এ আমি এখনও ভাবতেই পারছি না। সে কি সত্যি তোর চোখের সামনে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, চাচা,' ফিসফিস করল তৃষা, ভদ্রলোকের দুই কাঁধে হাত রেখে তাঁর বুকে কপাল ঠেকাল। 'আপনি ছাড়া আমার আর কেউ রইল না।'

'প্রথমে সিরাজ, তারপর তোর খুশি আন্টি। এ আমি কি করে মেনে নিই। জানতাম শত্রু আছে, কিন্তু এ-ও জানতাম যে সিরাজকে রক্ষা করার লোকও আছে। তাছাড়া, একটা অভয় সবসময় ফিল করতাম–এই পৃথিবীকে অনেক কিছু দেয়ার আছে সিরাজের, কাজেই যতই ভয় দেখাক, সত্যি সত্যি কেউ তাকে মেরে ফেলবে না।'

মনে মনে একটা নোট রাখল রানা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে হবে, এই শত্রু কারা? তৃষা পরিচয় করিয়ে দিতে বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাল ও। হাত ধরার ভঙ্গি যতটা দৃঢ় হলে পছন্দ করে, ততটা নয়; তবে ভদ্রলোককে অমায়িক ও আন্তরিক বলেই মনে হলো ওর।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' ডক্টর ফিরোজ ফাহিম বললেন। 'টেলিফোনে তৃষা আপনার সম্পর্কে সব কথাই বলেছে। ওকে আপনি একবার নয়, দু'বার বাঁচিয়েছেন–সত্যি আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম।'

'আমার একটাই দুঃখ,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'ডক্টর ইসলামকে বাঁচাতে পারলাম না।'

শোকে ম্লান, তৃষার মাথায় একটা হাত রাখলেন ডক্টর ফিরোজ ফাহিম। 'আর তোর খুশি আন্টি। কী আশ্চর্য একটা প্রাণবন্ত মানুষ। কিন্তু তাঁকে কেন?'

'আমি আমার আরেকটা মাকে হারালাম।' তৃষার চোখ-মুখ দেখে সন্দেহ হলো সে কেঁদে ফেলবে।

মৃত্যুর প্রসঙ্গ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনার জন্যে রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'তৃষা বলছিল ওর বাবার সঙ্গে আপনার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

ইঙ্গিতে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানালেন ডক্টর ফাহিম। 'হ্যাঁ, যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব। চল্লিশ বছরের সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বকে আপনি আর কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? বুদ্ধির বিচারে তাঁর সমতুল্য মানুষ আমি আমার জীবনে আর একটিও দেখিনি। একই যুগে জন্মালে সিরাজের সঙ্গে আইনস্টাইনের তুমুল প্রতিযোগিতা হত, এ আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'খুরশিদাও তাঁর যোগ্য স্ত্রীই হতেন। প্লেন আর আকাশকে অতটা ভাল না বাসলে তিনিও একজন ফার্স্ট-রেট সায়ান্টিস্ট হতে পারতেন।'

সাজানো-গোছানো একটা লিভিং রূমে ঢুকল ওরা, সমস্ত ফার্নিচার ভিক্টোরিয়ান। ডক্টর ফাহিম নিজেই ওদেরকে কফি বানিয়ে খাওয়ালেন, তবে নিজের জন্যে সরু একটা গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢাললেন। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার,' বললেন তিনি। 'তৃষার বাড়িতে তৃষাকেই আমি আপ্যায়িত করছি।'

'ওই খামারবাড়ি নিয়ে কি করা হবে তা যতদিন না ঠিক করি, এই ব্যবস্থাই বহাল থাকবে,' বলল তৃষা। 'ফাহিম চাচা, বরাবর যেমন মনে করেছেন, এখনও এটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন, প্লীজ।'

'আপনি কি বলতে পারবেন,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাজের কথা পাড়ল রানা, 'ডক্টর ফাহিম, মারা যাবার আগে কি নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর ইসলাম?'

তৃষার দিকে তাকালেন ডক্টর ফাহিম। তাকে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললেন, 'তাঁর বড় প্রজেক্টটা ছিল নিখুঁত ও বিশ্বস্ত একটা ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন তৈরি করা, তারপর এঞ্জিনটার উন্নতি ঘটানো।' থেমে সরাসরি রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'তৃষা তো বোধহয় এ-সম্পর্কে আপনাকে আগেই সব বলেছে, তাই না?'

'তা বলেছেন,' স্বীকার করল রানা, ক্ষীণ সন্দেহ হলো ভদ্রলোক ওর কাছে কিছু একটা গোপন করছেন। 'তবে একজন বিজ্ঞানীর মুখে শুনলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারব আমি। এটুকু জানি যে ওয়াটার লিলির এঞ্জিন ডক্টর ইসলামের ডিজাইন ধরেই তৈরি করা হয়েছিল। এখন আমি জানতে চাইছি, এই এঞ্জিন তৈরিতে ডক্টর ইসলামের কনট্রিবিউশন কতটুকু ছিল।

ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন নিয়ে তো আজ নতুন নয়, বিশ বছর ধরেই গবেষণা চলছে। এই একই প্রপালশান প্রিন্সিপল ব্যবহার করে জাপানিরা একটা জাহাজ বানিয়েছিল।'

'তা ঠিক, তবে সেটা খুব একটা কাজের জিনিস হয়নি। জাহাজটার স্পীড এত কম যে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। প্রায় জাদুই বলতে হবে, ডক্টর সিরাজ পাওয়ার-এর এমন একটা উৎস আবিষ্কার করেন, ম্যারিটাইম প্রপালশান জগতে যেটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মাত্র দু'বছরের কিছু বেশি সময় নিয়ে এঞ্জিনটার ডিজাইন তৈরি করেন তিনি। এটাকে বিস্ময়কর একটা অ্যাচিভমেন্ট বলতে হবে, যেহেতু যা করার সব তিনি একাই করেছেন। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের জন্যে স্বাভাবিক সময় লাগা উচিত ছিল অন্তত এক যুগ, অথচ সিরাজ একটা ওয়ার্কিং মডেল তৈরি করতে সময় নেন মাত্র পাঁচ মাস। তাঁর এক্সপেরিমেন্টাল ইউনিটগুলো ছিল যে-কোন এমএইচডি টেকনোলজির চেয়ে উন্নতমানের।'

'রানাকে আমি বলেছি বাবার এঞ্জিন কিভাবে জ্বালানির উৎস হিসেবে সী ওয়াটার ব্যবহার করতে পারে। প্রথমে একটা এনার্জি সোর্স ক্রিয়েট করা হয়, থ্রাস্টার-এর ভেতর দিয়ে পানি পাম্প করার জন্যে।'

'আইডিয়া আর ডিজাইন বৈপ্লবিক হলেও,' তৃষা থামতে আবার শুরু করলেন ডক্টর ফাহিম, 'প্রথম দিককার এঞ্জিনগুলো ঠিকমত কাজ করেনি, ফ্রিকশান বিল্ডআপ-এর মাত্রা ছাড়ানো হাই রেটের কারণে পুড়ে যাচ্ছিল। সিরাজ তখন সিঙ্গাপুরে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করছেন। গোপনে খবর পাঠাতে আমি গেলাম অ্যাসিস্ট করতে। তিনি তেলের এমন একটা নতুন ফর্মুলা বের করলেন যেটা এক্সট্রিম হীট ও ফ্রিকশানেও ভেঙে পড়বে না। ম্যারিটাইম এঞ্জিনের জগতে এই ফর্মুলা নতুন একটা দরজা খুলে দিল–ওগুলো না ভেঙে অনির্দিষ্টকাল অপারেট করতে পারবে।'

'তারমানে আপনারা দু'জন মিলে একটা সুপার অয়েল ডেভলপ করেছেন?' বলল রানা।

'না, এই আবিষ্কারে আমার কোন অবদান ছিল না, আমি শুধু তাঁকে উৎসাহ আর সামান্য শ্রম দিয়েছি।'

'ইন্টারনল কমবাশ্চান এঞ্জিনে ব্যবহার করা হলে, এ থেকে কি কি সুবিধে পাওয়া যাবে?'

'থিওরি বলে, একটা অটোমোবাইল এঞ্জিন আপনি ইন্টারনল ওয়ার্কিংস্ মেরামত করা ছাড়াই বিশ লাখ মাইল চালাতে পারবেন,' শান্ত-স্বাভাবিক সুরে ব্যাখ্যা করছেন ডক্টর ফাহিম। 'হেভি ডিউটি ডিজেল এঞ্জিন ভালভাবে অপারেট করা যাবে, এই ধরুন, এক কোটি মাইল। বিশেষভাবে উপকৃত হবে এয়ারক্রাফট জেট এঞ্জিন, ওগুলোর আয়ু তো বাড়বেই, মেরামতও অনেক কম লাগবে। একই কথা ফর্কলিফট থেকে শুরু করে আর্থমুভার পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভেহিকেল সম্পর্কেও।'

'আর বোট ও শিপ প্রপালশান ইউনিট তো আছেই, না?'

'মুভিং পার্টস-এর ওপর নির্ভর করে না, এনার্জির জন্যে যতদিন এরকম নতুন টেকনোলজি নিখুঁত করা না হচ্ছে,' বললেন ডক্টর ফাহিম, 'ততদিন সিরাজের ফর্মুলা লুব্রিকেশন-এর প্রয়োজনে তেলের ওপর নির্ভর করে এমন সমস্ত মেকানিক্যাল পাওয়ার সোর্সের জন্যে বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য হবে। আমরা, আমি আর সিরাজ, ঠাট্টা করে এই ফর্মুলার নাম দিয়েছিলাম স্লীক সিক্সটি-সিক্স।'

'উৎপাদন ও পরিশোধনের জন্যে কি রকম খরচ পড়বে?'

'বললে বিশ্বাস করবেন এক গ্যালন নরম্যাল মোটর অয়েলের চেয়ে মাত্র তিন সেন্ট বেশি?'

'কোন সন্দেহ নেই, আপনাদের এই ফর্মুলা তেল-কোম্পানিগুলোর মাথায় হেভি ডাণ্ডা মারবে। সহজ হিসাবেই বলে দেয়া যায়, একশো কোটি ডলার লোকসান দেবে তারা। বিশ বছরে হয়তো এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য আপনাদের এই ফুর্মলা কিনে নিতে পারে তারা, তারপর নিজেরাই মার্কেটে ছাড়তে পারে।'

ডক্টর ফাহিম ধীরভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন। 'এরকম কখনোই ঘটবে না,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে, সিদ্ধান্ত ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'সিরাজ কখনোই এ থেকে পয়সা পেতে চাননি। প্রথমে বাংলাদেশকে, তারপর গোটা দুনিয়াকে বিনামূল্যে তিনি তাঁর এই ফর্মুলা উপহার দিতে যাচ্ছিলেন, কোন শর্ত ব্যতিরেকেই।'

'ফরমুলাটা পেটেন্ট করা হয়নি বলে শুনেছি, ইচ্ছে করলে এটা থেকে আপনারা প্রচুর টাকা আয় করতে পারেন।'

'তৃষা তো অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে ওর বাবার আবিষ্কার থেকে একটা পয়সাও নেবে না সে। আর আমার বয়স পঁয়ষট্টি, মিস্টার রানা। জীবনে বিয়ে করিনি, কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও নেই। আমার ডায়াবেটিস, অ্যাকিউট আর্থ্রাইটিস, একটা আয়রন-ওভারলোড ডিজিজ—নাম হলো, হেমোক্রোমাইটোসিস—এবং ক্যানসার হয়েছে প্যানক্রিয়াস ও লিভার, দুটোতেই। আজ থেকে পাঁচ বছর পর দুনিয়ার বুকে হেঁটে বেড়াতে পারলে নিজেকে মহা সৌভাগ্যবান একজন বলে মনে করব। এখন আপনিই বলুন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কি কাজে আসবে আমার?'

'ফাহিম চাচা!' তৃষার প্রায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা। 'আপনি কখনও জানাননি...'

ঝুঁকে তৃষার হাত চাপড়ে দিলেন ডক্টর ফাহিম। 'তোর বাপকেও জানতে দিইনি, রে। তোরাই তো আমার আপনজন, তাই কষ্ট পাবি জেনে এতদিন বলিনি। এখন বলছি, আর কিছু আসে যায় না বলে।' হাত বাড়িয়ে ওয়াইনের বোতলটা তুলে নিলেন। 'তোরা কি কিছু খাবি? আরও কফি দেব?'

'না।' তৃষার চেহারায় রাগ। 'আমরা তোমার কাছে কিছু খেতে আসিনি।'

প্রসঙ্গ পাল্টে রানা বলল, 'বাইরে দেখলাম সিকিউরিটি খুব কড়া।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর ফাহিম। 'সিরাজ আর আমাকে এখানে সবসময় ডাকির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। ল্যাবরেটরি ভেঙে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়ায়

এক চোর একবার আমার একটা পা ভেঙে দিয়েছিল।'

'চোর আপনাদের ফর্মুলা চুরি করতে এসেছিল?'

'আমাদের ফর্মুলা নয়। সিরাজের ফর্মুলা। আর সেই চোরও সাধারণ চোর ছিল না, হামলাটাও একবার হয়ে থেমে যায়নি। আসলে বহুবিধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত একটা গ্রুপ অভ কোম্পানিজ, কয়েকশো শাখা নিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় করপরেশনগুলোর একটা, আমাদের পরম শত্রু হয়ে উঠেছিল।'

'কারা তারা?'

'এই করপরেশনেই চাকরি করতাম আমরা, সিরাজ ও আমি। গ্রুপ অভ কোম্পানিজ-এর ডিরেক্টর লীফ এরকুল-এর সঙ্গে সিরাজের চুক্তি হলো, ওদের ল্যাবরেটরিতে বসে একের পর এক বিভিন্ন আবিষ্কারের ফর্মুলা তৈরি করবেন তিনি, সেই ফর্মুলা অনুসারে পণ্য তৈরি করে মার্কেটে ছাড়া হবে, খরচ বাদ দিয়ে যা লাভ হবে তার শতকরা পঁচিশ ভাগ রয়্যালিটি পাবেন তিনি; ওখানে আমি তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করব।

'প্রথম তিন বছরে ছয়টা ফর্মুলা দেন ডক্টর সিরাজ। করপরেশন লাভ করে দেড়শো বিলিয়ন ডলার। সেই শুরু হলো চুক্তিভঙ্গের ঘটনা। ব্যাপারটা প্রথমে আমি টের পাই। সিরাজকে দেয়ার কথা লাভের শতকরা পঁচিশ ভাগ, অথচ দিচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগের কিছু বেশি। সিরাজ এতটাই নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন, তাঁকে ঠকানো হচ্ছে বলবার পরও তিনি এ বিষয়ে করপরেশনের সঙ্গে কোন বিরোধে জড়াতে রাজি হলেন না। এরকুল ঠকানোর পরও যা আসছিল সেটাকে কম বলা যায় না। তাছাড়া, প্রতি মাসে মোটা বেতন তো আমরা পাচ্ছিলামই। তবে ন্যায্য পাওনা থেকে সিরাজের এই বঞ্চিত হওয়াটা আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। অবশ্য সিরাজ প্রতিবাদ না করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমার কিছু করবারও ছিল না।

'পরে বুঝেছিলাম কেন সিরাজ কোন ঝামেলায় জড়াতে চাননি। কোন বিতর্কে জড়ানো মানেই তো সময় নষ্ট। আর এই নষ্ট করার সময়ই তাঁর ছিল না...'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'আমরা অফিস করতাম ন'টা-পাঁচটা,' বললেন ডক্টর ফাহিম। 'বাড়িতে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নেয়ার পর শুরু হত ডক্টর সিরাজের ব্যক্তিগত গবেষণা। কখনও আমি তাঁকে সাহায্য করার সুযোগ পেতাম, কখনও বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডেকেও তাঁর কোন সাড়া পেতাম না—নিজের গবেষণায় এতই মগ্ন থাকতেন...'

'কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন ডক্টর ইসলাম?' রানার প্রশ্ন।

'এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দেয়া সত্যি কঠিন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল দু'চারটে নয়, অসংখ্য। ভূমণ্ডলের অনেক ওপরে, বস্তু যেখানে ভেসে থাকবে, সেখানে এমন একটা বনভূমি তৈরির স্বপ্ন দেখতেন, যে বনভূমি আমাদের এই গ্রহটাকে ছায়া ও অক্সিজেন দেবে, সেই সঙ্গে ওজোন স্তর ধ্বংসের প্রক্রিয়া যেটা শুরু হয়েছে সেটা থামাবে, ঠেকিয়ে দেবে সূর্যের ক্ষতিকর সমস্ত রশ্মিকে। তাঁর আরেকটা বিষয় ছিল—ট্র্যান্সপোর্টেশন। আর তেল বা জ্বালানি নিয়ে গবেষণা তো

ছিলই। এক পর্যায়ে সিরাজ একাই সময় কাটাতেন ল্যাবে। আমাকে শুধু বলতেন, দুনিয়াকে চমকে দেয়ার মত একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

'এভাবে পাঁচ বছর কাটল। তারপর, যেভাবেই হোক, লীফ এরকুল জানতে পারল ডক্টর সিরাজ ব্যক্তিগতভাবে নিজের ল্যাবে গবেষণা করছেন এবং যুগান্তকারী কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে ডক্টর সিরাজকে প্রশ্ন করে সে। তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, বাধ্য হয়ে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে এরকুলকে একটা ধারণা দেন। ওটা ছিল ওই ম্যাগনিটো-হাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন, আর ফুয়েল হিসেবে সীওয়াটার ব্যবহার করার আইডিয়া।

'এই এঞ্জিনের ডিজাইন আর ফুয়েলের আইডিয়ার কথা শুনে লীফ এরকুলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ডক্টর সিরাজকে অঢেল টাকার লোভ দেখাল সে, বিনিময়ে এঞ্জিনের ডিজাইন আর ফুয়েলের ফর্মুলা বা আইডিয়ার স্বত্ব লিখে দিতে হবে তাকে। ডক্টর সিরাজ এতে রাজি হলেন না, বরং মুখের ওপর বলে দিলেন, "তুমি গত প্রায় দশ বছর ধরে আমাকে ঠকাচ্ছ, কাজেই তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত কোন আবিষ্কার নিয়ে কাউকেই ব্যবসা করতে দেয়া হবে না–এমন কি নিজেকেও আমি সে অনুমতি দেব না। আমার সমস্ত আবিষ্কার প্রথমে পাবে আমার জন্মভূমি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রাচুর্যের মুখ দেখার পর আবিষ্কারগুলোর সুবিধে ভোগ করবে এই গ্রহের সমস্ত মানুষ, প্রতিটি দেশ।" এ-সব কথা শুনে উন্মাদ হয়ে উঠল লীফ এরকুল। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে নিজের হাতে আইন তুলে নিল সে, বন্দি করল ডক্টর সিরাজকে...'

'বাকিটুকু আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ডক্টর ইসলাম তাঁর মনের ইচ্ছে পূরণও করেছেন। বন্দি অবস্থা থেকে কোন এক সুযোগে ই-মেইলের মাধ্যমে জটিল সব অঙ্ক; বিচিত্র সব গ্রাফ, নকশা ও ডায়াগ্রাম; অদ্ভুত আকৃতির সাংকেতিক চিহ্ন; বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ের রেফারেন্স ইত্যাদি বাংলাদেশে পাঠান তিনি। এ-সব কমপিউটর প্রিন্টারে প্রিন্ট করার পর পঁচিশ পাতা হলো। সবই দুর্বোধ্য, আমাদের বিজ্ঞানীরা কোন অর্থই বের করতে পারল না। ডক্টর ইসলাম একটা চিঠিও লিখেছিলেন, সেটার ভাষা ছিল সহজ ইংরেজি। তাতে তিনি বলেন, প্রথম পঁচিশ পাতায় রয়েছে তাঁর নিজের এমন সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফর্মুলা যার কোড ভাঙতে বাংলাদেশের একশো বছর লাগবে। তবে একশো বছর সময়সীমা বিশ বছরে কমিয়ে আনার উপায়ও তিনি ওই চিঠিতে বাতলে দেন। প্রথমে সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারাটার কোড ভাঙতে হবে। তাঁর হিসাবে, বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের এতে সময় লাগবে দশ বছর। এটা ভাঙতে পারলে পঁচিশ পাতার বাকিটুকু অনুবাদ করতে লাগবে আরও দশ বছর।

'যাই হোক, চিঠিতে ডক্টর ইসলাম জানিয়েছিলেন যে তাঁকে টেক্সাসের ওডেসার কাছে চারশো বালিয়াড়ির মাঝখানে এক পাথুরে গুহায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিসিআই অভিযান চালিয়ে কোবরা ক্লাব নামে মার্সেনারিদের একটা গ্রুপের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করে। ওই অভিযানে আমিই নেতৃত্ব দিই। কিন্তু মুক্ত হবার পর আমাকে না জানিয়ে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে অজ্ঞাত কোন

জায়গায় চলে যান ডক্টর সিরাজ। অবশ্য একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন।'

'এই চিঠিটার কথা তো আপনি আমাকে বলেননি! এ-ও বলেননি যে বাংলাদেশ থেকে আপনি নিজে বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে টেক্সাসে এসেছিলেন।'

'সময় পেলাম কখন যে বলব।' ক্ষীণ হাসি রানার ঠোঁটে। 'তো যা বলছিলাম। এই চিঠিটায় ডক্টর ইসলাম নিজের এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দেন। তারপর লেখেন, তাঁর সাংকেতিক মেসেজের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি কোন সাইফার বিশেষজ্ঞ রবি ঠাকুরের সঞ্চিতার বসুন্ধরা কবিতাটির বিশেষ একটা অংশের অক্ষরগুলোকে কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে এ-সব অতীত প্রসঙ্গ, সমাধান পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। বর্তমান দাবি করে সমস্যাটার ধরন আর গভীরতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা। ডক্টর ফাহিম, আপনি কি বিশ্বাস করেন ফ্যালকন করপরেশনের মালিক লীফ এরকুল বন্দি করেছিল ডক্টর সিরাজকে? কোবরা ক্লাবের মার্সেনারি সদস্যরা তারই ভাড়াটে খুনী ছিল? তারাই ওয়াটার লিলিতে ডক্টর সিরাজ আর তৃষাকে খুন করতে চেষ্টা করে?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা। লীফ এরকুল ছাড়া আর কে এমন জঘন্য ক্রাইম করতে পারে!'

'এরকম একটা জায়ান্ট আমেরিকান করপরেশন শুধু লাভের জন্যে পাইকারি হারে খুন পর্যন্ত করতে চাইছে, এ সত্যি বড় ভয়ংকর কথা।'

'ফ্যালকনের আশি ভাগ শেয়ারহোল্ডারের মালিক লীফ এরকুল একজন প্রভাবশালী সিনেটর, দুনিয়ার অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, শোনা যাচ্ছে তিন বছর পর আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবে। বিশ্বাস করুন, এই লোককে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করলে শয়তানকে রীতিমত অসম্মান করা হয়। আমি আপনাকে এমন বহু লোকের তালিকা দিতে পারি যারা কোন না কোনভাবে ফ্যালকন করপরেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং যে-কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক হয় নিখোঁজ হয়ে গেছে নয়তো তাদের লাশ পাওয়া গেছে। লাশ পাওয়ার প্রতিটি ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে চালানো হয়েছে, বেশিরভাগই আত্মহত্যা।'

'কিন্তু এটাও খুব আশ্চর্য নয় কি যে সরকার তাদের ক্রিমিন্যাল অপারেশনগুলো ইনভেস্টিগেট করেনি?'

'প্রতিটি রাজ্য ও ফেডারেল সরকারে ফ্যালকনের নিজস্ব লোক আছে। ছোটখাট একজন কর্মকর্তাকে নিজেদের কাজ করানোর জন্যে এক মিলিয়ন ডলার দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না তারা, বিনিময়ে তার কাছ থেকে গোপন ও গুরুত্বপুর্ণ তথ্য আদায় করতেও ছাড়ে না। যে-কোন রাজনীতিক ফ্যালকনের স্বার্থে কাজ করতে রাজি হলে রাতারাতি ধনী বনে যায়, উপরি পাওনা বিদেশী অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার পর।

'ফ্যালকনের পক্ষে কাজ করছে এমন কোন লোক পুলিশের ইনফর্মার হয়ে গেল বা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল সৎ হয়ে যাবে, এমনটি কখনও ঘটেনি, কখনও ঘটবেও না। নিজেদের নোংরা কাজ যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম আছে ফ্যালকনের। ইনফর্মারের আপনজনদের শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেয়া

স্বামী-স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ের হাত বা পা ভেঙে যেতে পারে, দেখে মনে হবে ব্যাপারটা নেহাতই দুর্ঘটনা ছিল। এতেও যদি ইনফর্মার লাইনে না আসে বা চুপ না করে, আপনজনদের কেউ মারা যাবে–আত্মহত্যা করে। কিংবা প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কেউ গায়ে সুই ঢুকিয়ে দিল, কোন মারাত্মক সংক্রামক রোগে মারা যাবে। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, নিউজ মিডিয়ার কত তদন্ত নিউজপেপারের বা টেলিভিশন নেটওঅর্ক-এর মালিকদের সঙ্গে ফ্যালকন ডিরেক্টরদের মীটিঙের পর বাতিল হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক ফ্যালকনের দু'জন ডিরেক্টরকে নিজের অফিস থেকে বের করে দেন, তবে পরে নতি স্বীকার করে তদন্ত বাতিল করতে রাজি হন–নিজের মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করছে, এই খবর পেয়ে। বিশ্বাস করুন, মিস্টার রানা, এরা ভয়ংকর প্রাণী।'

'কোবরা ক্লাবের সঙ্গে ফ্যালকনের কি সম্পর্ক?'

'কোবরা ক্লাব আসলে লীফ এরকুলের নিজের গোপন একটা সংগঠন। সিনেটর নিজে সেনাবাহিনীতে ছিল, জানেন নিশ্চয়। বেছে বেছে বদরাগী, হিংস্র, বিবেক-বর্জিত খুনী একদল মার্সেনারিকে নিয়ে এই ক্লাবটা গড়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র এরকুলের নির্দেশ মেনে চলে তারা। এই তথ্যটা আমি জেনেছিলাম আমার এক পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে, সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে এরকুলের মার্ডার লিস্টে ডক্টর সিরাজ আর আমার নামও আছে।'

'আপনার সেই পুরানো বন্ধু এখন কোথায়?'

'সে গায়েব হয়ে গেছে,' এমন তিক্ত সুরে বললেন ডক্টর ফাহিম, যেন এ বিষয়ে আলাপ করে আর কোন লাভ নেই।

'ফ্যালকনে যারা চাকরি করে, তারা কেমন মানুষ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশ-ত্রিশ হাজার কর্মচারী নিশ্চয়ই চোখ বন্ধ করে কাজ করে না। তারা সবাই অসৎ? বা অপরাধ হতে দেখেও মুখ বুজে থাকে?'

'কোনও কর্মচারী ফ্যালকনে যেদিন থেকে কাজ শুরু করে, তার জগৎ প্রায় রাতারাতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ যেন অনেকটা কোন কাল্ট-এ নাম লেখানো। ফ্যালকন নিজের একটা আদর্শ বা দর্শন প্রথমেই কর্মচারীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়–কোন রাষ্ট্র বা পরাশক্তি নয়, একটি করপরেশন দুনিয়া শাসনের দায়িত্ব পালন করবে, আর সেই করপরেশনের নাম ফ্যালকন। কর্মচারীরা হপ্তায় ছুটি পায় তিন দিন, কাজ করে চারদিন। বছর শেষে মোটা অঙ্কের কয়েকটা করে বোনাস। নিজেদের অজ্ঞাতে ক্রীতদাসে পরিণত হয় তারা।'

'ইউনিয়নগুলো কি করে? ওগুলোর সঙ্গে গোলমাল বাধে না?'

'কোন ইউনিয়নই ফ্যালকনে দাঁত বসাতে পারেনি। ইউনিয়ন কর্মকর্তারা আপিল করলে একটা কথা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দেয়া হয় যে কেউ যদি ইউনিয়ন করে তার চাকরি যাবে না, তবে সবগুলো বোনাস আর ফ্রিঞ্জ বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হবে সে। আপনিই বলুন, কে ইউনিয়ন করতে চাইবে? পুরানো কোন কর্মচারী মারা গেলে বা অবসর নিলে চাকরিটা সাধারণত তার ছেলে অথবা মেয়ে পাবে; এবার কল্পনা করুন কোম্পানির ইনফ্র্যাস্ট্রাক্টচার ভাঙা কতটা কঠিন। সাধারণ কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে জানানো হয় লীফ এরকুল একজন

মহামানব, নিজের কর্মচারীদের তিনি নিজ সন্তানদের চেয়ে কম ভালবাসেন না। তাদের ধারণা, ফ্যালকন কর্তৃপক্ষ কোন অপরাধ করতে পারে না।'

'এটা কিভাবে সম্ভব হলো, কোম্পানি ছেড়ে চলে আসার পরও বেশ ক'বছর ডক্টর সিরাজ আর আপনি বেঁচে থাকলেন?'

ডক্টর ফাহিম এই প্রথম একটু হাসলেন। 'ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, আমাকে ওরা কখনোই খুন করার চেষ্টা করেনি। তবে ডক্টর সিরাজের ব্যাপারটা আমি যতটুকু বুঝি, সেটা বলি। তাঁর ওপর নজর রাখার ও তাঁর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যার ওপর ছিল সে ইচ্ছে করে এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই আশায় যে সুযোগ পেলে দুনিয়ার মানুষকে চমকে দেয়ার মত আবিষ্কারের ফর্মুলাটা চুরি করবে। শুধু এই আবিষ্কারটা নয়, ওরা আমাদের তেলের ফর্মুলা আর ডক্টর সিরাজের ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইনও চুরি করার মতলবে ছিল...'

'কিন্তু তেলের ফর্মুলা বা এঞ্জিনের ডিজাইন, দুটোর একটাও চুরি করতে পারেনি ওরা,' বলল রানা। 'অথচ ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন পারফেক্ট করে ওয়াটার লিলিতে ফিট করার পর সেটাকে ওরা ডুবিয়ে দিল। কেন?'

'এর পিছনে একটাই কারণ কাজ করেছে। ডক্টর সিরাজের তৈরি এঞ্জিন নিরাপদ নয়, ঠিকমত কাজই করছে না, এটা প্রমাণ করা। এই ডিজাইনের এঞ্জিন নিয়ে আর যে-সব কোম্পানি জাহাজ তৈরি করছে তারা যাতে ভয় পেয়ে নিজেদের প্রজেক্ট বাতিল করে দেয়। তখন ওই ফর্মুলা আর ডিজাইন পেটেন্ট করিয়ে নিতে পারবে ফ্যালকন। ওগুলো ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই তাদের হাতেও পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু আগুনটা তো এঞ্জিন রুম থেকে শুরু হয়নি।'

'তাই নাকি?' ডক্টর ফাহিমকে বিমূঢ় দেখাল। 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে জাহাজ পোড়ানোর অপারেশনটা ওরা ঠিকমত চালাতে পারেনি, কোথাও কিছু একটা গোলমাল করে ফেলেছিল। তবে এ স্রেফ আমার ধারণা...'

'সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা,' বলল রানা। 'আমরা জাহাজের চ্যাপেলে ইনসেনডিয়ারি ডিভাইস পেয়েছি, ক্রুরা জানিয়েছে ওখানেই প্রথমে আগুনটা লাগে। প্ল্যানটা সম্ভবত এরকম ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ে এক এক করে অনেকগুলো জায়গায় আগুন ধরবে—শুরু হবে এঞ্জিন রুমে, আপার ডেক হয়ে উঠে আসবে, তারপর সবশেষে ধরানো হবে চ্যাপেলে। কিন্তু আপনি যেমন বলছেন, কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলে ওরা।'

ডক্টর ফাহিম গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি এখন এমারেল্ড মার্লিন-এর কথা ভাবছি। ওরা ওটাকেও ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না তো?'

'নতুন লাকজারি সাবমেরিন? আন্ডারওয়াটার ক্রুজ শিপ হিসেবে যেটার ডিজাইন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে দু'দিন পর ওটা প্রথম যাত্রায় বেরুবে।'

'ওটাকে নিয়ে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?' জানতে চাইল তৃষা।

মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন ডক্টর ফাহিম। 'তুই জানিস না?'

'কি জানবেন উনি?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'এমারেল্ড মার্লিন-এর মালিকও লং লেলাং ক্রুজ লাইনস্। ডক্টর সিরাজের ডেভলপ করা এঞ্জিন ওটাতেও ফিট করা হয়েছে।'

আঠারো

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে সতর্ক করল রানা। নুমা চীফও সময় নষ্ট না করে জিনি টেইলর এয়ারফিল্ডে একটা জেট প্লেন পাঠিয়ে দিলেন। নদীর তীর ঘেঁষা ফিরতি পথে তৃষা এবার তার জাগুয়ার আরও জোরে ছোটাল, পৌঁছালও জেটটা ল্যান্ড করার কয়েক মিনিট আগে। রানার কোন যুক্তিই হালে পানি পেল না, 'দেখবেন আমি অনেক কাজে আসব,' বলে প্লেনে একরকম জোর করেই উঠে বসল সে। পাইলটও দেরি না করে ওদেরকে নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

ল্যাংলি ফিল্ডে ল্যান্ড করে জেটটা থামার পর রানা দেখল, ববি মুরল্যান্ড ও জর্জ রেডক্লিফ টারমাকে অপেক্ষা করছেন। ওরা দু'জন প্লেনে উঠতে আবার রওনা হলো পাইলট, এবার দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, গন্তব্য ফোর্ট লডারডেল, ফ্লোরিডা; সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে হবে লং লেলাং ক্রুজ লাইন-এর হেডকোয়ার্টারে।

টেলিফোনে আগেই গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছেন রেডক্লিফ, একটা লিংকন টাউন কার; জেট ল্যান্ড করার কয়েক মিনিটের মধ্যে হারবার অভিমুখে ছুটল সেটা, ড্রাইভিং সিটে মুরল্যান্ড।

একটা দ্বীপে, পানির কিনারা ঘেঁষে, ন'শো ফুট উঁচু লং লেলাং হেডকোয়ার্টার। এই ক্রুজ লাইন কোম্পানি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সিঙ্গাপুর ও মিশর সহ আরও কয়েকটা দেশে জাহাজ তৈরি করে। লং লেলাং-এর পূর্ব-পুরুষরা মূল চীনের অধিবাসী ছিলেন, তবে গত তিন পুরুষ ধরে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

দালানটার ডিজাইন করা হয়েছে একটা সেইলবোটের আদলে। বাইরের এলিভেটর প্রকাণ্ড শ্যাফ্ট্ থেকে বেরিয়ে একটা মাস্তুলের মত আকাশে উঠে গেছে। দালানের বাকি অংশ, বেশিরভাগটাই কাঁচ দিয়ে মোড়া, যেন বাতাস লেগে ফুলে ওঠা বিশাল একটা পাল। কাঁচের দেয়ালগুলো নীল, শুধু মাঝখানের দেয়ালটা সাদা ফ্যাব্রিক, ঘণ্টায় দেড়শো মাইল ঝড়েও ছিঁড়বে না। দালানের নিচের চল্লিশটা ফ্লোরে ক্রুজ লাইনের অফিস, ওপরের পঞ্চাশটা ফ্লোরে প্যাসেঞ্জারদের জন্যে ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি করা হয়েছে, ক্রুজ শিপে ওঠার আগে এখানেই তাদেরকে থাকতে দেয়া হয়।

গাড়ি নিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে ঢুকে পড়ল মুরল্যান্ড, পানির নিচে দিয়ে দ্বীপটায় পৌঁছাবে, যেখানে দৈত্যাকার সেইলবোটের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দালানটা।

গাড়ির দায়িত্ব চেয়ে নিল একজন ভ্যালিট। অনেকগুলো আউটার এলিভেটরের একটায় উঠল ওরা। সাতশো ফুট ওপরে মেইন লবি। লং লেলাং ক্রুজ লাইনের সিইও, অর্থাৎ চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা প্রাইভেট এলিভেটরে নিয়ে এলেন তিনি। এলিভেটর ওদেরকে চল্লিশতলায়, হেড অফিসে নামিয়ে আনল। ডেভিড লং লেলাং, ক্রুজ লাইনের প্রেসিডেন্ট, নিজের ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বটা রেডক্লিফ পালন করলেন, সবাই একটা করে চেয়ারে বসল।

'এখন কথা হলো,' বলে একটু থামলেন ডেভিড লেলাং; পূর্ব-পুরুষদের মত খাটো নন তিনি, চুলে পাক ধরলেও শরীর-স্বাস্থ্য আভাস দিচ্ছে কলেজ জীবনে ফুটবল, বা এমনকি হয়তো রাগবিও খেলেছেন; নীলচে চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, মুরল্যান্ড ও তৃষাকে ছুঁয়ে, স্থির হলো রেডক্লিফের ওপর; 'ব্যাপারটা কি নিয়ে? ফোনে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা শুনে মনে হলো তিনি রীতিমত জেদ ধরে বলতে চাইছেন এমারেল্ড মার্লিনের যাত্রা আমরা যেন অবশ্যই বাতিল করি।'

'কারণ আশঙ্কা করা হচ্ছে এই শিপের পরিণতিও ওয়াটার লিলির মত হতে পারে,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ।

'এখন পর্যন্ত যতগুলো রিপোর্ট দেখেছি সবগুলোতে বলা হয়েছে ওটা ছিল নেহাতই একটা দুর্ঘটনা,' বললেন ডেভিড লেলাং, চোখেমুখে সংশয়। 'আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটবেই, এটা আমাকে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়।'

চেয়ার থেকে সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'আমি আপনাকে হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, মিস্টার লেলাং, ওয়াটার লিলিতে ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়েছিল। আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে, টো করার সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওয়াটার লিলির তলা খসিয়ে দেয়া হয়, তা না হলে ওটা ডুবত না।'

'এ-কথা এই প্রথম শুনছি আমি।' হঠাৎ রেগে ওঠায় ডেভিড লেলাং-এর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'যে-সব ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে ওয়াটার লিলির বীমা করিয়েছি ওগুলোর একটাও আমাকে বা আমার কোন ডিরেক্টরকে জানায়নি যে আগুনটা ইচ্ছে করে ধরানো হয়েছে। আমরা শুধু জানি, যে-কোন কারণেই হোক, ফায়ার ইমার্জেন্সি সিস্টেম ঠিকমত কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। লং লেলাং, অবশ্যই, ওই সিস্টেম যারা সাপ্লাই দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে।'

'সেটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, যদি প্রমাণ হয় ফায়ার সিস্টেমও ইচ্ছে করে অকেজো করে রাখা হয়েছিল।'

'সরি, এ-ধরনের রূপকথা আপনারা আমার কাছে বেচতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করুন,' বলল রানা। 'এটা রূপকথা নয়।'

'ওয়াটার লিলিকে ধ্বংস করে, কয়েক হাজার মানুষকে খুন করে, কে কি লাভ করতে চায় বলবেন দয়া করে?'

'কেন, আপনারা যখন ডক্টর সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে এঞ্জিনের

ডিজাইন আর ফুয়েলের ফর্মুলা পেলেন তখন তিনি তাঁর কোন শত্রুর কথা বলেননি, যে শত্রু ওই ডিজাইন আর ফর্মুলা চুরি করতে চাইছে?'

'এত কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে তাঁর আর তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের নিরাপত্তা দরকার। এঞ্জিনের ডিজাইন আর অয়েল ফর্মুলা আমরা বিনামূল্যে পাই। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন, তাই আমরা ডক্টর ইসলামকে আমাদের সিঙ্গাপুর শিপইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিই, ওখানে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম খুব ভাল।'

'ওয়াটার লিলি সিঙ্গাপুরে তৈরি হচ্ছিল, এমারেল্ড মার্লিন তৈরি হচ্ছিল এখানে,' বলল রানা। 'জাহাজ দুটো তৈরি করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে। এরমধ্যে আপনাদেরকে কেউ কোন হুমকি দেয়নি বা স্যাবটাজ করার চেষ্টা করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছে। টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে। বলেছে, এই ডিজাইনের পেটেন্ট চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে, কাজেই আমরা এটা ধরে কোন জাহাজ তৈরি করতে পারি না। আমরা প্রমাণ দেখতে চেয়েছি, কিন্তু প্রমাণ নিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায়নি। তবে...'

'তবে কি?'

'হয়তো এটা স্রেফ সিঁধেল চোরের কাজ, এই সমস্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই...'

'তবু বলুন, ঘটনাটা কি?'

'আমার বাড়ি থেকে এঞ্জিনের ডিজাইন আর তেলের ফর্মুলার মূল কপিটা চুরি হয়ে গেছে।'

'রানা!' ডেভিড লেলাং থামতেই তৃষা প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'আপনাকে বোধহয় একটা কথা বলা হয়নি। ঠিক কখন জানি না, তবে বাবাকে দিয়ে জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয়া হয়েছিল। হয়তো বাবাকে যখন কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা টেক্সাসে বন্দি করে রেখেছিল, তখন।'

'ওহ্, গড!' নিজের মাথায় হাত রাখল রানা। 'তাহলে পেটেন্টের জন্যে আবেদন করার দাবিটা মিথ্যে নয়।' ডেভিড লেলাং-এর দিকে ফিরল ও। 'ওয়াটার লিলি ডুবিয়ে দেয়ার কারণ আর কিছুই নয়, স্রেফ কমপিটিশন–ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। একটা করপরেশন চাইছে একা শুধু তারাই ওই যুগান্তকারী এঞ্জিন আর ওই নতুন উদ্ভাবিত তেল ব্যবহার করে ব্যবসা করবে।'

'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বললেন ডেভিড লেলাং। 'আপনাদের এই গল্প আমার কাছে গল্পই মনে হচ্ছে।'

'আরও খোলাখুলি ব্যাখ্যা করতে পারলে খুশি হতাম,' বললেন রেডক্লিফ, 'কিন্তু সিআইএ ও এফবিআই তাদের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমাদের হাত বাঁধা।'

ডেভিড লেলাং বোকা নন। 'এটা তাহলে নুমার অফিশিয়াল ইনকোয়্যারি নয়?'

'সত্যি কথা বলতে কি, না,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ।

'আমি আশা করি এ-ধরনের অবাস্তব কাহিনী বাজারে আপনারা ছড়াতে যাচ্ছেন না।'

'নুমা চীফ রাজি হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সবগুলো এজেন্সি তদন্ত শেষ না করা পর্যন্ত কোন অফিশিয়াল রিপোর্ট রিলিজ করা হবে না। এটা আপনাদের সবার ব্যবসার স্বার্থেই,' বলল রানা। 'টেরোরিস্টরা জাহাজ ধ্বংস করছে, মিডিয়া এ-খবর প্রচার শুরু করলে কেউ আর জাহাজে চড়তে চাইবে না।'

'এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত আমি,' সুর একটু নরম করলেন ডেভিড লেলাং। 'কিন্তু এমারেল্ড মার্লিনকে যাত্রা বাতিল করতে বলার কারণ কি? আগে থেকে যখন জানা গেছে টেরোরিস্টরা হামলা চালাতে পারে তখন সিআইএ, এফবিআই, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন ও নুমার ভূমিকা কি হওয়া উচিত? ইন্টারপোল আর ন্যাটোই বা কি করছে? ওরা আমাদেরকে প্রটেকশন দিতে পারছে না?' ভদ্রলোক আবার রেগে উঠে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। 'এটা এমারেল্ড মার্লিনের প্রথম যাত্রা, বাতিল করা সম্ভব নয়। সম্মানী মানুষরা কেউ কেউ দু'বছর আগে নিজেদের রিজার্ভেশন কনফার্ম করেছেন। চারশো মিলিওনিয়ার-বিলিওনিয়ার প্যাসেজ বুক করেছেন, আমি তাঁদেরকে হতাশ করতে পারব না। তাঁদের অনেকেই ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছেন, হোটেলে উঠে অপেক্ষা করছেন। আমি দুঃখিত। এমারেল্ড মার্লিন শেডিউল ধরে কালই যাত্রা করবে।'

'আপনাকে যখন অন্য কোন কিছুতে রাজি করা সম্ভব নয়,' নরম সুরে বলল রানা, 'তখন আপনি যা চাইছেন তাই হোক।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকালেন ডেভিড লেলাং। 'আমি কি চাইছি?'

'প্রটেকশন,' বলল রানা। 'কয়েকজন মাত্র ক্রু আর মেরিন ইন্সপেক্টর থাকবে শিপে, যাদের কাজ হবে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আর সিস্টেম সারাক্ষণ চেক করা...'

'বোট,' বাধা দিয়ে বললেন ডেভিড লেলাং। 'সাবমেরিনকে শিপ বলে না, বলে বোট।'

'ওটা একটা লাকশারি লাইনার নয়?' জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'লাকশারি লাইনার, তবে শুধু যখন সারফেস ধরে চলবে; এই ভেসেলটাকে তৈরি করা হয়েছে পানির নিচে দিয়ে চলাচলের উপযোগী করে।'

'আমরা কি অতিরিক্ত সিকিউরিটি আর ইন্সপেকশন টীম সম্পর্কে একমত হতে পেরেছি?' রেডক্লিফ সাবধানে জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' এক গাল হেসে বললেন ক্রুজ লাইনের ডিরেক্টর। 'অসুবিধে কি, বিনা খরচায় প্রটেকশন পাচ্ছি।'

তবে রানার অনুরোধ এখনও শেষ হয়নি। 'আমি আরও চাইব একটা ডাইভ টীম ওয়াটারলাইনের নিচে খোল পরীক্ষা করবে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ডেভিড লেলাং। 'আমি ডাইভার দিতে পারব। আন্ডারওয়াটার রিপেয়ার ও মেইনটেন্যান্সের জন্যে সারা বছরই বেতন দিয়ে পুষতে হয় ওদের।'

'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' বললেন রেডক্লিফ।

'যদিও আমার বিশ্বাস যে এ-ধরনের সাবধানতার কোন প্রয়োজন নেই, তবে এ ও চাই না যে ওয়াটার লিলি ট্রাজেডি রিপিট হোক। লন্ডনের লয়েড্স ইন্স্যুরেন্স আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তা না হলে লেলাং ক্রুজ লাইন দেউলিয়া হয়ে যেত।'

'ববি আর আমি ইন্সপেকশন টীমে থাকতে চাই, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে আর কি,' রানার সুর আরও নরম।

'ওঁদের সঙ্গে আমিও,' তাড়াতাড়ি বলল তৃষা। 'আপনি তো জানেনই যে আমি কার মেয়ে। বাবার কাজের প্রতি মেয়ের আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক, বোঝেনই তো।'

ডেভিড লেলাং চেয়ার ছাড়লেন। 'আমি কোন সমস্যা দেখছি না। মত-পার্থক্য যতই থাকুক, খুশি মনেই স্টেট রুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সমস্ত প্যাসেঞ্জার অ্যাকমডেশন বুক হয়ে গেছে, তবে তারপরও হাতে কিছু রাখা হয়। তা-ও যদি না পাই, আশা করি ক্রু কোয়ার্টারে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হোটেলের ডক ফ্রন্টে বোট পৌঁছাবে কাল সকাল সাতটায়। আপনারা তখন উঠবেন।'

রেডক্লিফ ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। 'ধন্যবাদ, মিস্টার লেলাং। আপনাকে সতর্ক না করতে হলেই খুশি হতাম, কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সিদ্ধান্ত নেন সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করাটা জরুরী।'

'আমি তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করি। প্লীজ, অ্যাডমিরালকে বলবেন তাঁর উদ্বেগের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার দৃষ্টিতে কোন গুরুতর সমস্যা ধরা পড়ছে না। এমারেল্ড মার্লিন ব্যাপক সী ট্রায়ালে উতরে গেছে; ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন ও বোটের সমস্ত ইমার্জেন্সি সিস্টেম চমৎকার কাজ করছে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার লেলাং,' বলল রানা। 'যদি কিছু ঘটে, আপনাকে আমরা অবশ্যই জানাব।'

ডেভিড লেলাঙের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যান্ড। 'যাক, কেউ বলতে পারবে না যে আমরা চেষ্টা করিনি।'

'আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি,' রেডক্লিফ বললেন। 'ওয়াটার লিলিকে হারিয়ে কিনারায় এসে ঝুলে আছে কোম্পানি। এখন এমারেল্ড মার্লিনের যাত্রা বাতিল করে দিলে নির্ঘাত নিচে খসে পড়বে। ডেভিড লেলাং আর তাঁর ডিরেক্টরদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।'

ওয়াশিংটনে ফেরার জন্যে প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে চলে গেলেন জর্জ রেডক্লিফ। মুরল্যান্ড, তৃষা আর রানাকে পথ দেখিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিল ডেভিড লেলাং-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি। নিজের কামরায় একা হতেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করল রানা। 'মিস্টার লেলাংকে যাত্রা বাতিল করতে রাজি করানো যায়নি,' সংক্ষেপে রিপোর্ট করল ও।

'জানতাম উনি রাজি হবেন না।' বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন নুমা চীফ।

'আমি আর ববি বোটে থাকছি। আমাদের সঙ্গে ডক্টর ইসলামের মেয়ে তৃষাও থাকছেন।'

'মিস্টার লেলাং-এর অনুমতি পেয়েছ?'

'উনি খুশি মনেই রাজি হয়েছেন।'

ফোনের রিসিভার থেকে কাগজ ওল্টাবার শব্দ ভেসে আসতে শুনল রানা। তারপর অ্যাডমিরাল বললেন, 'তোমার জন্যে কিছু খবর আছে, রানা। এফবিআই বলছে, ওয়াটার লিলির বেঁচে যাওয়া প্যাসেঞ্জারদের দেয়া বর্ণনা থেকে একটা লোককে তারা চিনতে পারছে। তাদের ধারণা এই লোকটাই ওয়াটার লিলিতে আগুন ধরায়।'

'কে সে?'

'সত্যিকার একটা পচা আপেল, রানা। লোকটার আসল নাম কাকাস জাভালা। জন্ম লস অ্যাঞ্জেলসে। একজন অ্যাফ্রো-আমেরিকান, মানে পূর্ব-পুরুষরা আফ্রিকান ছিল। আঠারো বছরে পা দেয়ার আগেই মারপিটের যে-সব ঘটনা ঘটায় তার তালিকা তৈরি করতে পুলিসের খাতার সাত পৃষ্ঠা লাগে। একটা খুনের দায় এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়, নাম বদলে ঢুকে পড়ে সেনাবাহিনীতে। অল্প সময়ে দ্রুত উন্নতি করে জাভালা, অফিসার হবার পর তাকে ট্র্যান্সফার করা হয় হাইলি সিক্রেট মিলিটারি অর্গানাইজেশন সিইএএসই-তে। উচ্চারণটা সীজ।'

'কখনও শুনিনি।'

'ওদের কর্মসূচি বা অ্যাকশন সম্পর্কে অনেক সরকারী কর্মকর্তাও কিছু জানেন না,' বললেন হ্যামিলটন। 'কভার্ট ইলিট অ্যাকশন ফর সিলেক্ট এলিমিনেশন, সংক্ষেপে সীজ।'

'না, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

'এটা আসলে গড়ে তোলা হয়েছিল উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী নেতাদের খুন করে সন্ত্রাস দমন করার উদ্দেশে, তাদের তৎপরতা আমেরিকান নাগরিকদের জানমালের জন্যে হুমকি হয়ে ওঠার আগেই। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, একটা কংগ্রেস কমিটি সীজ-এর তৎপরতার ওপর তদন্ত চালিয়ে এমন কিছু খুঁজে পায়, তারা সুপারিশ করে সীজ যেন ভেঙে দেয়া হয়। তিন মাস পর পেন্টাগন সীজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এখন দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না। পলিটিক্যাল ও কভার্ট মার্ডারে উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া কাকাস জাভালা, একজন মেজর, নিজের বারোজন অধস্তন লোককে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে খুলে বসেছে একটা কমার্শিয়াল অ্যাসাসিনেশন কোম্পানি।'

'একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট।'

'হ্যাঁ, পেশায় ভাড়াটে খুনী ওরা। গত এক বছরে অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ডের তালিকা দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে—এদের মধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, রাজনীতিক নেতা, কোম্পানি ডিরেক্টর থেকে শুরু করে কিছু সিলেব্রিটিও আছেন। ওরা এমন কি মাফিয়া লীডারদেরও মারছে।'

'কোন তদন্ত নেই?' রানা বিস্মিত।

'এফবিআই ফাইল তৈরি করেছে, কিন্তু এই লোকগুলো সত্যি ভারি চালাক

নিজেদের সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ কখনোই তারা রেখে যায় না। তদন্তকারী অফিসাররা হতাশায় ভুগছে, কারণ এখন পর্যন্ত তারা জাভালা বা তার মার্ডারিং গাঙের দিকে একবারও আঙুল তাক করতে পারেনি। দিনে দিনে এই ভয়টাই সবার মনে জেঁকে বসছে যে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দেবে ডেথ স্কোয়াড।'

'গড!'

'শুনতে যতই খারাপ লাগুক,' ম্লান সুরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'এদিক সেদিক বেশ কিছু করপরেট সিইও আছে যারা একচেটিয়া ব্যবসা আর ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে পারে না এমন কোন কাজ নেই।'

'ফ্যালকন প্রসঙ্গ ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন একটা বা দুটো নয়, চার-চারটে অপরাধের জন্যে কাকাস জাভালাকে দায়ী করা হচ্ছে। এটা প্রায় নিশ্চিত যে ওয়াটার লিলিতে সেই আগুন ধরিয়েছিল। বিস্ফোরণটাও সেই ঘটায়, যার ফলে ক্রুজ শিপের তলা খসে পড়ে। তার তৃতীয় অপরাধ, জাহাজের একজন অফিসার সেজে ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম স্যাবটাজ করে।'

'একজন লোক এতকিছু করতে পারে না,' রানার গলায় সন্দেহ।

'জাভালা সব সময় একা কাজ করে না। সেজন্যেই আমি বলছি, এমারেল্ড মার্লিনে প্রতিটি সেকেন্ড সতর্ক থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

'ঠিক আছে, ক্রুদের কেউ সন্দেহজনক আচরণ করে কিনা লক্ষ রাখব।'

'তুমি বরং লক্ষ রাখবে জাভালাকে দেখতে পাও কিনা।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল রানা, ভুরু একটু কোঁচকাল।

'নিজেকে নিয়ে তার অহংকারের সীমা নেই। এত বড় একটা কাজ সে তার অধস্তনদের ওপর ছেড়ে দেবে না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, এই শোতে সে-ই প্রধান ভূমিকায় থাকতে চাইবে।'

'আপনার কোন ধারণা আছে সে দেখতে কেমন?'

'সেটা তো আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা। তার সঙ্গে তোমার তো দেখা হয়েছে।'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? কোথায়?'

'আমি এই মাত্র নিউ ইয়র্ক পুলিস ইনভেস্টিগেটরদের রিপোর্ট পেলাম। সেই পুরানো ফকারটার পাইলট ছিল কাকাস জাভালা, যে ফকারটা গুলি করে তোমার ট্রাইমোটরকে নামাতে চেয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা–এটাই তাহলে তার চার নম্বর অপরাধ।'

***